কিশোর আনন্দ | ২

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

কিশোর আনন্দ | ২

আ লো কি ত মা নু ষ চা ই

কিশোর আনন্দ।২

সম্পাদনা ॥ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২১৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

নির্বাহী সম্পাদক
কাজল ঘোষ

শিল্প সম্পাদক
ধ্রুব এষ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪০৯ জানুয়ারি ২০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ সপ্তম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

অলঙ্করণ
হাশেম খান
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0226-x

Kishore Anondo, Editor : Abdullah Abu Sayeed
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14, Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka-1000
Bangladesh. Cover Design : Dhrouba Esh. 2nd Edition 7th Print : October 2012
Price Tk. 200.00 only

ভূমিকা

তোমরা, আমাদের দেশের কিশোর-তরুণরা, যাতে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পার সেজন্য তোমাদের মন ও বয়সের উপযোগী সবচেয়ে সুন্দর আর স্বপ্নেভরা বইগুলো তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে সারা দেশে ঐ চেষ্টা করে আসছি। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তোমাদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি নানারকম আনন্দময় উপন্যাস, মজাদার ভ্রমণকাহিনী, মহৎ মানুষদের জীবনী, রম্যরচনা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও আরও নানা ধরনের বই—এমন সব বই যা পড়লে তোমাদের মন অনুভূতিময় ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠবে এবং জ্ঞানের উচ্চতর জগতে প্রবেশের জন্য তোমরা উন্মুখ ও যোগ্য হবে।

কিন্তু এসব বই পড়ার পাশাপাশি মানব-সভ্যতার সেই সব বিষয় ও তথ্যও তো তোমাদের জানতে হবে যেগুলো জানলে তোমরা সুঅবহিত আধুনিক বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশ করা হল সে জন্যেই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে 'আসন্ন' নামে আমরা তোমাদের জন্য যে উৎকর্ষধর্মী মাসিক পত্রিকাটি বের করি তার লেখাগুলো নিয়েই এই 'কিশোর আনন্দ' প্রকাশিত হচ্ছে।

একজন ছেলে বা মেয়ের যা কিছু জেনে বড় হওয়া উচিত তার অধিকাংশ তথ্যই তোমরা পাবে এই কিশোর আনন্দে। বিশ থেকে পঁচিশ খণ্ডে কিশোর আনন্দ প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রইল। এর মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে মানবজগতের অসংখ্য তথ্য তো তোমরা পাবেই সেইসঙ্গে পাবে অনেক অনবদ্য গল্প, কবিতা, কুইজ, চুটকি, স্মরণীয় বাণী, এমনি আরও অনেক রমণীয় ও উপভোগ্য লেখা।

আমরা আশা করি যারা এই বইয়ের সবগুলো সংখ্যা মন দিয়ে পড়বে পৃথিবীর জ্ঞানজগতের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো সম্বন্ধে তারা একটা মোটামুটি ধারণা পাবে।

এ বইয়ের সব লেখাই অত্যন্ত সুলিখিত ও উপভোগ্য। তোমাদের জন্য ভালো ভালো লেখকদের যেসব অনন্য লেখা তাঁদের বই ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে ঐ সব বই ও পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এই সংকলনে প্রকাশ করা হয়েছে। লেখাগুলো পড়ে তোমরা আনন্দ পেলে আমাদের কষ্ট সার্থক হবে।

কেবল কিশোর-তরুণরা নয়, আমাদের ধারণা সব বয়সের সবরকম মানুষই 'কিশোর আনন্দ' একইভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং পড়ে উপকৃত হবেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

কিশোর আনন্দ ২

সূ চি প ত্র

কবিতা / ছড়া

আদর্শ ছেলে ॥ কুসুমকুমারী দাশ ৯
ভুলুরাম শর্মা ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০
খিদে ॥ লুৎফর রহমান রিটন ৯৫

গল্প

নাইটিংগেল পাখি এবং গোলাপ ফুল ॥ অস্কার ওয়াইল্ড ১৫
নাপিত ডাক্তার ॥ জসীমউদ্‌দীন ৩৩
চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিঅলা ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪১
কলকারখানা ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ৫৭
কিন্টু-শীন্টুর কাণ্ড ॥ সাজেদুল করিম ৭২
মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প ॥ সত্যজিৎ রায় ৯০
আফানথি'র গল্প ১১০
আরব্য রজনীর গল্প ১২০
স্ট্যান্ডোফবিয়া ॥ রাহাত খান ১৩৯

প্রবন্ধ

একুশে ফেব্রুয়ারি ॥ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ১০
ঘুড়ি নিয়ে কতকিছু ২৯
সবচেয়ে পুরনো ছবির কথা ॥ হাশেম খান ৪৭
অবলুপ্তির পথে তিমি ৫৫
রোবট কাহিনী ৬২
বোতল বার্তা ॥ বিপ্লব দাশ ৬৪
হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি ॥ সুকুমার রায় ৭৯
পৃথিবীর সেরা জাদুঘর লুভ্‌র ৮৫
আকাশের আকাশে ধ্রুবতারায় ॥ সুব্রত বড়ুয়া ৯২
রবিনসন ক্রুশোর গল্প ॥ মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ ৯৮
টাকা কথা ১০৫
সর্দি কাশি হয়েছে কি ১১২
প্যারোডি কী ১১৭
আইফেল টাওয়ার ১২৮
পাখি দেখা ॥ আলী ইমাম ১৩০

জীবনী

জোয়ান অব আর্ক ৫১।
বার্নার্ড 'শ ৬৯।

ভ্রমণ কাহিনী

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০।
ঝলমলে শহর সিঙ্গাপুর ৩৬।

খেলা/বিলিভ ইট অর নট

অলিম্পিকের গোড়ার কথা ৭৭।
অবিশ্বাস্য মিল ১৩৬।

কুইজ/ধাঁধা

খাঁচার ভেতর পাখি ৩২
ছবির ধাঁধা ১০৯

বিবিধ

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প ২৮।
লজ্জাবতীর পাতা ছুঁলে নুয়ে পড়ে কেন ৪৬।
সবচেয়ে বেশি শব্দ ৫৪।
সিংহকে বনের রাজা বলা হয় কেন ৬৮।
পলাশীর যুদ্ধ ৭৬
আমাদের খিদে পায় কেন ১০৪।
আ-এর বাড়াবাড়ি ১১৫
লাইব্রেরি গড়ে উঠল কেমন করে ১১৬।
মানুষের গরম সহ্য করার ক্ষমতা ১২৯
এক মিনিটে ৩২৭ শব্দ উচ্চারণ ১৩৫।
কুড়োনো মানিক ১৫০।

কুসুমকুমারী দাশ

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে;
মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে—এই যার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত-মাংস-প্রাণ
হাত-পা সবারি আছে মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বলো কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
শাদা প্রাণে হাসি মুখে করো এই পণ—
মানুষ হইতে হবে, মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার,
সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্ব মাঝার।
হাতে প্রাণে খাটো সবে, শক্তি করো দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একুশে ফেব্রুয়ারি

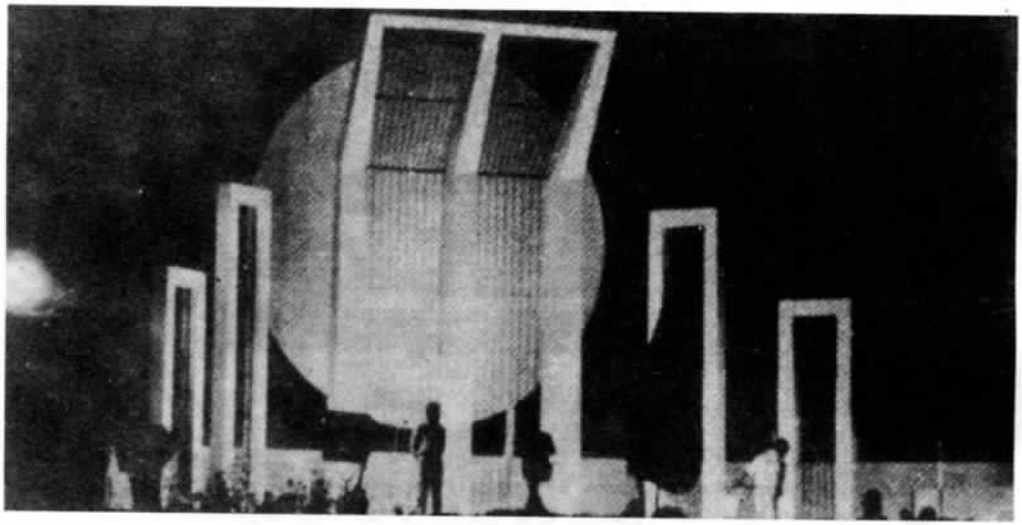

স্মৃতির শহীদ মিনার

আজ মনে হবে গল্প, বিশেষ করে তাদের কাছে যাদের জন্ম একাত্তরের পরে। কিন্তু তবু এটা খুবই সত্য ছিল একসময়ে যে আমরা অধীন ছিলাম পাকিস্তান নামে এক রাষ্ট্রের। সেই রাষ্ট্রের পুলিশ ছিল, মিলিটারি ছিল, ছিল তার শক্তিশালী বিদেশি বন্ধুরা। রাষ্ট্রের কর্তারা চেয়েছিল উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উর্দু তাদের ভাষা, তারা সে-ভাষা চাপিয়ে দেবে বাঙালিদের ওপর। রাষ্ট্রের সব কাজকর্ম চলবে উর্দুতে। উর্দু না-জানলে কেউ চাকরি পাবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য ওই ভাষাতে চলবে। উচ্চশিক্ষার ভাষাও হবে উর্দু। অথচ সেই-যে পাকিস্তান, তার বেশিরভাগ নাগরিকই ছিল বাঙালি, একশ জনের ছাপান্ন জনই বাংলা বলত। তখন বাঙালিদের মধ্য থেকে দাবি উঠল : কেবল উর্দু নয়, বাংলাও, বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি, আর তাদের একটি বাংলা।

প্রথম যখন ওঠে এ-দাবি তখন এ-যে খুব প্রচণ্ড আকার নিয়েছিল তা কিন্তু নয়। ঢাকা শহরের ভেতরই আটকে ছিল দাবিটি। ঢাকা শহরেরও সব এলাকাতে যায়নি সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীরাই তুলেছিলেন আওয়াজ। কিন্তু উনিশ-শ বায়ান্ন সনের একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ যখন গুলি ছুড়ল ছাত্রদের ওপর, তখন মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল বিপুল হয়ে উঠেছে

আন্দোলনের শক্তি। ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলন। পার হয়ে গেল নদী, ডিঙিয়ে গেল শহর ও গ্রামের ব্যবধান। ঢুকে গেল মানুষের মনের ভেতর। জীবন্ত হয়ে রইল মানুষের আলাপে-আলোচনায়। প্রতিবাদে ও সংগঠনে কেবল সেই বছর নয়, বছরে-বছরে বাড়ল এর শক্তি। কারো ক্ষমতা রইল না একে দমিয়ে দেয়। পুলিশ নয়, মিলিটারি নয়, কেউ পারল না একে অস্বীকার করতে। সেই আন্দোলনের পথ ধরেই তো এগিয়ে গেল মানুষ। নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, নতুন নতুন মিছিল হল, সমাবেশ হল। ঢেউয়ের পরে যেমন ঢেউ ওঠে, তেমনি চলল আন্দোলন। একটু তফাৎ আছে, ঢেউগুলো কেবলি বড় হতে থাকল, একটি ছাড়িয়ে গেল অন্যটিকে। তারই ফলে যুদ্ধ হল—একাত্তরের সেই মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীন হল বাংলাদেশ।

সাতচল্লিশ সনে যখন পাকিস্তানের জন্ম হয় তখন বলা হয়েছিল আমরা স্বাধীন হলাম, কিন্তু ওই-যে উর্দুকে চাপিয়ে-দেয়া বাঙালিদের ওপর, ওই ঘটনাই তো ধরিয়ে দিল আসল ব্যাপারটাকে। ধরা পড়ে গেল এই কঠিন সত্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতর বাঙালিরা স্বাধীনতা পাবে না। তাদের ওপর জুলুম চলবে। শোষণ চলবে। তারা যা উৎপাদন করবে, পশ্চিম এলাকার শাসকেরা তা নিয়ে যাবে লুণ্ঠন করে। ভাষা-আন্দোলন তো আসলে এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাঁর মূল, রুখে দাঁড়ানো। কিন্তু সাতচল্লিশে কি কেউ ভাবতে পেরেছিলেন যে, একাত্তরে এসে পাকিস্তান ভেঙে যাবে এবং নতুন একটা দেশ বেরিয়ে আসবে সেই পাকিস্তানের ভেতর থেকে? না, ভাবেননি কেউ। অসম্ভব ছিল ভাবা। পাকিস্তান তখন দুর্দান্তভাবে শক্তিশালী।

কিন্তু অসম্ভবই তো শেষপর্যন্ত সম্ভব হল। যা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল, তাই একেবারে দিনদুপুরের মতো জ্বলজ্যান্ত হয়ে চলে এল সামনে। কে তাকে অস্বীকার করবে, কে বলবে এ সত্য নয়? কিন্তু সম্ভব হল কেমন করে এ-ঘটনা, কেমন করে অমন শক্তিশালী রাষ্ট্রটা ভেঙে পড়ল, কেমন করে বেরিয়ে এল স্বাধীন বাংলাদেশ?

সম্ভব হল এইজন্য যে, বাঙালিরা সচেতন হয়ে উঠেছিল। ওই-যে স্বাধীনতার নাম করে শোষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন—তার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল মানুষ। ছোট ছোট টুকরো-টুকরো আগুন জ্বলছিল এখানে-সেখানে। সেই ছোট-ছোট আগুনগুলো এক হয়ে, একত্র হয়ে, বড় হয়ে, একত্রে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিল। পুড়ে ছারখার হয়ে গেল পাকিস্তান, আর সেই আগুনের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল বাংলাদেশ। কিন্তু এই-যে এক করা, একত্র করা, এই কাজটি ঘটল কেমন করে? ঘটল আন্দালনের ভেতর দিয়ে। লোকে বুঝতে পারল যে মানুষের মতো বাঁচতে হলে একসাথে হতে হবে, একত্র হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই আন্দোলন, একত্র হয়ে রুখে দাঁড়ানো এটা নতুন নয়, কিন্তু এটা একটা নতুন মোড় নিয়েছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে, সেই বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

ওই-যে মোড় নিল, বাঁক ঘুরল, ওরই ফলে অত্যন্ত প্রবল শক্তিশালী বিশাল হয়ে উঠল আন্দোলন। কেবল ঢাকায় আটকে রইল না সে, ছড়িয়ে গেল সারা বাংলাদেশে, পথে-ঘাটে, বন্দরে-গঞ্জে, শহরে-গ্রামে, বিদেশেও, যেখানে বাংলাভাষী মানুষ আছে সেখানে। ছাত্র ও শিক্ষকরাই শুরু করেছিলেন রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির পর কেবল তাঁদের আন্দোলন রইল না সে, হয়ে উঠল দেশের সব মানুষের আন্দোলন। শ্রমিক এল, এল কৃষক, এল সাধারণ মানুষ। তারা এল বলেই এতবড় হল সে, হয়ে উঠল এত শক্তিশালী। সেইখানেই আসল শক্তি তার, সেই-যে সব মানুষের অংশগ্রহণ তার মধ্যদিয়েই অসম্ভবকে সম্ভব করবার শক্তি পেয়ে গেল বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন। তারপর যত গেছে বছর ততই দৃঢ় হয়েছে সে। তাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি। বরঞ্চ যত তীব্র হয়েছে আক্রমণ ততই

বেড়েছে আন্দোলনের শক্তি। সোনা যেমন খাঁটি হয় আগুনে পুড়ে তেমনি খাঁটি হয়ে উঠেছে আন্দোলন। ধীরে ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত সরল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে মানুষের সেই মিছিল। এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছে বাংলাদেশকে। সম্ভব করেছে অসম্ভবকে। মানুষের যে-সংগ্রাম, সংগ্রামী মানুষের যে-ঐক্য তার পক্ষে কোনো বাধাই-যে বাধা নয় সেই সত্য প্রমাণ হয়ে গেছে নতুন করে।

কিন্তু তারপর? তারপর কী হয়েছে? বাহাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে মনে হয়েছিল বাংলাদেশে মানুষের যে-ঐক্য সেই ঐক্য আর কখনো ভাঙবে না। মনে হয়েছিল মানুষের ওপর মানুষের শোষণ টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল যে-পাকিস্তান সে-রাষ্ট্র যখন গেছে চলে তখন আর-কোনো ভয় নেই, নতুন রাষ্ট্রে শোষণ থাকবে না, সব মানুষ সমান হবে। আর কী হবে? আর হবে এই যে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে। অন্যতম রাষ্ট্রভাষা নয়, উর্দুর পাশে বাংলা নয়, একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। খুব উজ্জ্বল একটা স্বপ্ন। কিন্তু এখন মনে হয় স্বপ্নই ছিল সেটা, কেননা সে তো সফল হয়নি।

আজকে দেখছি মানুষের ওপর মানুষ অত্যাচার করছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। ছিনতাই করে, খুন করে, না-পারলে জ্বালাতন করে। বড়দের অপরাধ ছোটদের ওপর এসে পড়ে। লক্ষ লক্ষ শিশু ও কিশোর প্রায় না-খেয়েই থাকে এই স্বাধীন দেশে। তাদের শিক্ষা নেই, তাদের জীবনে আলো নেই, তাদের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশ হল বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশ। এ কোনো মিথ্যে বলা নয়, বাড়িয়ে বলা নয়, এই স্বাধীন দেশে বেশিরভাগ মানুষ কেবলি গরিব হচ্ছে, যারা গরিব হয়ে ছিল তারা আরো গরিব হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সেটাই একমাত্র স্বাধীনতা তাদের—মাটির সঙ্গে মিশে যাবার স্বাধীনতা। অন্যদিকে যারা ধনী তারা আরো বেশি ধনী হচ্ছে, তাদের স্বাধীনতা—সহজে ধনী হবার স্বাধীনতা। স্বাধীনতার আগে এদেশে কোটিপতির সংখ্যা দু'জন ছিল কিনা সন্দেহ, এখন কোটিপতির সংখ্যা

শহীদ বরকত

শহীদ রফিকউদ্দিন

শহীদ শফিউর রহমান

তিন-চার হাজার হয়ে গেছে। তাহলে তো বলতেই হয় যে-শোষণের যে-ব্যবস্থাটার জন্য পাকিস্তান ভেঙে গেল সেই শোষণ শেষ হয়নি, সে রয়েই গেছে।

আর বাংলাভাষা? বাংলাভাষা কি চালু হয়েছে বাংলাদেশে? না, হয়নি। কেন হয়নি? কেমন করে হবে? আমাদের দেশে প্রতি একশ জনের মধ্যে আটাত্তর জন মানুষই না-জানে পড়তে, না-জানে লিখতে। তারা অক্ষরই চেনে না। তাদের জীবনে বাংলা নেই, কোনো ভাষাই নেই বলতে গেলে। চুপ করে থাকা আছে। আর রয়েছে কান্নাকাটি। আর যারা শিক্ষিত তাদেরও বেশির ভাগই বাংলাভাষা ব্যবহার করতে চায় না। তারা মনে-মনে ভাবে এ-ভাষা ব্যবহার করলে লোকে ভাববে আমরা বুঝি ইংরেজি জানি না। আর ইংরেজি যদি না-জানি তবে সেটা তো ভারি লজ্জার কথা, অসম্মানের কথা। তাহলে কী দেখছি? দেখছি তো বেশিরভাগ লোক বাংলা লিখতে পড়তে পারে না তারা নিরক্ষর ও দরিদ্র বলে, আর অল্পকিছু লোক বাংলা ব্যবহার করে না বাংলা ব্যবহার অসম্মানজনক (?) বলে। অশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দুটোই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাভাষা ব্যবহার না-করার। অভাব ও প্রাচুর্য উভয়েই শত্রুতা করছে বাংলাভাষার সঙ্গে।

তবে তো বলতেই হবে যে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারিনি। পাকিস্তানের আমলে বাংলাভাষার প্রচলন সম্ভব ছিল না সেখানে শোষণ ছিল বলে। শোষণকারীরা তাদের ভাষা উর্দুকে দিতে চেয়েছিল আমাদের ওপর। আর আজ স্বাধীন বাংলাদেশেও বাংলা চলছে না ওই শোষণ আছে বলেই। শোষণ আছে বলেই শোষিত মানুষ অক্ষর চেনে না, পড়তে জানে না, লিখতে জানে না, জানে না কেমন করে ব্যবহার করতে হবে বাংলাভাষা। তারা অনেকটা বোবা হয়ে থাকে, আর থেকে-থেকে আর্তনাদ করে। আর যারা শোষণ করে সেই মানুষেরা তাকিয়ে থাকে বিদেশের দিকে। ধনী যারা এদেশে, মনের দিক থেকে তারা বিদেশি। তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি স্কুলে যায়, ইংরেজি বই পড়ে, ইংরেজি ছবি দেখে, তারা স্বপ্ন দেখে বিদেশের। ছেলেমেয়েদের বাপ-মায়েরাও তাই করে। দেশে থাকে, কিন্তু দেশের মানুষ থেকে কত দূরে থাকা যায় তারই চেষ্টা করে। গরিব মানুষেরাই মাঠে চাষ করে, কারখানায় পরিশ্রম করে, তারা আছে বলেই দেশটা চলছে। কিন্তু তাদের পরিশ্রমের ফসলটা তারা নিজেরা পাচ্ছে না। ফলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে, নির্জীব হয়ে পড়ছে। আর ধনীরা বলছে, এইসব লোকেরা দেশের জন্য বিরাট বোঝা। এরা না-থাকলেই ভালো ছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বছর আসে। এসে বলে দিয়ে যায় যে, আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারিনি, যে-লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য মানুষ আন্দোলন করেছিল। স্বপ্ন ছিল মানুষ মানুষের ভাই হবে, বন্ধু হবে, সব মানুষ শিক্ষা পাবে, সকল মানুষের জীবনে ভাষা থাকবে, সাহিত্য থাকবে। অর্থাৎ কিনা দারিদ্র্য থাকবে না দেশে, আমরা উন্নত হব, আমাদের মর্যাদা থাকবে, বিশ্ব আমাদেরকে সম্মান করবে। কিন্তু সেসব কিছুই তো হল না। তবে কি আমরা হতাশ হয়ে পড়ব? বলব, কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, ভবিষ্যৎ নেই?

না, তা মোটেই নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি তো এই কথাটাও বলে, এই কথাটাই সবচেয়ে জোর দিয়ে বলে যে, হতাশ হবার কোনো কারণই নেই। কেননা, একুশই তো দেখিয়ে দিয়েছে অসম্ভবকে কেমন করে সম্ভব করা যায়। পাকিস্তানকে ভাঙা তো একসময় অসম্ভব মনে হত। ভাঙা তো অনেক দূরের কথা, একদিন সে ভেঙে পড়বে এটা কল্পনা করতেও পারত না লোকে। ভয় পেত। সেই অসম্ভব যখন সম্ভব হয়েছে তখন আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে আগামীকাল তাও সম্ভব হবে; সম্ভব হবে শোষণের ব্যবস্থাটা তুলে ফেলা, তুলে ফেলে মানুষকে মানুষের ভাই করা, বন্ধু করা, আপনজন করে তোলা। সে-কাজটা যখন করতে পারব তখন আমরা আর দরিদ্র থাকব না,

তখন সব মানুষের মুখে হাসি থাকবে। মানুষে-মানুষে আত্মীয়তা গড়ে উঠবে। খুন, জখম, মারামারি, কাটাকাটি কিছুই থাকবে না। অশিক্ষা থাকবে না। আলো জ্বলবে ঘরে ঘরে। অন্ধকার পালিয়ে যাবে মার-খাওয়া জন্তুর মতো। তখন আমরা একটি সমাজের উন্নত মানুষ বলে সবাই পরিচয় দেব। আর তখনই, কেবল তখনই, বাংলাভাষা সবাই ব্যবহার করবে। তখন তো অশিক্ষা থাকবে না দেশে, তখন তো দেশে বাস করে বিদেশি হয়ে থাকব না কেউ। তখন আজকের এই অবস্থাটাকে একটা খারাপ স্বপ্ন বলে মনে হবে আমাদের, যেমন পাকিস্তানকে মনে হয় পাকিস্তানকে যারা চিনতেন তাদের কাছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি ডাক দিয়ে যায়, ডাক দিয়ে বলে : হতাশ হবার কোনো কারণ নেই; প্রয়োজন যা তা হল ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তেমনভাবে এক হওয়া, যেমনভাবে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে এদেশের মানুষ একবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

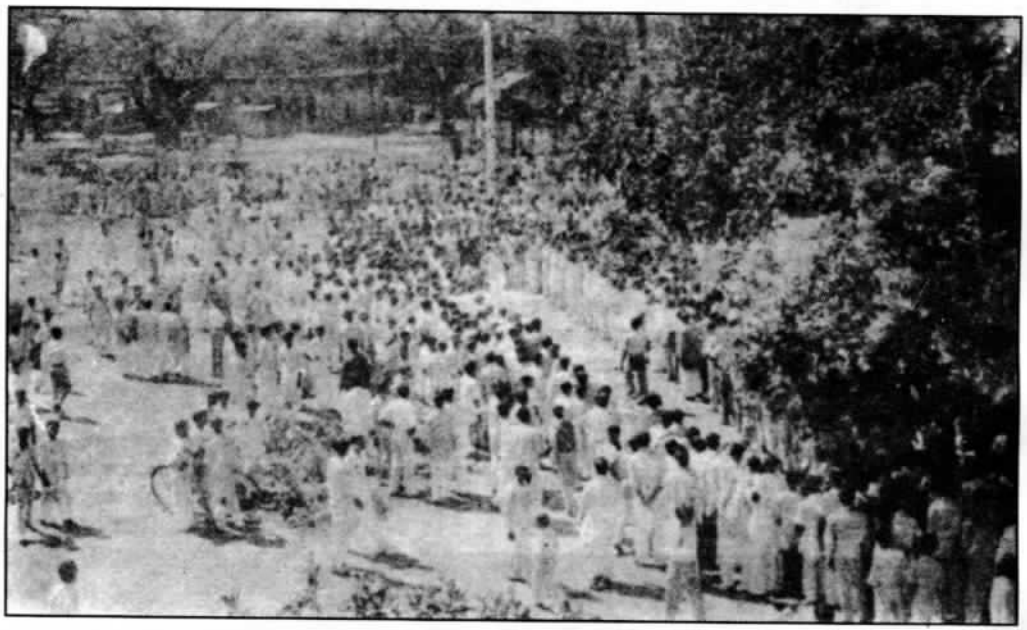

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি

অস্কার ওয়াইল্ড

নাইটিংগেল পাখি এবং গোলাপফুল

একটি তরুণ ছাত্র আক্ষেপ করে বলল—মেয়েটি কথা দিয়েছে আমি যদি তাকে একটি লালগোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে নাচবে। কিন্তু হায়রে, আমার সারা বাগানে একটিও লালগোলাপ নেই।

ওকগাছের ডালে বসে একটি নাইটিংগেল তার কথাগুলি শুনল: তারপরে সে পাতার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল।

ছেলেটির সুন্দর চোখদুটি জলে টলটল করছে।

সারা বাগানে আমার একটিও লাল গোলাপ ফোটেনি। হায়রে, কত ছোট-ছোট জিনিশের ওপরেই-না মানুষের সুখ নির্ভর করে। জ্ঞানী মানুষেরা আজপর্যন্ত যা-কিছু লিখেছেন সে সবই আমি পড়েছি; দর্শনশাস্ত্রের গোপন রহস্যটুকুও আমার জানা। তবু একটি লালগোলাপের অভাবে আমার জীবন আজ নষ্ট হতে বসেছে।

নাইটিংগেল পাখি বলল—এতদিন পরে সত্যিকারের একজন প্রেমিকের দেখা পেলাম। আমি জানতাম না এরই জন্যে রাতের পর রাত আমি প্রেমের গান গেয়েছি। রাত্রির পর রাত্রি নক্ষত্রদের কাছে আমি এরই গল্প বলেছি। এখন সাক্ষাতে দেখলাম একে। এর চুলগুলি কচুরিপানার ফুলের মতো কালো কুচকুচে, ঠোঁটদুটি কামনার গোলাপি রঙে রাঙানো; কিন্তু উদগ্র কামনায় বিবর্ণ হাতির দাঁতের মতো এর রঙ; গভীর একটি দুঃখ এর কপালে তার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

যুবকটি বিড়বিড় করে বলল—কাল রাত্রিতে রাজকুমার নাচের আসর বসাবেন। আমার প্রেমিকা যাবে সেখানে নাচতে। আমি যদি তাকে একটা লালগোলাপ দিতে পারি তাহলে সে আমার সঙ্গে সারারাত নাচবে। আমি যদি তাকে একটা লালগোলাপ এনে দিতে পারি তাহলে সে আমার বাহুর মধ্যে ধরা দিয়ে আমার বুকের ওপরে তার মাথাটা রাখবে; তার দুটি হাত আমার হাতদুটির কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু আমার বাগানে কোনো লালগোলাপ নেই; তাই আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে রয়েছি; সে আমাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাবে; সে তাকাবে না আমার দিকে; আমার হৃদয় যাবে ভেঙে।

নাইটিংগেল বলল—এইতো আসল প্রেমিক। আমি যে-দুঃখের গান গাই সেই দুঃখই এ ভোগ করছে; আমার কাছে যেটা আনন্দ এর কাছে সেইটাই দুঃখ। প্রেম কতই-না আশ্চর্য বস্তু! এমারেলড-এর চেয়েও দামি, ওপ্যাল পাথরের চেয়েও প্রিয়। কোনো দামেই ওকে কেনা যায় না; মাঠে বাজারে ও-জিনিশ বিকোয় না।

যুবকটি আক্ষেপ করতে শুরু করল—নাচের মজলিশে বাজনাদারেরা বসে-বসে বাজনা বাজাবে, সেই বাজনার সুরে-সুরে আমার প্রেমিকা নাচবে। এমন লঘু পদসঞ্চারে সে নাচবে যে, মেঝের ওপরে তার পা-ই যাবে না দেখা। রাজপুরুষেরা ভিড় করে দাঁড়াবে তার চারপাশে, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর নাচবে না—আমি তাকে কোনো লালগোলাপ দিতে পারিনি।—এই বলে সে ঘাসের ওপরে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।

লেজ তুলে তার পাশ দিয়ে দৌড়ে যেতে-যেতে একটা সবুজ রঙের গিরগিটি হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—ছেলেটা কাঁদছে কেন?

সূর্যকণার উদ্দেশে উঠতে-উঠতে একটা প্রজাপতিও সেই একই প্রশ্ন করল।

—তাইতো, তাইতো!

একটা ডেইজি ফুল তার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপারটি কী বলো তো?

উত্তর দিল নাইটিংগেল—ও কাঁদছে লালগোলাপের জন্যে।

সবাই চিৎকার করে উঠল—লালগোলাপের জন্যে? অবাক কাণ্ড!

ওদের মধ্যে সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী বাচ্চা গিরগিটিরা হেসে উঠল হো-হো করে।

কিন্তু ছেলেটির দুঃখ কোথায় তা বুঝল নাইটিংগেল। ওকগাছের পাতার মধ্যে চুপটি করে বসে সে প্রেমের রহস্যের কথা ভাবতে লাগল।

হঠাৎ দুটো ডানা মেলে সে কাঁপিয়ে পড়ল শূন্যে; তারপরে হাওয়ার বুকে উড়তে লাগল। তারপরে ছায়ার মতো সে বাগানের ওপর দিয়ে গেল উড়ে। ঘাসে জাজিমের মাঝখানে একটি সুন্দর গোলাপগাছ দাঁড়িয়ে ছিল। তারই পাশে গিয়ে সে বলল—আমাকে একটা লালগোলাপ দাও। প্রতিদানে তোমাকে আমি আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

ঘাড় নেড়ে গোলাপগাছটি বলল—আমার সব ফুলই শাদা। সমুদ্রের ফেনার মতো শাদা। পাহাড়ে যে বরফ জমে থাকে এর রঙ তার চেয়েও শাদা। পুরনো সূর্যঘড়ির কাছে আমার ভাই রয়েছে। তুমি বরং সেইখানে যাও; তুমি যা চাইছ সে হয়তো তোমাকে তা দিতে পারে।

সূর্যঘড়ির কাছে গিয়ে নাইটিংগেল সেই গোলাপগাছটিকে বলল—আমাকে একটি লালগোলাপ দাও। প্রতিদানে আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল—আমার ফুল হলদে—জল-অপ্সরীদের কেশদামের মতো পীতবর্ণের, মাঠে-মাঠে যে ড্যাফোডিল ফুল ফোটে তাদের চেয়েও বেশি। কিন্তু ওই ছাত্রটির জানালার ধারে আমার একটা ভাই থাকে। তার কাছে যাও, সে হয়তো তোমাকে লালগোলাপ দিতে পারে।

ছাত্রটির জানালার নিচে যে-গোলাপগাছটি জন্মেছে নাইটিংগেল তার কাছে গিয়ে বলল—আমাকে একটি লালগোলাপ দাও। আমি তোমাকে আমার সবচেয়ে মিষ্টি গান শোনাব।

গাছটি ঘাড় নেড়ে বলল—আমার সব গোলাপই লাল—ঘুঘুপাখির পায়ের মতো লাল—সমুদ্রের তলায় যে-প্রবাল রয়েছে তার চেয়েও লাল। কিন্তু শীত আমার শিরাগুলিকে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধিয়ে দিয়েছে; আর ফোটার আগেই কুয়াশা নষ্ট করে দিয়েছে আমার কুঁড়িগুলি। ঝড়ে ভেঙেছে আমার ডাল। সারাবছরই আমার ডালে কোনো ফুল ফোটেনি।

নাইটিংগেল চিৎকার করেই বলল : আমি কেবল একটি লালগোলাপই চাই—মাত্র একটি। সেটা পাওয়ার কি কোনো উপায় নেই?

গাছটি বলল—আছে। কিন্তু সেটি এত বিপজ্জনক যে বলতে আমি সাহস পাচ্ছিনে।

—আমাকে বলো কোনোকিছু করতেই আমি ভয় পাব না।

গাছটি বলল—যদি তুমি লালগোলাপ পেতে চাও তাহলে চাঁদের আলোয় গান গেয়ে তোমাকে তা তৈরি করতে হবে; রঙিন করে তুলতে হবে তোমার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। কাঁটার বুকে বুক ঠেকিয়ে আমাকে তোমার গান শোনাতে হবে। সারারাত ধরেই গান গাইতে হবে তোমাকে; সেই কাঁটা প্রবেশ করবে তোমার হৃদয়ের গভীরে; তোমার হৃদয়ের রক্ত ঝরে ঝরে আমার শিরায় প্রবেশ করে আমার নিজস্ব হয়ে উঠবে।

নাইটিংগেল চিৎকার করে বলল : একটা লালগোলাপের জন্যে মৃত্যু—দামটা বড়বেশি হয়ে যাচ্ছে। জীবন সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। সবুজ অরণ্যের মধ্যে বসে-থাকা বড় মধুর; বসে-বসে সোনার রথে সূর্য আর মুক্তার রথে চাঁদকে ভেসে বেড়াতে দেখতে খুবই ভালো লাগে। তবু জীবনের চেয়ে মহত্তর প্রেম; আর মানুষের হৃদয়ের কাছে পাখির হৃদয়ের দাম কতটুকু।

এই ভেবে তামাটে রঙের পাখা মেলে সে আকাশে উঠে গেল।

যুবকটি ঘাসের ওপরে পড়ে কাঁদছিল; সে ফিরে এসে দেখল তার সুন্দর চোখদুটির ওপর থেকে তখনও জলের দাগ মুছে যায়নি।

সে চিৎকার করে বলল—শান্ত হও। লালগোলাপ তুমি পাবে। চাঁদের আলোতে বুকের রক্ত দিয়ে সারারাত্রি গান করে তোমার জন্যে একটি লালগোলাপ আমি সৃষ্টি করব। প্রতিদানে আমি কেবল এটুকু চাই যে তুমি সত্যিকার প্রেমিক হবে; কারণ বিজ্ঞ দার্শনিকের চেয়েও প্রেম বিজ্ঞ, ক্ষমতাশালীর চেয়েও প্রেমের ক্ষমতা অনেক বেশি।

মুখ তুলে তাকিয়ে ছেলেটি কথাগুলো শুনল; কিন্তু পাখিটি কী বলতে চাইছে তা সে বুঝতে পারল না; কী ক'রে পারবে? বই-এ লেখা না-থাকলে কোনোকিছুই সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু ওকগাছ সবই বুঝতে পারল; এবং পেরে দুঃখিত হল। তার কোটরে নাইটিংগেল পাখি বাসা বেঁধেছিল। তাকে ওকগাছ সত্যিই বড় ভালোবাসত। ঝোপের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেটি নিজের মনে-মনেই বলল—মেয়েটির চেহারা-যে নিখুঁত সে-বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু অনুভূতি ব'লে তার কি কিছু রয়েছে? সেদিক থেকে আমার সন্দেহ যথেষ্ট। আসল কথাটা হচ্ছে, অধিকাংশ আর্টিস্টের মতোই তার রয়েছে কেবল ভঙ্গিমা—আর সেটি হল অন্তঃসারশূন্য। পরের জন্যে কোনোরকম আত্মত্যাগ সে করবে না। সে কেবল তার সঙ্গীতের কথাই চিন্তা করে আর সবাই জানে যে কলা-মাত্রেই স্বার্থপর, কিন্তু তবু তার কণ্ঠস্বরটি-যে বড় সুন্দর সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। কী দুঃখ! সেই কণ্ঠস্বর অর্থহীন। কারও কোনো মঙ্গল তা দিয়ে হয় না।

আকাশে চাঁদ উঠতেই নাইটিংগেল পাখিটি সেই গোলাপগাছের কাছে উড়ে এল। কাঁটার মুখে ঠেকিয়ে দিল তার বুক। সেই ভাবে রেখে সারারাত্রি ধরেই গান গাইল। হেলে পড়ে সেই গান শুনতে লাগল চাঁদ। সারারাত্রি ধরেই গান গাইতে লাগল সে। আর কাঁটাটা মুহূর্তে-মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে ঢুকতে লাগল। একটু-একটু করে ধীরে-ধীরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে শেষ হয়ে এল তার ধমনীর রক্ত। গোলাপগাছের ডালে একটি সুন্দর ফুল ফুটে উঠল।

কিন্তু গোলাপগাছটি চিৎকার করে বলল—আরও জোরে, আরও জোরে খুদে নাইটিংগেল। নতুবা, গোলাপ ফোটার আগেই সকাল হয়ে যাবে।

সুতরাং নাইটিংগেল আরও জোরে কাঁটার মুখে নিজের বুকটা চেপে ধরল; আর সেইসঙ্গে তার গান জোর থেকে জোরালো হয়ে উঠল।

প্রেমিকের চুম্বনে প্রেমিকার গণ্ডে যেমন লজ্জাবিধুর লাল আভা ছড়িয়ে পড়ে, গোলাপফুলের পাতার ওপরেও তেমনি মিষ্টি একটি লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কাঁটাগুলি তখনও তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেনি। সেইজন্যে গোলাপের হৃদয়টি তখনও শাদাই রয়ে গেল; কারণ পাখিটার হৃদয়ের রক্ত না-পেলে গোলাপের হৃদয় রক্তবর্ণ করবে না। একটা ভীষণ যন্ত্রণা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সেই যন্ত্রণা যতই বাড়তে লাগল ততই তার গান তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল; কারণ তার গান ছিল প্রেমের, যে-প্রেম মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সার্থক। কবরখানার মধ্যে তো প্রেমের বিনাশ হয় না।

এবং প্রভাতের মতো সেই অপরূপ গোলাপটি রঙিন হয়ে উঠল।

কিন্তু নাইটিংগেলের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল; ঝটপট করতে লাগল তার খুদে পাখাদুটি; চোখের ওপরে নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। তার গান অস্পষ্ট হতে লাগল; মনে হল তার গলাটা যেন আটকে আসছে।

তারপরে সে আর-একবার জোরে গান গেয়ে উঠল। শাদা চাঁদ সেই গান শুনল; প্রভাতের কথা ভুলে গিয়ে আকাশের গায়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লালগোলাপ সেই গান শুনল; আনন্দের আতিশয্যে হিল্লোল লাগল তার গায়ে; শীতার্ত প্রভাতের বাতাসে তার পাপড়িগুলোকে দিল মেলে।

গোলাপগাছ চিৎকার করে উঠল—দেখ! দেখ! গোলাপ ফোটা শেষ হল।

কিন্তু নাইটিংগেল কোনো উত্তর দিল না। কারণ, লম্বা ঘাসের বনে, হৃদয়ে কাঁটাবিদ্ধ হয়ে সে মৃত অবস্থায় রইল পড়ে।

এবং দুপুরের দিকে ছাত্রটি তার জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকাল। তারপরেই সে চিৎকার করে উঠল—কী! এইতো এখানে একটা লালগোলাপ। জীবনে এত সুন্দর লালগোলাপ আর কখনো আমি দেখিনি। এটা এত সুন্দর যে মনে হচ্ছে একটা কোনো ল্যাটিন নাম রয়েছে।

এই বলে ঝুঁকে পড়ে সে লালগোলাপটি তুলে নিল। তারপর মাথায় টুপিটা চড়িয়ে সেই গোলাপটা হাতে নিয়ে সে দৌড়ে গেল প্রফেসরের বাড়িতে।

প্রফেসরের কন্যা দরজার সামনে বসে নীলরঙের সিল্কের সুতো গুটোচ্ছিল তখন। তার বাচ্চাকুকুরটা শুয়েছিল তার পায়ের কাছে।

ছাত্রটা চেঁচিয়েই বলল—তুমি বলেছিলে একটি লালগোলাপ এনে দিলে তুমি আমার সঙ্গে নাচবে। এই সেই গোলাপ—তামাম দুনিয়ায় এর চেয়ে সুন্দর গোলাপ আর কোথাও তুমি পাবে না। এটি তুমি আজ তোমার বুকের কাছে পরবে। আমরা যখন নাচব তখন এটিই তোমাকে বলে দেবে আমি তোমাকে কত ভালোবাসি।

ভ্রূকুটি করল মেয়েটি। বলল—ভয় হচ্ছে আমার পোশাকের সঙ্গে এটি মানাবে না। আর তাছাড়া চেম্বারলেন-এর ভাইপো আমাকে কয়েকটি আসল জহরত পাঠিয়েছেন। সবাই জানে জহরতের দাম ফুলের চেয়ে অনেক বেশি।

ছাত্রটি রাগ করে বলল—সত্যি বলতে কী, বড়ই অকৃতজ্ঞ তুমি।

এই বলে ফুলটিকে সে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিল। সেইখানে গাড়ির চাকার নিচে পড়ে সে মিশে গেল মাটির সঙ্গে।

মেয়েটি বলল—অকৃতজ্ঞ! তুমি বড় অভদ্র তো! তাছাড়া তুমি এমন কী একটা বস্তু! মাত্র একজন ছাত্র। চ্যাম্বারলেন? এর ভাইপোর মুক্তোর যে জুতোর লেশ রয়েছে আমার বিশ্বাস তোমার সেটুকু সম্পদও নেই।

এই কথা বলে চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

ফিরে যেতে-যেতে ছাত্রটি বলতে লাগল—ভালোবাসাটা কী বাজে জিনিশ! লজিকের যা দাম রয়েছে তার দাম তার অর্ধেকেও নয়, কারণ, এ কিছুই প্রমাণ করে না। এ এমন সব কথা বলে যা কোনোদিন ঘটে না; মানুষকে এ এমন সব জিনিশ বিশ্বাস করায় যা কোনোদিনই সত্যি হয়ে ওঠে না। আসল কথাটা হল প্রেম জিনিশটাই অবান্তর; আর এ-জগতে যা বাস্তব নয় তা কোনো কাজের নয়। তার চেয়ে আবার আমি দর্শন আর অধিবিদ্যা শাস্ত্রই পড়তে শুরু করি।

এই বলে নিজের ঘরে ধুলোমলিন বিরাট একটা বই বার করে সে পড়তে শুরু করল।

অস্কারওয়াইল্ডের সেরা রূপকথা বই থেকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস

তৃতীয়বার সমুদ্র-অভিযানের পর যখন স্পেনে ফিরে এলেন কলাম্বাস, তখন তিনি বন্দি। সমুদ্র-উপকূলে এসে জাহাজের ডেকে তিনি দাঁড়িয়েছেন, হাত পায়ে শিকল বাঁধা। কান্নায় তাঁর বুক ফুলে-ফুলে উঠছে। জাহাজঘাটে একটি লোকও আসেনি তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। শুধু এসেছে প্রহরীরা। কলাম্বাসের মনে পড়ল আটবছর আগের একদিনের কথা, যেদিন তিনি প্রথমবার অভিযান শেষ করে ফিরেছিলেন। ইউরোপের জন্য তিনি এক নতুন ভূখণ্ড, নতুন দেশ আবিষ্কার করে এসেছেন। সেদিন সমগ্র স্পেনের লোক ভেঙে পড়েছিল বন্দরে, শুধু তাকে দেখবার জন্য, তাঁকে সম্মান জানাবার জন্য। ঘন ঘন কামান গর্জে উঠেছিল, রাশি-রাশি পুষ্পবৃষ্টি। বিজয়ী গর্বে দাঁড়িয়ে সেদিন কলাম্বাস ইউরোপের অভিবাদন গ্রহণ করেছিলেন। আজ তিনি নিঃসঙ্গ, শৃঙ্খলিত। রাজদ্বারে অভিযুক্ত। যে-রাজা রানী তাঁকে অফুরন্ত সুযোগ এবং সম্মান দিয়েছিলেন—আজ তাঁরাই তাঁকে বন্দি করে এনেছেন। দীর্ঘদেহী কলাম্বাস দাঁড়িয়ে আছেন জাহাজের ডেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর।—অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিল তাঁর মন—অভিমানে এবং অপমানে তাঁর বুক ফুলে উঠছে।

কলাম্বাসের জীবনে এমন বহু উত্থান-পতন এসেছে। তাঁর চরিত্রে বিপদের ছোঁয়াচে রোগ ছিল। বারবার তাঁর রক্তে এক অনির্দিষ্ট ডাক এসে পৌঁছুত, যাকে বলা যায় সুদূরের আহ্বান। বিশাল নীল জলরাশি ভেদ করে কোথায় কোন অজানা দেশে পৌঁছবেন—এজন্য তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করত। শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, সমুদ্রের পাড়ে একা বসে আছেন কিশোর কলাম্বাস, উদাস মুখ, সমুদ্রের অকূলের দিকে তাঁর চোখ স্থির নিবদ্ধ, যেমন দিগন্তের ওপারের কোনো অজানা ছবি তাঁর মনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে। ঐ দিগন্তের ওপারে যাবার জন্য বারবার তিনি বিপদে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

আজকের মানুষ মহাশূন্যে অভিযান শুরু করেছে, কিন্তু এর তুলনায় অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেয়াও কলাম্বাসের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচয় ছিল না। সেই সময়, যখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল এই-যে পৃথিবী একটা চৌকো সমতল জায়গা—অনেকদূর ঘোড়া ছুটিয়ে বা জাহাজ চালিয়ে গেলে হঠাৎ একসময় গড়িয়ে নরকে পড়ে যাবে। বিশেষ কিছু সাজসরঞ্জাম ছিল না কলাম্বাসের, কিন্তু তবু তিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটি মহাদেশ—আমেরিকা। সভ্যজগৎকে পথ দেখিয়েছিলেন যে-মহাদেশের, আজ যে-মহাদেশ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, অতবড় একজন আবিষ্কারকের একটি প্রামাণ্য ছবি পর্যন্ত আজও পাওয়া যায় না। জন্ম তারিখ নিয়েও দ্বিধা। মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গী ছিল অল্প কয়েকজন পুরনো বন্ধু এবং নিজের দীর্ঘশ্বাস।

যতদূর জানা যায় কলাম্বাস জন্মেছিলেন ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে, জেনোয়া শহরে। বাবা ছিলেন তন্তুবায়, সেইজন্যেই প্রাচ্যদেশের, বিশেষত ভারতবর্ষের সূক্ষ্মবস্ত্রের সুনামের কথা জানা ছিল; আরও শুনেছিলেন দূরপ্রাচ্যের সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতির নানা মশলাপাতির এবং দারুচিনি দ্বীপের কথা। ছেলেবেলা থেকেই ম্যাপে বা ভূ-গোলকে ঐসব স্বপ্নের দেশে যাবার পথের কথা ভাবতেন।

যুবা-বয়সে কলাম্বাস ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি অধ্যয়ন শেষ করে, নৌ-যুদ্ধ বিভাগে যোগ দিলেন। অবসর সময়ে তিনি ম্যাপ বানিয়ে বিক্রি করতেন। এই ম্যাপ বানাবার অভ্যাস তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিল পরে। মানচিত্রের অর্থহীন রেখার মধ্যে নিরবয়ব দেশগুলি আহ্বান করত তাঁকে, রক্তের মধ্যে যেন অবিরাম শুনতে পেতেন সমুদ্রের গর্জন।

লিসবনে এসে এক বিখ্যাত নৌ-কর্মচারীর মেয়েকে বিয়ে করলেন। এর আগে পর্যন্ত কলাম্বাস কখনো জোর দিয়ে ভাবেননি, জীবনে তিনি কী করতে চান। কিন্তু বিবাহের পর, তাঁর জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। নিশানাহীন সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে যাবার পথ আবিষ্কার করবেন—এই হল তাঁর জীবনের একমাত্র অভীষ্ট। এর কারণ, কলাম্বাসের শ্বশুরমহাশয় ছিলেন অভিজ্ঞ নাবিক, বহু সূক্ষ্ম মানচিত্র এবং সমুদ্র-অভিযানের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল তাঁর। এছাড়া তিনি ভারতবর্ষ এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের একটি বর্ণনা লিখেছিলেন—এবং তা পড়ে কলাম্বাসের আকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল হয়।

গ্লোবের উল্টোপিঠে আছে পূর্বএশিয়া, এই ছিল কলাম্বাসের ধারণা, এবং সেখানে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তখন বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল ইওরোপের—কিছু আরবীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে স্থলপথে। ইওরোপের প্রত্যেকটি দেশ তখন চেষ্টা করছিল জলপথে একটি সহজ যোগাযোগের উপায় খুঁজে বার করতে। পর্তুগিজরা বারবার চেষ্টা করেছিল আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ঘুরে ভারতবর্ষে পৌঁছবার (এবং শেষপর্যন্ত সক্ষম হয়েছিল তারাই)। কলাম্বাসের ধারণা, আরও সংক্ষিপ্ত পথ আছে।

তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরতে লাগলেন রাজদ্বারে দ্বারে। প্রথমে গেলেন জেনোয়ায়। উপহসিত হয়ে ফিরে এলেন। তারপর পর্তুগালে। ইংল্যান্ডে গেলেন—তখন ইংল্যান্ডের সম্রাট ছিলেন ৭ম হেনরি, তিনি কর্ণপাত করলেন না। কলাম্বাসের মন ভেঙে পড়ছিল—তবু সম্পূর্ণ নিরাশ না হয়ে এলেন স্পেনে।

স্পেনে কলাম্বাসকে দীর্ঘ আট বছর কাটাতে হয়েছে উমেদারি করে। স্পেনের রাজা-রানী ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা কখনও সম্পূর্ণ 'না' বলেননি, বিশেষত রানী ইসাবেলা, উৎসাহই দেখাচ্ছিলেন কিন্তু শর্তে মিলছিল না। জীবন বিপন্ন করে কলাম্বাস যে-নতুন দেশে যাবেন—সে-দেশের রাজপ্রতিনিধি করতে হবে তাঁকে এবং রাজস্বের অংশ দিতে হবে—এই ছিল কলাম্বাসের দাবি। কিন্তু রাজা এবং রাজসভা সাহায্য করতে রাজি হলেন না।

ততদিনে কলাম্বাসের পত্নীবিয়োগ হয়েছে, সমুখে এসেছে দারিদ্র্য। পাওনাদারেরা মানচিত্র এবং যন্ত্রপাতিগুলি কেড়ে নিয়েছে ঋণের দায়ে। সংশয়ে ব্যর্থতায় তিনি প্রায় ভেঙে পড়ছেন। একদিন স্পেনের এক পাদরি দেখলেন—কলাম্বাস পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে বিদেশে যাত্রার চেষ্টা করছে। কোথায় যাচ্ছেন?—জিজ্ঞেস করলেন সেই পাদরি।—প্যারিসে, কলাম্বাস উত্তর দিলেন, দেখি ফরাসি দেশের সম্রাটের এই সামান্য দূরদৃষ্টিটুকু আছে কিনা, যা অন্য কোনো রাজাদের দেখছি না।

শেষপর্যন্ত এ-লোকটা দেশান্তরী হবে? পাদরি ভাবলেন। যদি ওঁর পরিকল্পনা কখনও সত্য হয়, তবে সে-কৃতিত্বের গৌরব স্পেন পাবে না। তিনি কলাম্বাসকে বললেন : আপনি আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি রানীকে আর-একবার বলে দেখি। ঐ পাদরি ছিলেন রানীর কনফেসর অর্থাৎ রানী ওঁর কাছে স্বীকারোক্তি দিতেন। তিনি গিয়ে রানীকে বললেন, কলাম্বাসের যে-পরিকল্পনা—সেটা কার্যকর করতে যা খরচ তা একটা রাজ্যের পক্ষে এমন কিছুই নয়—কিন্তু সফল হলে প্রতিদান পাওয়া যাবে প্রচুর। তাছাড়া, নব-আবিষ্কৃত দেশের মানুষকে খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত করা যাবে। রানী ভেবে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ কলাম্বাসকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানালেন। সেইসঙ্গে কিছু অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে দিলেন—যাতে কলাম্বাস তাঁর ঘোড়া, জামাকাপড়গুলো বদলে নতুন, রাজসভার উপযুক্ত পোশাক পরে আসতে পারেন।

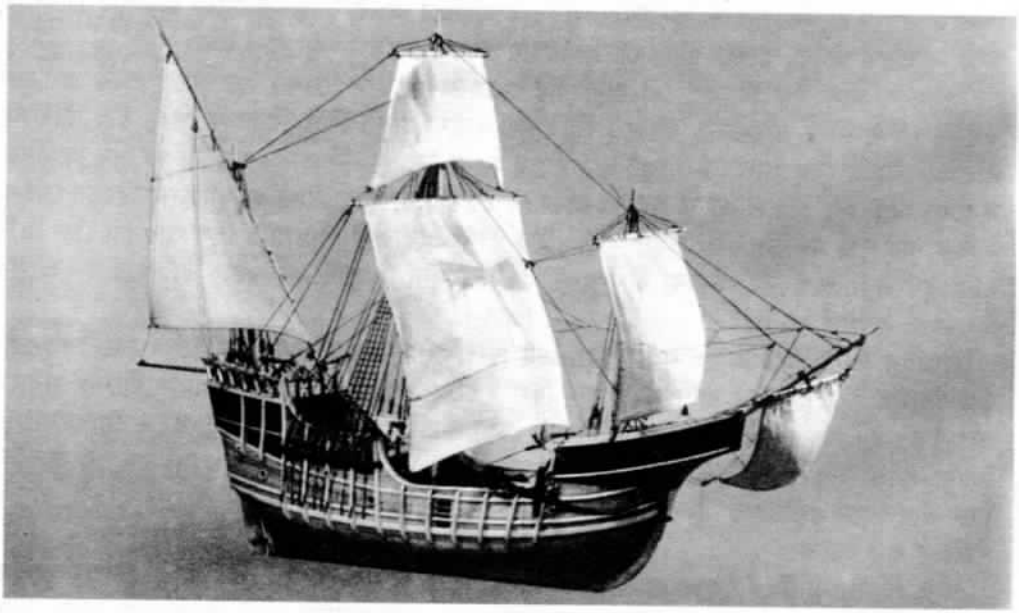

রানীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। 'আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত'—রানী বললেন। এ-কথা বলে একটুক্ষণ থামতে হল তাঁকে; তাঁর মনে পড়ল, রাজা ফার্দিনান্দ এ-প্রস্তাবকে সুনজরে দেখেন না। তাছাড়া সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য—তাই একটুক্ষণ থেমে রানী বললেন, 'যদি প্রয়োজন হয়, আপনার অভিযানের জন্য আমি আমার নিজের অলংকার বন্ধক দিয়ে অর্থ যোগাড় করব।'—এই একটি কথার জন্য এই দূরদর্শিনী রানী ইসাবেলা ইতিহাসে উজ্জ্বল আসন পেয়ে গেলেন।

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট শুক্রবার পালোস বন্দর থেকে কলাম্বাস তাঁর দলবল নিয়ে শুভযাত্রা করলেন। তিনটে ছোট জাহাজ 'পিন্টা', 'নিনা' এবং 'সান্টা মেরিয়া'—সর্বসমেত ১২০ জন লোক। জাহাজঘাটে যারা বিদায় দিতে এসেছিল—তারা চোখের জল ফেলছিল এই ভেবে যে : হায় হায়, ঐ লোকগুলো আর কোনোদিন ফিরবে না। ওরা স্বেচ্ছায় সর্বনাশের মধ্যে যাচ্ছে।

একুশ দিন ধরে অবিরাম জাহাজ ছুটল পূর্বদিকে। কোথাও আর কিছু নেই। মাথার ওপরে এবং জাহাজের নিচে দুটি নীল সমুদ্র। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি, ঢেউয়ের বিদ্রোহ। অনেক দুর্ধর্ষ নাবিক সমুদ্রকে ভয় করে না—কিন্তু কোথায় যাচ্ছি না-জানতে পারলে, বা কোনোদিনই কোথাও পৌঁছুব কিনা, এই সন্দেহ থাকলে ভয় আসেই। অধিকাংশ মাল্লাই অশিক্ষিত, পৃথিবীর সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। সুতরাং ক্রমে-ক্রমে তারা অস্থির হয়ে একদিন বিদ্রোহ করতে চাইল। 'ফিরে যেতে হবে' এই রব তুলল তারা। কলাম্বাস সান্ত্বনা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, বলপ্রয়োগ করে সামলাতে লাগলেন তাদের।

হঠাৎ দেখলেন একটা গাছের ডাল ভেসে যাচ্ছে। 'গাছ' 'গাছ' সবাই চেঁচিয়ে উঠল, নিশ্চয়ই কাছে কোথাও মাটি আছে; হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জাহাজে জাহাজে। একটি পাখি উড়ে যাচ্ছে। 'পাখি পাখি' সবাই চেঁচিয়ে উঠল। কলাম্বাস হুকুম দিলেন ঐ উড়ন্ত পাখির পিছুপিছু জাহাজ চালাতে, খানিকটা বাদে হঠাৎ যেন পাখিটা মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিন মাঝরাত্রে যেন একটা আলো দেখলেন দূরে। পরদিন আবার কিছু নেই কোথাও। তবে বোধহয় ওগুলো মায়া, মৃত্যুর আগেই মানুষ এসব ভোজবাজি দেখে। নাবিকদের মধ্যে আবার অসন্তোষের গুঞ্জরণ ছড়িয়ে পড়ল। কলাম্বাস ঘোষণা করলেন, যে আগে স্থলভূমি দেখতে পাবে তাকে বিরাট পুরস্কার দেওয়া হবে। আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল—চতুর্দিকে চাপা উত্তেজনা, ঢেউয়ের শব্দ যেন ইয়ার্কির সুরে কী সব বলাবলি করছে।

১২ তারিখে রাত দুটোর সময় পিন্টা জাহাজ থেকে কামান গর্জে উঠল। অন্য জাহাজ থেকে কলাম্বাস চমকে উঠলেন, তবে কি নাবিকদের বিদ্রোহ? সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড হৈ-চৈ শোনা গেল, স্থল দেখা গেছে।

কলাম্বাস শান্তভাবে খ্রিস্টমূর্তির সামনে গিয়ে প্রার্থনা করলেন : হে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ, আমি ভারতবর্ষের সন্ধান পেয়েছি। কবরে যাবার দিন পর্যন্ত কলাম্বাসের এই বিশ্বাস ছিল যে তিনি ভারত আবিষ্কার করেছেন। সেদিন যে-স্থলভাগ দেখলেন—সেটা ভারতবর্ষের পশ্চিমদিক—অতএব ওখানকার নাম হল পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—ওয়েস্ট ইন্ডিয়া এবং ওখানকার অসভ্য অধিবাসীরাই ইন্ডিয়ান। তিনি জেনে যাননি ভারতবর্ষ তার বিপরীত দিকে এবং সভ্যতায়-ঐশ্বর্যে তখন বলীয়ান।

পরদিন সকালবেলা কলাম্বাস সদলবলে দ্বীপে অবতরণ করে স্পেনের রাজার নামে পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং সেই দ্বীপের নাম দিলেন 'সান সালভাডর'। সেখানকার আদিবাসীদের কাছে তিনি সোনার সন্ধান করলেন—সামান্য জিনিশপত্র উপহার দিয়ে তাদের কাছ থেকে পেলেনও অনেক ভারী ভারী সোনার তাল। তারা হাত দিয়ে একদিক দেখিয়ে দিল—সেখানে ঐ অদ্ভুত চকচকে জিনিসটার খনি আছে। কলাম্বাস দলবল নিয়ে ছুটলেন সেইদিকে। যাবার পথে আবিষ্কার হল কিউবা, হাইতি

প্রভৃতি দ্বীপ। একটা জাহাজ ভেঙে গেল দুর্ঘটনায়। রসদও ফুরিয়ে এসেছে। এবার ফিরে না-গেলে চলে না। স্বর্ণলোভী নাবিকদের মধ্যে ৩৯ জন সেখানেই থেকে যেতে চাইল, ভাঙা জাহাজের কাঠ দিয়ে একটা বাড়ি বানিয়ে তারা সেখানে রয়ে গেল—কলাম্বাস ফেরার পথ ধরলেন।

ফেরার পথে ভয়ঙ্কর ঝড়, সমুদ্রের কী সংহার-মূর্তি! কলাম্বাস ভাবলেন হয়তো আর ফিরতে পারব না; সভ্য-জগতের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে না এই বিজয়বার্তা। ঐ তুমুল ঝঞ্ঝার মধ্যেও অবিচলিত কলাম্বাস একটা পার্চমেন্ট কাগজে সংক্ষেপে লিখেছিলেন তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত, তারপর সেটা একটা বোতলে ভরে জলে ফেলে দিলেন—যদি তাঁর মৃত্যুর পরেও কোনো সভ্য মানুষের হাতে পড়ে।

সাড়ে ছ-মাস বাদে কলাম্বাস ফিরে এলেন স্পেনে। জামা-কাপড় ছেঁড়া, জাহাজের ভগ্নদশা, কিন্তু চোখেমুখে জয়ের গৌরব। রাজা-রানী ছিলেন বার্সিলোনায়, কলাম্বাস তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যেদিন সেখানে পৌঁছলেন—সমস্ত নগরী সেদিন উৎসবসজ্জায় সেজেছে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। রাজসভায় সিংহাসনের পাশেই তাঁর স্থান হল। আবিষ্কৃত দেশের নানা উপহার তিনি সামনে বিছিয়ে দিলেন। তারপর ভ্রমণের রোমাঞ্চকর গল্প আরম্ভ করলেন। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সকলে শুনতে লাগল তাঁর কথা।

কলাম্বাস মানুষটি ছিলেন কবি-স্বভাবের, তাঁর চরিত্র গাঢ় রঙে আঁকা। সামান্য কারণে হো-হো করে হাসতেন, বিনা-কারণে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তাঁর প্রতি সামান্য ভালোবাসা দেখালে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন, কৃতজ্ঞ থাকতেন সারাজীবন—তাদের জন্য বুকের সব জানালা খুলে দিতেন। আবার কেউ একটু অপমান করলেই মুষড়ে পড়তেন ভয়ানক, যেন ভোগ করতেন মৃত্যুযন্ত্রণা।

সেই বছরই তিনি দ্বিতীয়বার অভিযানে বের হলেন। এবারে বিরাট বহর, দেড় হাজার লোক। যেখানে আগেরবার বাড়ি তৈরি করে ৩৯ জন লোক রেখে গিয়েছিলেন, এসে দেখলেন, বাড়ি নেই, লোকজনও উধাও। আবার সেই হিসপানিওলায় কুঠি তৈরি করে নিজের ভাইকে তার ভার দিয়ে গেলেন। ইউরোপের বাইরে সেই প্রথম ইউরোপের উপনিবেশ। সেবার আবিষ্কার করলেন জ্যামাইকা। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর ভাই কোনোক্রমে হিসপানিওলা থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ইউরোপিয়দের দুর্ব্যবহারে স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে কুঠি ভেঙে দিয়েছে। সেবার কলাম্বাস রাজা-রানীকে প্রচুর সোনা উপহার দিলেন—যা তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গের অভিযাত্রী নাবিকেরা এতে খুশি হল না। তারাও তো নিছক ভ্রমণের আনন্দের জন্য যায়নি, সোনা পেয়ে হঠাৎ বড়লোক হবার জন্যই গিয়েছিল। সুতরাং তারা নতুন দেশ এবং কলাম্বাসের নিন্দে শুরু করে দিল।

এবার কলাম্বাসের পতন আসন্ন হয়ে এসেছে। খ্যাতি এবং সম্মানের উচ্চ শিখরে উঠেছেন, সুতরাং এবার তাঁর শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাবেই। বিশেষত এই লোকটা বিদেশি, ইতালির লোক ক্রিস্টোফার কলাম্বাস, তাঁর স্পেনে এত প্রতিপত্তি অন্যের সইবে কেন? পাদরিরা অসন্তুষ্ট হলেন এই কারণে যে, কলাম্বাস নতুন দেশগুলিতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন না। কলাম্বাসের যুক্তি ছিল এই যে, নব-অধিকৃত দেশগুলিতে আগে শৃঙ্খলা এবং শান্তি আনা দরকার—তার আগে ওসব করতে যাওয়া ঠিক হবে না।

কলাম্বাস তৃতীয়বার অভিযানে বের হলেন ১৪৯৮ সালের ৩০ মে । এবার তিনিই প্রস্তাব করলেন, জেলখানার খুনে-গুণ্ডা বদমাশদের সঙ্গে নিয়ে নতুন দেশগুলিতে কাজে লাগানো হোক। তাই দেওয়া হল। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়রা গোপনে নৃত্য করেছিল এ-সংবাদে। তিনি তিনটি জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন হিসপানিওলার দিকে—নিজে গেলেন অন্যদিকে। আবিষ্কার করলেন ত্রিনিদাদ। তারপর এক বিরাট ভূখণ্ডের সন্ধান পেলেন—যেটা নিশ্চিত কোনো মহাদেশ। কলাম্বাস সেই মহাদেশকে চিনতে পারেননি,

ভেবেছিলেন এশিয়ার অংশ। কিছুকাল পরে আমেরিগো ভেস্‌পুচি নামে একজন বিশেষজ্ঞ গিয়ে প্রমাণ করেন—সেটা এক নতুন মহাদেশ, তার নাম দেওয়া হল আমেরিকা। কিন্তু সেখানকার আদি অধিবাসীদের নাম এখনও রয়ে গেছে রেড-ইন্ডিয়ান।

এদিকে খুনে গুণ্ডার দলবল কলোনিগুলিতে অরাজকতা শুরু করবার চেষ্টা করল। লুটপাটের চেষ্টা করে খেপিয়ে দিল আদিবাসীদের। কলাম্বাস তাড়াতাড়ি সেখানে বিদ্রোহ শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে দাসপ্রথার প্রবর্তন করতে হল। আমেরিকার ঐ কুৎসিত প্রথার পত্তন সে-সময়েই। একদল অনুচর ফিরে এল স্পেনে এবং রটিয়ে দিল যে কলাম্বাস ওখানে স্বাধীন হয়ে রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা এই সংবাদে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল রাজাকে। মুক্তি-পাওয়া গুণ্ডা-বদমাশেরা তাদের প্ররোচনায় রাজবাড়ির সামনে এসে হৈ-হল্লা করতে লাগল : আমরা মাইনে পাইনি, আমরা খাবার পাইনি, কলাম্বাস আমাদের সর্বনাশ করেছে। রাজা প্রাসাদ থেকে বেরুচ্ছেন—তাঁর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ছুটতে লাগল তারা।

এদিকে রাজাও শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন। কলাম্বাসের সম্মান এবং প্রতিপত্তি দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে তিনিও খুশি ছিলেন না। এক-একটা নতুন দেশ আবিষ্কৃত হচ্ছে, চুক্তি অনুযায়ী সেসব দেশের ভাইসরয় হচ্ছে কলাম্বাস। একজন লোকের হাতে এত এত ক্ষমতা রাজার পক্ষে অস্বস্তির কারণ। রানী বরাবরই ছিলেন কলাম্বাসের সমর্থক। তিনি প্রথমটায় কলাম্বাসের নামে কোনো অভিযোগ বিশ্বাস করেননি। একদিন রানী ইসাবেলা পথে দেখলেন, একটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের রমণী, গর্ভিণী অবস্থায় বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। এ কী! আমার নতুন দেশের মেয়েদের এ কী অবস্থা! তাঁকে বলা হল, কলাম্বাসের শাসনে ব্যভিচার, লাম্পট্য, বিশৃঙ্খলা এমন চরম যে, সেখানে প্রায় সব মেয়েরই একই অবস্থা। সেইদিনই রানী সোজা প্রাসাদে ঢুকে কলাম্বাসের বিরুদ্ধে তদন্ত বসাতে সম্মত হলেন।

ফ্রান্সেসকো ডি বোবাডিলা নামে একজন রাজপুরুষকে পাঠানো হল প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে। বোবাডিলা এই সঙ্কল্প নিয়েই গেলেন যে, ঐ উদ্ধত ইতালিয়ানটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। হিসপানিওলাতে এসেই তিনি তলব করলেন কলাম্বাসের ভাইয়ের। কলাম্বাস তখন সেখানে ছিলেন না, ছিলেন ফোর্ট কনসেপ্‌সনে। ভাই ডিয়েগো কলাম্বাস বললেন যে, দাদার অনুমতি ব্যতীত কোনো দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে সম্মত নন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে এবং কলাম্বাসের ছেলেকে বন্দি করা হল। বোবাডিলা স্বয়ং কলাম্বাসের নিজের বাড়িতে এসে উঠে তার কাগজপত্র তছনছ করে ফেললেন এবং কলাম্বাসের জিনিশপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। তারপর কলাম্বাসকে সেখানে আসবার জন্য হুকুম পাঠালেন।

খবর শুনে কলাম্বাস স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তিনি তখন বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। প্রথমে ভাবলেন বুঝি কোনো ডাকাত তাঁর বাড়ি দখল করেছে। তারপর যখন রানীর সিলমোহর দেখলেন—তখন দারুণ অভিমানে তাঁর মন আপ্লুত হল। তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর দলের লোকেরা ঐ ধৃষ্ট রাজপুরুষের কথা শুনতে চায়নি, তাঁরা প্রস্তাব করল ঐ আদেশ অমান্য করার। "আপনি হুকুম দিন স্যার, আমরা এক্ষুনি ঐ বদমাশ বোবাডিলাটার মুণ্ডু উড়িয়ে দিচ্ছি। ওর দলবলকেও সাফ করে ফেলব। ফিরে গিয়ে খবর দেবারও লোক থাকবে না।" কলাম্বাসের হাতে তখন এমন ক্ষমতা ছিল যে স্পেনের রাজার হুকুম তিনি অনায়াসেই অমান্য করতে পারতেন এবং সেই সুদূর উপনিবেশে তাঁকে দমন করা খুব সহজ হত না। কিন্তু কলাম্বাস অনুরোধ করলেন তাদের নিবৃত্ত হতে। কলাম্বাস এসে বোবাডিলার সঙ্গে দেখা করলেন। বোবাডিলা কোনোরকম বাক্যব্যয় না করে তাঁকে নিক্ষেপ করলেন কারাগারে।

কারাগারে বন্দি হয়ে রইলেন ক্রিস্টোফার কলাম্বাস। জুয়াচোর বদমাশদের মধ্যে স্বরাজ এসে গেল। তারা হৈ-হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়াতে লাগল, মেয়েদের পথ থেকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল ইচ্ছেমতো,

কলাম্বাসের নামে থুতু ছেটাতে লাগল, অশ্লীল গালাগালি দিয়ে পোস্টার মারতে লাগল দেয়ালে দেয়ালে। কারাগারে বসে কলাম্বাস সেই হট্টগোল শুনতে পেলেন। অবহেলিতভাবে দিনের পর দিন সেই কারাগারে পড়ে থাকতে থাকতে কলাম্বাসের মনে দারুণ ভয় এল। তাঁর মনে হল, কোনোদিন তাঁর বিচার হবে না, কোনোদিন তিনি নিজের কথা বলার সুযোগ পাবেন না, এইভাবেই এই অন্ধকার ঘরে তাঁকে পচে মরতে হবে। ভবিষ্যৎ যুগে তার নামের সঙ্গে থেকে যাবে এই কলঙ্ক, অপবাদ।

কয়েকদিন বাদে একজন কর্মচারী ঢুকল তাঁর কারাকক্ষে। তাকে দেখে কলাম্বাস শিউরে উঠলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন এবার তাঁকে ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : ভিল্লেজো, ভিল্লেজো, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যেতে এসেছ?

—আপনাকে জাহাজে নিয়ে যেতে এসেছি।

—জাহাজে? না, না। সত্যি কথা বলো।

—না, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনাকে আমি জাহাজ করে স্পেনে নিয়ে যাব।

—সত্যি? ঠিক বলছ? কলাম্বাসের শরীর কাঁপছিল।

—হ্যাঁ, আমি শপথ নিয়ে বলছি। আপনার হাতের শিকল খুলে দেব?

—না। রানীর আদেশে যখন শিকল পরানো হয়েছে তখন যদি খোলা হয় রানীর আদেশেই খোলা হবে। এই অপমানের শিকল আমি সারাজীবন রেখে দেব চিহ্ন হিসেবে।

পরে সারাজীবন, কলাম্বাসের টেবিলের কাছে সেই শিকলটা ঝোলানো থাকত। কলাম্বাসের পুত্র লিখেছেন : তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর কফিনের মধ্যেও যেন ঐ শিকল দিয়ে দেওয়া হয়।

১৫০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর শৃঙ্খলিত, অপমানিত কলাম্বাসকে নিয়ে আসা হল স্পেনে। ক্ষমতাচ্যুতি নয়, আকস্মিক অপমানেই তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি রানীর শিশুপুত্র ডন জুয়ারের ধাত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠি আবার রানীর সামনে পড়া হল। প্রচণ্ড আবেগে দুঃখে লেখা চিঠি। রানী বিচলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন কলাম্বাসের শৃঙ্খল

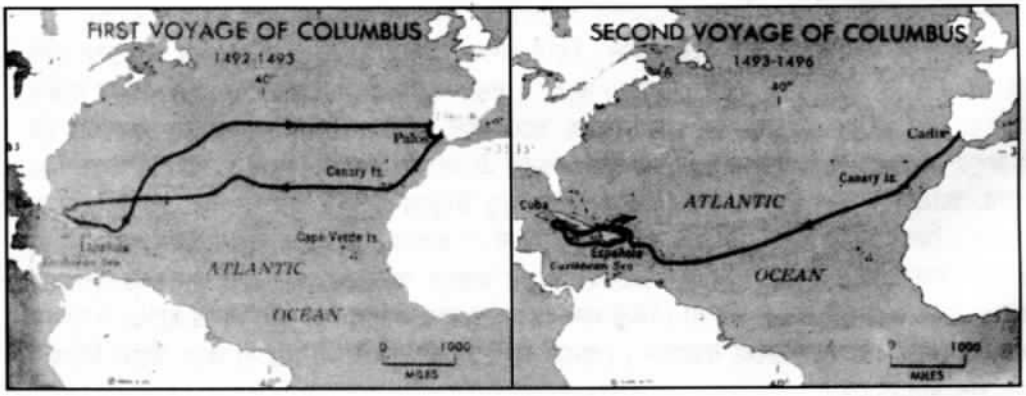

মুক্ত করবার এবং কলাম্বাসকে নিজের মর্যাদার পোশাকেই রাজসভায় হাজির হতে বললেন। সেখানে বিচার হবে।

এমন গুরুত্বপূর্ণ অপরাধীর এমন সংক্ষিপ্ততম বিচার বোধহয় ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায়নি। বাদী প্রতিবাদী কেউ একটিও কথা বলল না, বিচার শেষ হয়ে গেল। বিচার শুনলেই যে আইনের হাজার গ্রন্থি—উকিল সাক্ষীর কথা মনে পড়ে—সেদিক থেকে কলাম্বাসের বিচার চিরস্মরণীয়। রাজসভায় এসে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী ক্রিস্টোফার কলাম্বাস। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু চোখ নিচের দিকে। একটুক্ষণ পরে সোজা তাকালেন রানীর দিকে। নিজের জলভরা চোখ দিয়ে দেখলেন রানী ইসাবেলার চোখেও জল। সঙ্গে সঙ্গে কলাম্বাসের বুক কেঁপে উঠল। তিনি রাজা-রানীর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, একটিও কথা বের হল না। প্রায় পাঁচমিনিট পরে উচ্ছ্বসিত কান্নার সঙ্গে বললেন : আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি, আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি।

সেই প্রবল পুরুষের কান্না ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে উঠল রাজসভায় : আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি, আমি তো বিশ্বাস ভাঙিনি।

বিচার শেষ হয়ে গেল। রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন কলাম্বাসকে সমস্ত পূর্বসম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য রাজা এই প্রতিশ্রুতি পরে সম্পূর্ণ রক্ষা করেননি। রানী ইসাবেলার মৃত্যুর পর কলাম্বাস উপেক্ষিত অনাদৃত হয়ে দারিদ্র্যে জীবন কাটিয়েছেন। তবে, শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছিলেন জনসাধারণের কাছে। বিচারের সময় স্পেনের সাধারণ মানুষ উচ্চকণ্ঠে কলাম্বাসের মুক্তি দাবি করেছিল। যে-দেশ কলাম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন সেই দেশ থেকেই তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বন্দি করে আনা লোকের সহ্য হয়নি।

বৃদ্ধবয়সে আবার একবার কলাম্বাস অভিযানে বেরিয়েছিলেন। সেইটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযান। জাহাজ ভেঙে তিনি সমুদ্র-উপকূলে দলবল নিয়ে আটকে ছিলেন এক বছরেরও বেশি। অনুচরদের মধ্যে ভাঙন ধরে। হিংস্র আদিবাসীদের হাতে বন্দি হয়ে সেবার তাঁর প্রাণ-সংশয় হয়েছিল। কিন্তু বিপদের মধ্যেই তাঁর বুদ্ধি খুলত। সেবার তিনি যে-কায়দায় বেঁচেছিলেন—তা অনেকেরই জানা। তখন ছিল পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের কাল। কলাম্বাস সর্দারকে বলেছিলেন, তাঁকে যদি মুক্তি না-দেওয়া হয় তবে ঈশ্বরের কোপে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রমাণ হিসেবে তারা দেখতে পাবে যে আজ রাত্রেই ভগবান চাঁদকে খেয়ে ফেলছেন। সত্যিই চন্দ্রগ্রহণ দেখে তারা সসম্ভ্রমে কলাম্বাসকে মুক্তি দেয়।

ইতিহাসের বিচারে কলাম্বাস সম্পূর্ণ নির্দোষ নন। উপনিবেশবাদের যে-বীজ তিনি বপন করেছিলেন তার কুফল পৃথিবীর বহু দেশ শতাব্দী ধরে ভোগ করেছে। কলাম্বাস ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থন করেছিলেন। ক্রীতদাসের প্রতি স্প্যানিশদের বর্বর ব্যবহার আজও কুখ্যাত হয়ে আছে। তাছাড়া নতুন-খুঁজে-পাওয়া দেশগুলিতে খনিজসম্পদ ছিল প্রচুর। সোনার খনি উদ্ধারের মারাত্মক লোভে কলাম্বাস যতটা নয়, তাঁর পরবর্তী সশস্ত্র ইউরোপীয়রা স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ভয়ঙ্করতম অত্যাচার করেছিলেন।

কিন্তু আবিষ্কারক হিসেবে কলাম্বাস সত্যিই চিরস্মরণীয়। একজন মানুষ অজানাকে জানতে চেয়েছিল—এই রোমান্টিক স্মৃতি কলাম্বাসের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গল্প আছে যে একবার এক সভায় কলাম্বাসের আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে নানারকম সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছিল। কেউ কেউ বলেছিল, ও আর কী এমন, জাহাজে করে ঘুরতে-ঘুরতে একটা কোথাও নেমে পড়া। এইসব বিতর্কে কলাম্বাস একটা হাঁসের ডিম দেখিয়ে সকলকে বলেছিলেন : এই হাঁসের ডিমটাকে যে-কোনো উপায়ে কেউ টেবিলের উপর লম্বাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন? অনেক চেষ্টা করেও কেউ পারল না।

ওরকমভাবে দাঁড় করানো যায় না। তখন কলাম্বাস একটু ঠুকে ডিমের মাথাটা সামান্য ভেঙে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এ-কাজটা খুবই সামান্য। কিন্তু এখানে এত লোকের মধ্যে আমিই প্রথম উপায়টা দেখালাম।

মৃত্যুর পরও কলাম্বাস কম ভ্রমণ করেননি। কলাম্বাসের মৃত্যু হয়েছিল ভ্যালাডোলিড শহরে। সেখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে সমাধি দেওয়া হল সানডোমিঙ্গোতে। দুশো নব্বই বছর পর সানডোমিঙ্গো ফরাসি-অধীনে যাবার পর সেখানে আর এই স্পেনদেশের গৌরবের মানুষটিকে রাখা যায় না মনে করে মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় কলাম্বাস-আবিষ্কৃত কিউবার হাভানা শহরে। সেখানে এক বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হল।

কিন্তু কলাম্বাস বেশিদিন একজায়গায় চুপচাপ শুয়ে থাকবার মানুষ নন। আবার একশো বছর পর আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বাধবার পর শবাধার তুলে নিয়ে আসা হয়েছিল স্পেনে। সেখানেই কলাম্বাস এখনো পর্যন্ত শান্তভাবে শুয়ে আছেন।

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গাধা ছিল। কোথাও যেতে আসতে গাধাটি ছিল তাঁর নিত্য বাহন।

একদিন এক প্রতিবেশী এসে হোজ্জার কাছে গাধাটি দিনকয়েকের জন্য ধার চাইলেন—কোনো এক জায়গায় যাবার জন্য। ভদ্রলোক এর আগেও একবার গাধাটি দুদিনের জন্য ধার নিয়ে ছিলেন, কিন্তু ফেরত দিয়েছিল তিন সপ্তাহ পরে।

এই লোকটার ওপর হোজ্জা অনেকদিন আগে থেকেই চটেছিলেন। তাই হোজ্জা ঠিক করেছিলেন তাঁকে আর কখনো গাধা ধার দেবেন না। লোকটি গাধা চাইতেই হোজ্জা বললেন : আপনার মতো এমন একজন মাননীয় ব্যক্তি সামান্য একটা গাধা চেয়েছেন, এ দেয়া আর এমন কী বলুন। কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব, গাধাটা হঠাৎ কালই মারা গেছে কিনা তাই...।

লোকটি হোজ্জার কথা বিশ্বাস করে যেই-না বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি বাড়ির ভেতর থেকে গাধাটা চিৎকার করে ডেকে উঠল। লোকটি তাই শুনে ফিরে এসে বললেন : ঐ-যে শুনছি বাড়ির ভেতর গাধা ডাকছে, আর আপনি দিব্যি বলছেন গাধা মরে গেছে?

হোজ্জা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বললেন : আপনি তো আচ্ছা লোক সাহেব। আপনি একটা গাধার কথায় বিশ্বাস করতে পারছেন অথচ ইয়া দাড়িওয়ালা একজন মুমিন মুসলমানের কথা বিশ্বাস করছেন না!

ঘুড়ি নিয়ে কতকিছু

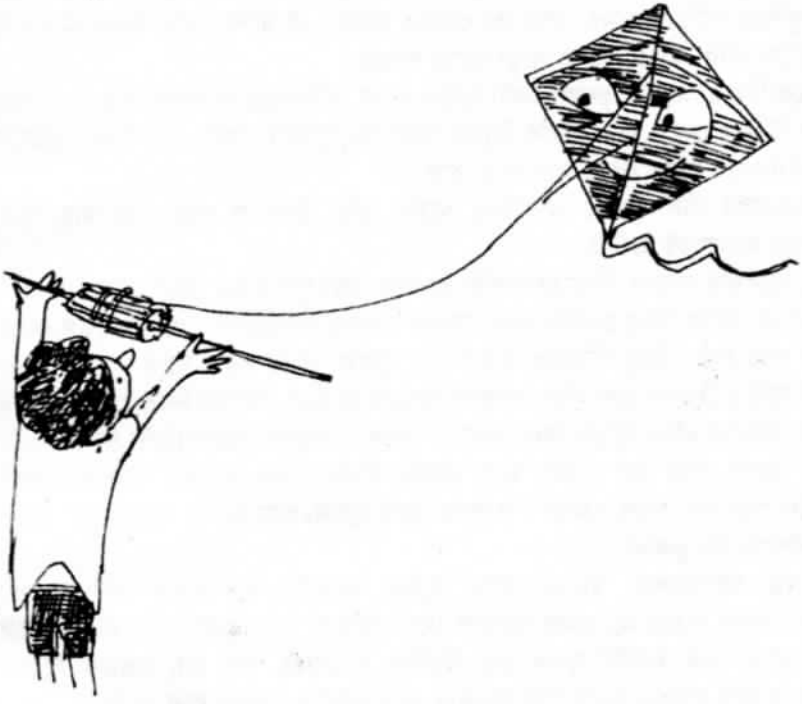

১৮২৫ সালের কথা। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহর। সেই শহরের এক স্কুলে বিজ্ঞান পড়াতেন জর্জ পোকক্। পোককের ছিল একটা জুড়ি-গাড়ি। দুটো ঘোড়া টেনে নিয়ে যেত গাড়িটা। একদিন সেই গাড়িতে চেপে স্কুলে যাবার পথে পোকক্ দেখলেন আকাশে উড়ছে এক ঢাউস ডাকঘুড়ি। সেই ঘুড়ি দেখে পোককের মাথায় চাপল বিচিত্র খেয়াল; এমন অনেকগুলো ঘুড়ি বেঁধে তো ঘোড়া ছাড়াই গাড়ি ছোটানো যায়।

যা ভাবা সেই কাজ। তিনি নিজেই বানালেন অনেকগুলো ঘুড়ি। তারপর সেই ঘুড়ি নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলেন এক ফাঁকা মাঠে। সেইদিন বেশ জোর হাওয়া বইছিল; সেই হাওয়ায় একে একে উড়িয়ে দেয়া হল ঘুড়িগুলো। এরপর সব লাটাই হাতে নিয়ে পোকক্ চড়ে বসলেন গাড়ির চালকের আসনে। বসা মাত্র ঘুড়ির টানে ঘোড়া ছাড়াই গাড়ি ছুটল গড়গড়িয়ে। এমন ঘটনা এর আগে আর ঘটেনি।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনও ছেলেবেলায় ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসতেন। একবার পাড়ার লোকদের চমকে দেবার জন্যে অন্ধকার রাতে ঘুড়ির সঙ্গে একটা লণ্ঠন বেঁধে সেটা আকাশে উড়িয়ে দেন। সেবার প্রতিবেশীরা আকাশে ঐ উড়ন্ত আলোর ফুলকি দেখে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

তবে ইউরোপের মানুষ ঘুড়ি ওড়াতে শিখেছে এই সেদিন। মাত্র শ-পাঁচেক বছর আগে চীনাদের কাছ থেকে ইংরেজ, ওলন্দাজ আর পর্তুগিজেরা প্রথম ঘুড়ি ওড়াতে শেখে। আর চীনের মানুষ ঠিক

কবে-যে প্রথম ঘুড়ি বানিয়েছিল তা বলা শক্ত। তবে হাজার বছরের পুরনো পুঁথি থেকে জানা যায় দেবতাদের পুজো পাঠানোর জন্যেই ওদেশে প্রথম ঘুড়ি ওড়ানো হত। এখনও ইন্দোনেশিয়ার জেলেরা বিশেষ পার্বণে নৌকার আকারের ঘুড়ি বানিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে ওড়ায়। ঐ নৌকায় নাকি মর্ত্যে থেকে স্বর্গে পাঠানো হয় মানুষের আত্মাকে।

পলিনেশিরা দ্বীপে ঘুড়ি বানানো হয় নানা দেবদেবীর আকারে। কম্বোডিয়ার মানুষ রাতে ঘুড়ির সঙ্গে বাঁশের বাঁশি ঝুলিয়ে বাড়ির ছাদের ওপর তা ওড়াতে থাকে। ঐ বাঁশি থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের হয়। ঐ আওয়াজে নাকি অপদেবতারা পাড়া ছেড়ে পালায়।

নববর্ষের দিনে কোরিয়ার অনেক কৃষক একটি ঘুড়ির ওপর পরিবারের সকলের নাম আর সাল লিখে সেটা আকাশে উড়িয়ে দেয়। ঘুড়ি অনেক উঁচুতে ওঠার পর সুতোটা কেটে দেয় তারা। এভাবে ছেলেদের নাকি অপদেবতার নজর থেকে দূরে রাখা যায়।

ভিয়েতনামেও নববর্ষের দিন মাছের আকারের অনেক ঘুড়ি আকাশে ওড়ে। ঐ মাছ নাকি জীবন-নদীতে ভাসমান মানুষেরই প্রতীক।

যুদ্ধে প্রথম ঘুড়ি ব্যবহার করেন চীনা-সেনাপতি হানসিন খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬ অব্দে। সেবার তিনি শত্রুপক্ষের দুর্গ চারিদিক থেকে ঘিরে ভেতরে হানা দেবার মতলব আঁটছিলেন। একটা সুড়ঙ্গ কেটে দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু কীভাবে তাঁর শিবির থেকে দুর্গের দূরত্ব মাপা যাবে? অনেক ভেবে তিনি আকাশে উড়িয়ে দিলেন এক ঘুড়ি। তারপর বাড়তে বাড়তে সেটাকে নিয়ে গেলেন দুর্গের ছাদের ওপর। দুর্গের প্রহরীরা রঙিন ঘুড়ির খেলা দেখতে থাকল। কিছুক্ষণ বাদে ঘুড়িটা নামিয়ে এনে ছাড়া-সুতোর দৈর্ঘ্য মেপে দেখা হল। সেই মাপ থেকে পাওয়া গেল দূরত্বের আন্দাজ। সেই আন্দাজমতো গোপনে শুরু হল সুড়ঙ্গ খোঁড়া। তারপর সেই সুড়ঙ্গ-পথে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল সৈন্যদল। ঘুড়ির দৌলতে হল যুদ্ধজয়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলাকালেও, ১৮৬৫ সালে, ঘুড়ির সাহায্যে শত্রুপক্ষের অধিকার-করা এলাকায় প্রচারমূলক হাজার হাজার-হ্যান্ডবিল আকাশ থেকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। নৌকার সঙ্গে ঘুড়ি বেঁধে কোডি নামে এক মার্কিন যুবক তো ইংলিশ চ্যানেলই পার হয় ১৯০৩ সালে। চোরাচালানের কাজে ফরাসি দেশের মানুষ ঘুড়ি ব্যবহার করে আসছে ১৮৭০ সাল থেকে।

থাইল্যান্ডে এখনও বসন্তের শেষে 'ঘুড়ির লড়াই' রীতিমতো এক উৎসব। দু'দলে ভাগ হয়ে ওই লড়াই চলে। একদল ওড়ায় 'পাপকোস' নামে মেয়ে-ঘুড়ি (হালকা কাগজের লেজুড় লাগানো), অন্যদল ওড়ায় পুরুষ-ঘুড়ি 'চুলাস' (ভারী কঞ্চি দিয়ে বাঁধানো আর বেশ বড়সড়)। পাপকোসের সঙ্গে লাগানো থাকে মাঞ্জা-দেওয়া সুতোর ফাঁস আর চুলাসের সঙ্গে ঝোলানো থাকে ফালি-ফালি কঞ্চি। দুপক্ষেরই জোর লড়াই চলে।

জাপানি উপকথা থেকে জানা যায়—ইশিকাওয়া নামে ছিল এক চোর। একবার সে রাজার দুর্গের চূড়ায় বসানো সোনার ডলফিন মূর্তি চুরি করার ফন্দি আঁটে। কিন্তু কী করে প্রহরীদের নজর এড়িয়ে ঐ উঁচু চূড়ায় পৌঁছানো যায়? অনেক ভেবে সে একটা বিরাট ঘুড়ি বানাল। তারপর অন্ধকার রাতে তার ছেলেদের ডাক দিল ঘুড়িটা ওড়ানোর জন্যে। সেই ঘুড়ির সঙ্গে ইশিকাওয়া নিজেও আকাশে ওড়ার ব্যবস্থা রেখেছিল। সেই ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা হল একটা খাঁচা। সেই খাঁচায় চেপে সে পাড়ি দিল আকাশে। তার ছেলেরা এরপর ঘুড়িটাকে নিয়ে গেল সেই কেল্লার চুড়োর কাছাকাছি। কিন্তু বেচারা ইশিকাওয়া! সোনার ডলফিনের পাখনাটা কোনোমতে হাত বাড়িয়ে ধরামাত্র বাতাসের ঝাপটায় ঘুড়িটা সরে গেল অন্যদিকে। শুধু ভাঙা পাখনার টুকরোটাই থেকে গেল তার হাতে। এরপর হাজার চেষ্টা করেও ঘুড়িটাকে সোনার ডলফিনের কাছে আর

নিয়ে যাওয়া গেল না। অগ্যতা ইশিকাওয়ার ছেলেরা ঘুড়িটাকে নামিয়ে আনল মাটিতে। পরদিন সকাল হতেই কেল্লার প্রহরীরা দেখল ভোরের রোদ-ঝলসে-ওঠা ডলফিনের একটা পাখনা নেই। দেখামাত্র শোরগোল পড়ে গেল। চারিদিকে শুরু হল খোঁজাখুঁজি। শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেল ইশিকাওয়া। তার ঘরে পাওয়া গেল ডলফিনের পাখনা। তখন রাজামশায় গরম তেলের জালায় ওই চোরকে ডুবিয়ে মারার হুকুম দিলেন। ঘুড়িতে চেপে প্রথম আকাশে চড়া মানুষটির জীবন শেষ হল ভারি করুণভাবে।

কিন্তু এ তো গেল গল্পকথা। আধুনিককালে, মানে, ১৮৩০ সালে, ব্রিস্টলের সেই পোকক্ সাহেব প্রথম ঘুড়িতে চাপিয়ে নিজের ছোট্ট মেয়েকে আকাশে বেড়িয়ে এনেছিলেন। সেবার ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল একটা ছোট্ট বেতের চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে পোককের মেয়ে সেবার নাকি আকাশে ৯০ মিটার উঁচুতে উঠতে পেরেছিল। ১৯০০ সালে বেশ কয়েকটা বাক্স-ঘুড়ির সাহায্যে কোডি সাহেব একজন ক্যামেরাধারী যাত্রীকে প্রায় ১২০০ মিটার উঁচুতে পৌঁছে দিয়ে রীতিমতো হৈচৈ তুলে দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, মানে ১৯১৩-১৪ সালে, ঘুড়িতে চেপে শত্রুপক্ষের খোঁজখবর নেওয়া বেশ ভালোমতোই চালু হয়। তখন অবশ্য গ্যাস-বেলুনও ওই কাজে ব্যবহার করা হত। এখন আমেরিকার ছেলেমেয়েরা 'ডেলটা প্লেন' নামে বিরাট ঘুড়িতে চেপে আকাশে উড়ে বেড়াতে অনেকেই পটু; পাহাড় বা উঁচু জায়গার ওপর থেকে বাতাসের বিপরীতে ছুটে গেলেই ওই ত্রিকোণ-আকৃতির ঘুড়ি আকাশে উঠে যায়।

ক্যানভাস বা সিনথেটিক কাপড় আর হালকা ধাতুর ফ্রেম বা রড দিয়ে ওই ডেলটা-প্লেন তৈরি। ভাঁজ করে ওই ঘুড়ি সহজে বহনও করা যায়। ওড়ার সময় যাত্রী একটা হাতল উঠিয়ে বা নামিয়ে ঘুড়ির গতি বা ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করেন। বাতাস থাকলে অনেকক্ষণ আকাশে উড়ে বেড়ানো মোটেই কঠিন কাজ নয়। একালের মার্কিন ছেলেমেয়েদের তাই প্রিয় হবি ডেলটা-প্লেনে চেপে আকাশে ওঠা; পাখির মতো উপত্যকার ওপর ভেসে বেড়ানো।

হাস্যকৌতুক

❑ উকিল : তারপরে, আসামি আপনাকে প্রথম ঘুসি দেবার পর কী হল?
সাক্ষী : সে তৃতীয় ঘুসি দিল।
উকিল : তৃতীয় কেন? বলুন দ্বিতীয়।
সাক্ষী : না, দ্বিতীয়টা আমিই দিয়েছিলাম।

খাঁচার ভেতর পাখি

ছবিটা তোমার চোখের কাছে আনো। খাঁচা আর পাখির মাঝামাঝি তাকাও। ছবিটা যত কাছে আনবে দেখবে পাখিটা খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, আবার দূরে সরালে খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়বে পাখি। একটা শাদা কাগজে ঠিক একই মাপে একটা খাঁচা আর পাখি এঁকে বন্ধুদের দেখাতে পারো।

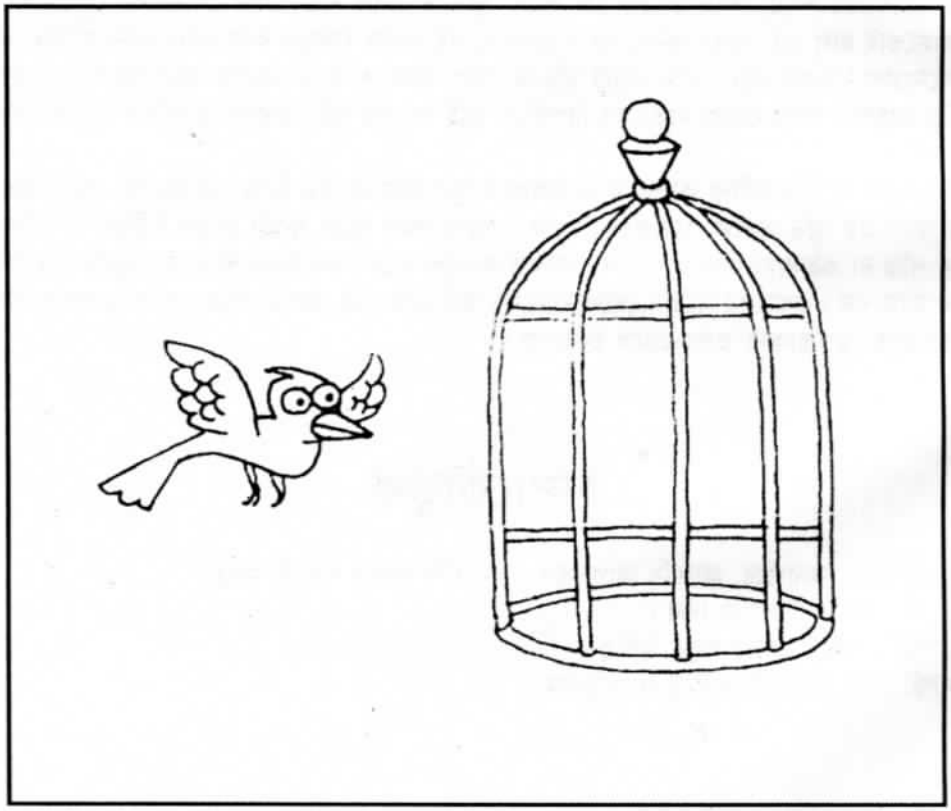

জসীমউদ্‌দীন

নাপিত ডাক্তার

ছোট্ট একটা শহর। সেখানে সবচাইতে বড় ডাক্তার হইয়া পড়িল এক নাপিত। ছোটখাটো অসুখে এটা-ওটা ওষুধ দিয়াই নয়, ফোঁড়া কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া রোগীর পেট চিরিয়া পেট হইতে পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়া পর্যন্ত বড়-বড় কাটা-ফোঁড়ার কাজও সে অতি সহজেই করিয়া দেয়।

এসব কাজ করিতে ডাক্তারেরা কত রকমের যন্ত্র লয়। ছুরি, কাঁচি ভালোমতো গরম পানিতে সিদ্ধ করিয়া, সাবান পানিতে ভালোমতো হাত পরিষ্কার করিয়া কত সাবধান হইয়া তাহারা রোগীর গায়ে অস্ত্র ধরে।

নাপিত কিন্তু এসবের ধারও ধারে না। সে হাতের তেলোয় তাহার ক্ষুর আর নরুন ভালোমতো ঘষিয়া খসাখস বড়-বড় কাটা-ছেঁড়ার কাজ করিয়া যায়। এমন পাকা তাহার হাত; রোগীর পেট চিরিয়া, পেটের মধ্যে হাত দিয়া, যেখানে নাড়ির ভিতরে ফোঁড়াটি হইয়াছে, অতি সহজেই সেখানে ক্ষুর চালাইয়া পুঁজরক্ত বাহির করিয়া আনে। তারপর সাধারণ সুঁই সূতা দিয়া ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া, আর একটু হলুদ গুঁড়া মাখাইয়া দেয়। ক্ষতস্থান সারিয়া যায়। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সে বড়-বড় কাটা-ছেঁড়ার কাজ করিয়া ফেলে। কাহারো ফোঁড়া হইয়াছে, বেদনায় চিৎকার

করিতেছে। দেখি, দেখি বলিয়া নাপিত সেখানে তার ক্ষুর চালাইয়া দিয়া পুঁজরক্ত বাহির করিয়া আনে। রোগী আরাম পাইয়া আনন্দের হাসি হাসে। গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে, দুষ্টু ছেলে খেলিতে-খেলিতে মারবেল-গুলি কানের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে, আর খুলিতে পারে না। নাপিত নরুনের আগা দিয়া গলার ভিতর হইতে মাছের কাঁটা বাহির করিয়া আনে, কানের ভিতরে নরুনের আগা ঢুকাইয়া দিয়া মারবেল বাহির করিয়া আনে। শুধু কি তাই? পিঠে ফোঁড়া হইলে তাকে বলে কারবং কল। বড়-বড় ডাক্তারেরা সেটা কাটিতে হিমসিম খাইয়া যায়। চোখের পলক ফেলিতে-ফেলিতে নাপিত সেখানে ক্ষুর চালাইয়া দেয়।

এসব কাটাকুটিতে সব রোগীই কি ভালো হয়? কোনোটা ভাল হয়—কোনোটা পাকিয়া বিষ লাগিয়া ফুলিয়া মরে। তা এরূপ তো ডাক্তারদের বেলায়ও হয়। তাদের হাতেই কি সব রোগী ভালো হয়?

শহরের সব লোক তাই অসুখে-বিসুখে নাপিতকেই ডাকে। ডাক্তার ডাকিলে এ টাকা দাও—অত টাকা দাও, তারপর ওষুধের দাম দাও। কত রকমের ঝামেলা। নাপিতের কাছে ভিজিটের কোনো দাম-দস্তুর নাই। দুই আনা, চার আনা যার যাহা খুশি দাও। ওষুধ তো তার মুখে-মুখে—গরম পানির সেক, হলুদের গুঁড়ার প্রলেপ, পেটে অসুখ করিলে আদা নুন খাও, তাতে না সারিলে জইনের গুঁড়া চিবাও, জ্বর হইলে তুলসীর পাতা, নিউমোনিয়া হইলে আকনের পাতার সেক। এসব ওষুধ বনে-জঙ্গলে, পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে মেলে। তাই সকলেই নাপিতকে দিয়া চিকিৎসা করায়!

শহরের আর-আর সব পাশ করা ডাক্তারেরা রোগীর অভাবে ভাতে মরে। নাপিতের ছেলেমেয়ে দুধে ভাতে খাইয়া নাদুস-নুদুস। একদিন সব ডাক্তার একত্র হইয়া ভাবিতে বসিল, কি করিয়া তাদের পসার ফিরাইয়া আনা যায়।

এক ডাক্তার বলে, "দেখ ভাই। আগে আমার বাড়িতে রোজ সকালে শত শত রোগী আসিয়া গড়াগড়ি করিত। টাকা-পয়সা তো দিতই, সেই সঙ্গে রোগ সারিলে কলাটা, মূলাটা, যে দিনের যে ফল, তাও দিয়া যাইত। এই যে আমের মওসুম। আমার ছেলেমেয়েরা একটা আমও মুখে দিয়া দেখিল না! আর নাপিতের বাড়ি দেখ গিয়া...

আর এক ডাক্তার বলে, "আরে ভাই! ছাড়িয়া দাও তোমার আম খাওয়া। রোগীপত্তর আসে না। টাকা-পয়সার অভাবে এবার ভাবিয়াছি, ওষুধ মাপার পালা-পাথর, আর বুক দেখার টেথিসকোপটাও বেচিয়া ফেলিব।"

অপর ডাক্তার উঠিয়া বলে, "তুমি তো এখনও বেচ নাই। এই দুর্দিনের বাজারে চাউলের যা দাম! ডাক্তারি যন্ত্রপাতি তো কবেই বেচিয়া খাইয়াছি। এবার মাথার উপরে টিনের চালা কয়খানা আছে। তাও বেচিবার লোক খুঁজিতেছি।"

ওপাশের ডাক্তার বলে, "ভায়া হে, এসব দুঃখের কথা আর বলিয়া কি হইবে? দেখিতেছ না? আমাদের সকলের অবস্থাই ওই একই রকম। এখন কি করা যায় তাই ভাবিয়া বাহির কর?"

আর এক ডাক্তার বলে, "দেখ ভাই! বিপদে পড়িলে বুড়ো লোকের পরামর্শ লইতে হয়। শহরের মধ্যে যে বুড়ো ডাক্তার আছেন, বয়স হইয়াছে বলিয়া এখন রোগী দেখেন না। তিনি আমাদের সকলের ওস্তাদ। চল যাই, তাঁহার নিকটে যাইয়া একটা বুদ্ধি চাই; কি করিয়া আমাদের পূর্বের পসার বজায় রাখিতে পারি।"

তখন সকলে মিলিয়া সেই বুড়ো ডাক্তারের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। বুড়ো ডাক্তার আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা কেহ সেই নাপিতকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

নাপিত আসিলে বুড়ো ডাক্তার তাহাকে বলিলেন, "দেখ এই সব ছোকরা ডাক্তারদের কাছে শুনিতে পাইলাম, তোমার ছেঁড়াকাটার হাত খুব পাকা। তুমি একটা কাজ কর। আমাদের নিকট হইতে শরীর-বিদ্যাটা শিখিয়া লও। তাতে করিয়া তোমার ডাক্তারি বিদ্যাটা আরও পাকিবে।"

নাপিত বলিল, "এ অতি উত্তম কথা। আমি তো মুখ্যুসুখ্য মানুষ। আপনারা যদি কিছু শিখাইয়া দেন বড়ই উপকার হইবে।"

তখন সকল ডাক্তার মিলিয়া নাপিতকে শরীর-বিদ্যা শিখাইতে লাগিল। শরীরের এখান দিয়া এই নাড়ী প্রবাহিত হয়। এইটা শিরা, এইটা উপশিরা। এইখানে ধমনী। এইখানে লিবার। হাতের এইখানে এই শিরা। কাটিলে রক্ত বন্ধ হইবে না। শরীরের ওখানে এই উপশিরা। যদি হঠাৎ কাটিয়া যায়, লোক মরিয়া যাইবে। এইখানে হৃৎপিণ্ড। এইভাবে সাত আট দিন ধরিয়া সব ডাক্তার মিলিয়া নাপিতকে শরীর-বিদ্যা শিখাইতে লাগিল। নাপিত বুদ্ধিমান লোক। ডাক্তারদের যাহা শিখিতে মাসের পর মাস লাগিয়াছিল, সে তাহা সাত আটদিনে শিখিয়া ফেলিল। শুধু কি শরীর-বিদ্যা? ডাক্তারেরা তাহাকে নানারকম অসুখের জীবাণুর কথাও বলিয়া দিল। ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ভালোমতো পরিষ্কার করিয়া না লইলে রোগীর কি কি রোগ হইতে পারে তাহাও বুঝাইয়া দিল।

তারপর সেই বুড়ো ডাক্তারের পরামর্শ মতো সকল ডাক্তার একটি রোগী আনিয়া নাপিতের সামনে খাড়া করিল। তাহার সামান্য ফোঁড়া হইয়াছিল। তাহারা তাহাকে সেই ফোঁড়া কাটিতে বলিল।

নাপিত কতো রকম করিয়া হাত ধোয়। কতো ওষুধ গোলাইয়া তার ক্ষুর-নরুন পরিষ্কার করে, কিন্তু তার মনের খুঁতখুঁতি যায় না। হয়তো তার হাত ভালোমতো পরিষ্কার হয় নাই। হয়তো অস্ত্রে কোনো রোগের জীবাণু লাগিয়া আছে। আবার নূতন করিয়া অস্ত্র সাফ করিয়া নাপিত সেই লোকটির ফোঁড়া কাটিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তার হাত যে আজ কাঁপিয়া ওঠে। শরীরের এইখানে এই শিরা ওইখানে ওই উপশিরা। ওইখান দিয়া ক্ষুর চালাইলে রোগী মরিয়া যাইবে; নাপিত ক্ষুর এভাবে ধরে, ওভাবে ধরে, কিন্তু ফোঁড়া কাটিতে কিছুতেই সাহস পায় না। এতদিন অজানাতে রোগীর গায়ের যেখানে-সেখানে ক্ষুর চালাইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জানিয়া-শুনিয়া সে আজ রোগীর গায়ে ক্ষুর চালাইতে সাহস পায় না। ভয়ে তাহার হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িয়া গেল। নাপিত আর তাহার ক্ষুর চালাইতে পারিল না।

সেই হইতে নাপিতের পসার বন্ধ হইল। লোকেরা আবার ডাক্তার ডাকিতে আরম্ভ করিল।

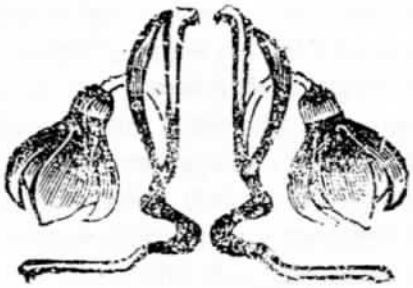

ঝলমলে শহর সিঙ্গাপুর

রাত প্রায় সাতটা। প্লেন থেকেই চারদিকে আলো দেখা গেল। নিচে সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্লেনটা ক্রমশ এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে চলে। সমুদ্রে ভাসমান ছোট্ট নৌকাগুলো ওপর থেকে দেখতে বেশ লাগে, অনেকটা মোচার খোলার মতো। রানওয়ের ওপরে নেমে প্লেন কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামল। একটু পরে প্লেনের দরজা থেকে করিডোর দিয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে এসেই বুঝতে পারা গেল, চেঙ্গি এয়ারপোর্ট কত বড়। অন্য সব বড়-বড় এয়ারপোর্টের মতো সমতলেই এসকেলেটারের ব্যবস্থা আছে এখানেও। মালের জন্য অবশ্য এসকেলেটার দিয়ে নিচের তলায় যেতে হয়। সেখানে ঘরের ভেতরেই দেখা যায় পানির ফোয়ারা ও গাছগাছালির বাহার। আধুনিক বিন্যাসে ঝলমলে এক শহরে-যে পা রেখেছি, সেটা বুঝতে দেরি হয় না।

এখানকার সব ট্যাক্সিই একরকম দেখতে। ঝকঝকে আধুনিক গাড়ি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। জানলা বন্ধ বলে গাড়ির আওয়াজ প্রায় পাওয়াই যায় না। গাড়িতে টেলিফোন রয়েছে। কোন হোটেলে যেতে চাই, বুকিং আছে কি না, এসব গাড়িতে বসেই টেলিফোন তুলে অনায়াসে জেনে নেয়া যায়।

যে-হোটেলে আমার থাকবার কথা, তার সামনে নামতেই একটি মেয়ে এগিয়ে এল, হাতে ওয়েলকাম ড্রিংকস। মেয়েটি চীনদেশীয়। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর তার পরিচ্ছদ। বিশ্ববিখ্যাত হিয়াট-রিজেন্সি গ্রুপের এই হোটেলটি অভিজাত এলাকায়, স্কট রোডে। হোটেলের লাউঞ্জে গাছের ছড়াছড়ি। ডাল-পাতার আলো-ছায়ায় মায়াময় পরিবেশ। চেক-ইন করতে বেশি সময় লাগে না। দশতলায় যে-ঘরটি পাওয়া গেল, সেটি ভারি মনোরম।

ঘরের দরজা খোলার জন্যে চাবি খুঁজবার দরকার নেই, ছোট্ট কার্ডটা দরজার ওপর লাগানো খোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে হয়, পাশে সবুজ আলোটা জ্বলে উঠল কি না। কার্ড বের করে

হাতল ঘোরালোই দরজা খুলে যায়। দরজার লকিং ব্যবস্থা কম্পিউটার-প্রোগ্রাম করা, কার্ডে সেইমতো ছিদ্র করা আছে। ঘরের ভেতরে টেবিলে একটা ঝুড়িতে বেশকিছু নতুন ধরনের ফল। ছোট্ট ফ্রিজে কোল্ড ড্রিংকস, চকোলেট ইত্যাদি। রঙিন টেলিভিশনে শহরের প্রোগ্রাম ছাড়াও ভিডিওতে নানা অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে আধুনিক জীবনের ছোঁয়া লেগেছে সর্বত্র।

আমাদের অঞ্চল থেকে সিঙ্গাপুরে আসতে এমন কিছু সময় লাগে না। এই সেদিনও সিঙ্গাপুর ছিল ইংরেজদের কলোনি। সপ্তম শতাব্দীতে সুমাত্রার প্রাচীন শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অধীনে তেমাসেক বা 'সমুদ্র শহর' (টাউন) নামে এই শহর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শহরটি ওই সাম্রাজ্যের এক রাজ্যে পরিণত হল। এমন গল্প আছে যে, পালেমবেঙ্গের রাজপুত্র স্যাঙ নিলা ইতামা যখন এই জায়গায় পদার্পণ করেন, তখন তিনি এক অদ্ভুত জন্তু দেখতে পান। জন্তুটি খুব সুন্দর দেখতে, এবং চলনে ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্র। এর সম্পূর্ণ শরীর গাঢ় লাল রঙের, অথচ মাথাটা কুচকুচে কালো। তিনি এটাকে সিংহ বলে ভাবলেন (যদিও মনে হয় ওটা একটা এদেশীয় বাঘ ছিল) এবং তা থেকে সিঙ্গাপুরা নামটা চালু হয়। সিঙ্গাপুর কথাটা এসেছে সিংহপুর থেকে। চতুর্দশ শতাব্দীতে জাভা ও শ্যামদেশ (অধুনা থাইল্যান্ড) এখানে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য চীনা-সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে নামে; ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই শহর সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়, এবং পরিত্যক্ত হয়ে কালক্রমে জঙ্গলে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ও ব্রিটিশ বাহিনী জাহাজে এসে এখানে আস্তানা গেড়েছিল, কিন্তু রাজত্ব-স্থাপনে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে জোহর থকে একশোর ওপর মালয়দেশীয় লোক তাদের নেতা তেমেন গঙ-এর আহ্বানে সিঙ্গাপুর নদীর মোহনায় এসে বসবাস শুরু করে। এরপর ১৮১৯ সালে স্যার টমাস স্টেমফোর্ড র‍্যাফলস এসে সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশ জাহাজের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১০০ বছরের ওপর ইংরেজ-রাজত্বে সিঙ্গাপুর শহর ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে। যদিও র‍্যাফলস সিঙ্গাপুরে মাত্র ন'মাস বসবাস করেছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি সিঙ্গাপুরকে এক বাণিজ্যবন্দর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করেন। চীন থেকে এল চা, কাচ ও অন্যান্য দামি সামগ্রী; ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো থেকে এল আবলুস কাঠ, কর্পূর ও গজদন্ত। বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা থেকে এল গোলমরিচ, জায়ফল, দারুচিনি, লবঙ্গ, ধনেগাছ এবং বাটিকের বস্ত্র। এসবই জাহাজে করে লন্ডনে রপ্তানি হতে শুরু করল।

১৯৪২ সালে জাপানি বাহিনীর সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনী সিঙ্গাপুরের দখল নেয়। তখন এখানে সমুদ্রের কাছেই সুভাষচন্দ্রের এক বিরাট স্ট্যাচু বসানো হয়েছিল। ইংরেজরা প্রথমে পালিয়ে গেলেও পরে আবার সিঙ্গাপুরের দখল নেয়, তখন সুভাষচন্দ্রের স্ট্যাচু তারা সরিয়ে ফেলে। ১৯৫৯ সালে সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা পেয়ে স্বয়ংশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। কেমব্রিজে শিক্ষিত লি কুয়ান ইউ নামে এক আইনজীবী যুবকের প্রধানমন্ত্রিত্বে সিঙ্গাপুর উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত ৬১৭ বর্গ কিলোমিটারের এই ছোট্ট দ্বীপটি আজ পৃথিবীর অতি ব্যস্ত একটি বন্দর। ৫৭টি ছোট্ট দ্বীপ নিয়ে ভূ-বিষুবরেখার ১ ডিগ্রি উত্তরে এর অবস্থান। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থল এই বন্দরে প্রচুর জাহাজ অনবরত আসছে ও মাল আদানপ্রদান করে বেরিয়ে যাচ্ছে। বন্দরের পাশেই রয়েছে একটি বিশাল তৈল-শোধনাগার। তেল-শোধনে পৃথিবীতে এই শহরের স্থান তৃতীয় বলে এরা দাবি করে। এই অঞ্চলের নানা সম্পদ, যেমন টিন, রাবার, নারকেল, তেল, চাল, কাঠ, পাট, কফি ও নানারকম মশলা এখান থেকে বিদেশে যাচ্ছে। জাহাজ-মেরামতের কাজেও এই শহর সুনাম অর্জন করেছে। ব্যাংক ব্যবস্থা এখানে খুবই

জোরদার। পৃথিবীর নানা দেশের ব্যাংক রয়েছে এখানে। বেতারযোগে এই শহর পৃথিবীর নানা স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত। এ থেকেও বোঝা যাবে, ব্যবসায়িক দিক থেকে সিঙ্গাপুর কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সারা পৃথিবীর চল্লিশটির ওপর বিমান-লাইনের উড়োজাহাজ এখানকার চেঙ্গি বিমানবন্দরে ওঠানামা করে। ব্যস্ততার সময় প্রায় প্রতি মিনিটে একটি করে বিমান উড়তে বা নামতে দেখা যায়। এই বিমানবন্দর দিয়ে বছরে আসা-যাওয়া করে এক কোটির মতো যাত্রী।

সিঙ্গাপুরের লোকসংখ্যা মাত্র ২৫ লক্ষ। এর শতকরা ৭৭ ভাগ হল চীনা, ১৫ ভাগ মালয়েশীয়, ৬ ভাগ ভারতীয় এবং ২ ভাগ ইউরোপীয়। বেশির ভাগ ভারতীয়ই দক্ষিণভারত থেকে গিয়েছে। করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের লোকই বেশি। তবে বেশকিছু গুজরাতি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পার্শি এবং বাঙালিও আছে। ১৮২৫ সালে ইংরেজ-কর্তারা ভারত থেকে প্রচুর মজদুর সিঙ্গাপুরে নিয়ে যায়। ক্রমশ আরও অনেক ভারতীয় সেখানে শিক্ষকতা, অফিসের চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়। সিঙ্গাপুরের জাতীয় ভাষা চারটি : চীনা, মালয়ি, তামিল ও ইংরেজি।

সিঙ্গাপুরের সবচাইতে বড় আকর্ষণ তার বাজার। চারদিকে প্রচুর দোকান ও বড়-বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। জিনিশের দাম বেশ কম। সিঙ্গাপুরে কোনো জিনিশের ওপর বিক্রয়-শুল্ক ধার্য করা হয় না। এ ছাড়া হংকং, চিন, জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশ থেকে আসা অঢেল জিনিশপত্রে এখানকার বাজার ছেয়ে গেছে। জাপানের ইলেকট্রনিক জিনিশপত্র এখানে খুব সস্তা। আমাদের দেশে এসব জিনিশের যা দাম, কোনো শুল্ক না-থাকায় এখানে তা অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ। সোনাও যথেষ্ট সুলভ। শহরের বড়-বড় দোকানগুলোর মালিক অবশ্য চীনারা। দোকান সপ্তাহে সবদিনই খোলা থাকে।

সারেঙ্গন রোডে, বিশেষত দক্ষিণভারতের খাদ্যসামগ্রী প্রায় সবই পাওয়া যায়। এখানকার চীনা-খাবার আমাদের দেশের চীনা-রেস্তোরাঁর খাবারের চাইতে ভিন্ন ধরনের। এ ছাড়া খাবার তৈরির জন্যে এরা যে-তেল ব্যবহার করে, তাও ভিন্ন স্বাদের, আমাদের ততটা ভালো লাগবে না। অবশ্য সমস্ত ভালো হোটেল বা রেস্তোরাঁতেই ইউরোপীয় খাবার পাওয়া যায়। এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবার পরিবেশন করে যে, প্রশংসা না-করে পারা যায় না।

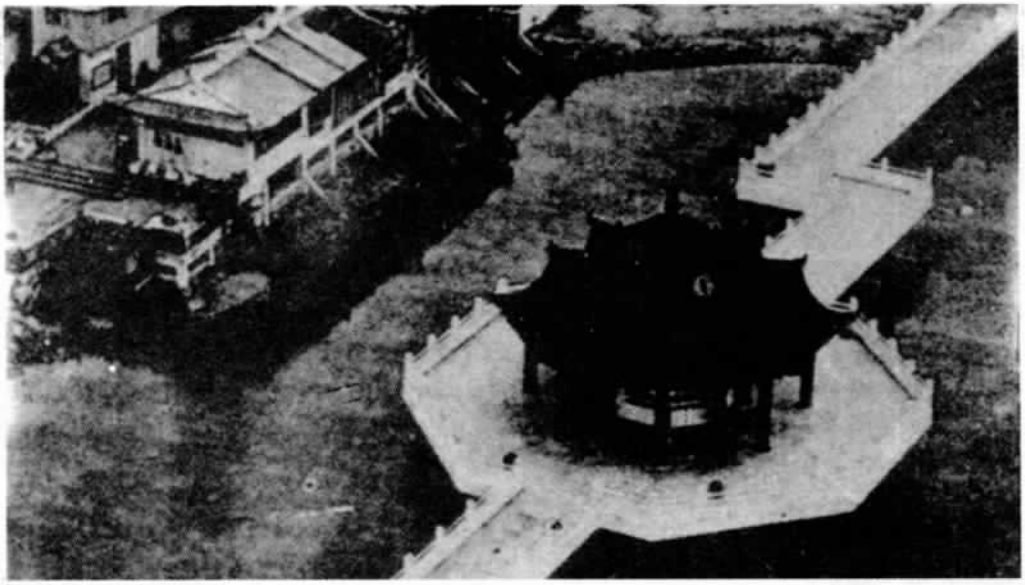

সিঙ্গাপুরকে পর্যটকদের স্বর্গ করে তোলার জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেষ্টার অন্ত নেই। প্রচুর বড়-বড় হোটেল এখানে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু, ৭৭-তলার হোটেল র‍্যাফলস সিটি অবস্থিত এখানেই। যথেষ্ট ভালো মানের ও মাঝারি আকারের হোটেলের সংখ্যা ষাটের বেশি। এ ছাড়াও নানা ধরনের হোটেল আছে। তবে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান থেকে শুধু সিঙ্গাপুর বেড়ানোর জন্যে সেরকম পর্যটক আসছে না। বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ অন্যান্য দেশ মিলিয়ে অনেক যাত্রী এখানে বেড়াতে আসে। অনেক হোটেলেই থাকা-খাওয়া বা কনফারেন্স করার সুযোগসুবিধা প্রচুর। হোটেল র‍্যাফলস সিটিতে একটা ডাইনিং হল আছে, যেখানে ৫০০ লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। এমন হোটেলও আছে, যার ভেতর হলের সংখ্যা কুড়ি।

পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো অনেক কিছুই সিঙ্গাপুরে রয়েছে। ২০ হেক্টর জমি নিয়ে জুরং পাখির পার্কে রয়েছে প্রায় ৩০০০ পাখি। সারা পৃথিবীর প্রায় ৩০০ শ্রেণীর পাখি এখানে রাখা আছে। শহর থেকে বেশকিছুটা দূরে এই পার্ক। ৯০ হেক্টর জমি নিয়ে তৈরি বিশাল চিড়িয়াখানা। সব মিলিয়ে ১৭০ রকমের প্রায় ১৬০০ জন্তু-জানোয়ার আছে এখানে। কম-বেশি ১৫০০ ছোট-বড় কুমির নিয়ে তৈরি কুমিরের মিউজিয়ামও দেখবার মতো। জুরং পাখির পার্কে যাওয়ার পথে জার্ডিন স্টেপস-এ কেব্‌লকার স্টেশন বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ফেরি টারমিনাল থেকে রোপওয়েতে পুলাও স্যান্টোসা নামে প্রমোদ-উদ্যানে যেতে রোমাঞ্চ লাগবে। এটা একটা ছোট্ট দ্বীপ, যেখানে কোরালের অ্যাকোয়ারিয়াম, সামুদ্রিক মিউজিয়াম, খেলাধুলার নানা সরঞ্জাম, সাঁতার কাটার পুকুর ইত্যাদি আছে। সিঙ্গাপুরের চারপাশে আরও কিছু ছোট্ট দ্বীপ আছে, যেখানে বেড়াতে যেতে ভালো লাগবে। এ ছাড়া আছে বোটানিকাল গার্ডেন, পোর্ট ক্যানিং পার্ক, চীনা ও জাপানিদের বাগানগুচ্ছ, মানডাই অর্কিড গার্ডেন, ম্যাকরিচি রিজরভেয়ার পার্ক ইত্যাদি।

সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেদের জন্যে ধর্মীয় উপাসনা-কেন্দ্র রয়েছে। মুসলমানদের মসজিদ, খ্রিস্টানদের জন্যে চার্চ, বৌদ্ধদের গুম্ফা বা বিহার এবং হিন্দুদের জন্যে মন্দির। সব থেকে পুরনো শ্রী মরিয়াম্মান মন্দির চায়নাটাউন এলাকায় অবস্থিত।

চায়নাটাউন সিঙ্গাপুরের এক প্রসিদ্ধ এলাকা। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিরাট উঁচু বাড়ি এবং নানান জিনিশপত্র দিয়ে সাজানো এই অঞ্চলটা। এখানে কমিউনিটি সেন্টারে চীনারা বিকেলে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করে। ছোট্ট-ছোট্ট প্রচুর রেস্তোরাঁ, তাতে সারাক্ষণ ভিড় লেগে আছে। এ ছাড়া নানা ধরনের দোকানগুলোতে পছন্দসই দ্রব্যসামগ্রী খুব সস্তায় পাওয়া যায়।

সিঙ্গাপুরে যেমন প্রচণ্ড উঁচু বাড়ি দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় নানা ধরনের মনোরঞ্জন গাড়ি। বাসগুলো প্রায়শ লাল রঙের। বাসে সাধারণত খুব-একটা ভিড় থাকে না, সহজেই বসার জায়গা পাওয়া যায়। সামনের দরজা দিয়ে বাসে ঢুকতে হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে বাক্সে বাসের ভাড়া ফেলতে হয়। বাসে কোনো কনডাক্টর নেই। ড্রাইভার ইলেকট্রনিক প্রথায় নির্দিষ্ট বোতাম টিপে সঙ্গে-সঙ্গে টিকিট দেয়। টিকিট একটা নির্দিষ্ট বাক্স থেকে বেরিয়ে আসে। পেছনের দরজা দিয়ে নামতে হয়। ড্রাইভার বোতাম টিপলে সামনের ও পেছনের দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায় বা বন্ধ হয়।

শহরটার রাস্তাঘাটও পরিচ্ছন্ন। প্রশস্ত রাস্তায় কোথাও আবর্জনা চোখে পড়ে না। রাস্তায় কাগজের টুকরো বা অন্য কিছু ফেলা নিষিদ্ধ। মাঝে-মাঝেই রঙিন ডাস্টবিন রাখা আছে। প্রচুর গাছপালা শহরটাকে সবুজ করে রেখেছে। এমনকি ওভারব্রিজেও মাটি ফেলে নানা গাছ লাগানো হয়েছে। চেষ্টা করলে একটা বড় শহরকে যে কত ঝকঝকে ও ধোপদুরস্ত করে রাখা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই সিঙ্গাপুরে। নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা ভাষা নিয়ে এখানকার লোকেরা কত সুন্দর পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করছে।

আনন্দমেলা থেকে

বেলুন ফাটলে শব্দ হয় কেন?

একটা বেলুনকে ফোলাতে ফোলাতে অনেক সময়ে সে এমন একটা অবস্থায় আসে যখন আর একটা ফুঁতেই সে ফেটে যায়। কিন্তু বেলুন ফেটে গেলে শব্দ হয় কেন?

এমন তো হতে পারত, ফোলাতে ফোলাতে বেলুন শেষপর্যন্ত ফেটে গেল, কিন্তু কোনো শব্দ কানে এসে পৌঁছাল না।

ফেটে গেলেই যে শব্দ হয়, এর কারণ কী?

শব্দ মানেই বাতাসে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি। পুকুরে ইট ছুড়লে পানিতে যেমন ঢেউ ওঠে, তেমনি বেলুন যখন ফাটে তখনও ধাক্কা লাগে, ঢেউ ওঠে। এমনিতে ফোলানো বেলুন ভেতরের বাতাসকে বাইরের বাতাস থেকে আলাদা করে রাখছে। ফোলা বেলুনের ভেতরের চাপ বাইরের থেকে বেশি। চাপ অতিরিক্ত বেশি হওয়ার জন্য বেলুন যখন ফাটে তখন হঠাৎ বাইরের বাতাসের ওপর বেলুনের ভেতরকার বাতাসের অতিরিক্ত চাপ এসে পড়ে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই-যে তরঙ্গ হল, তা বাতাসের ভেতর দিয়ে কানের পর্দায় এসে ধাক্কা দিয়ে শব্দের অনুভূতি জাগায়।

বোমা যখন ফাটে তখন চারপাশের বাতাসের ওপরে অতিরিক্ত একটা চাপ এসে পড়ে। ফলে আগের মতোই কানে শব্দের অনুভূতি জাগে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিঅলা

টেনিদা বললে, 'আজকাল আমি খুব হিস্টরি পড়ছি।'

আমরা বললুম, 'তাই নাকি।'

'যা একখানা বই হাতে পেয়েছি না, শুনলে তোদের চোখ কপালে উঠে যাবে।' চুয়িং গামটাকে গালের আর-একপাশে ঠেলে দিয়ে ক্যাবলা বলল, 'বইটার নাম কী, শুনি?'

টেনিদা 'হযবরল'র কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো গলায় বলল, 'স্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনান্‌জা বাই সিলিনি কামুচ্চি।'

শুনে ক্যাবলার চশমাটা যেন একলাফে নাকের নিচে ঝুলে পড়ল। হাবলু যেন আঁক করে একটা শব্দ করল। আমি একটা বিষম খেলুম।

ক্যাবলাই সামলে নিয়ে বলল 'কী বললে?'

'স্তোরিয়া দে মোগোরো পুঁদিচ্চেরি—'

'থাক্—থাক্। এতেই যথেষ্ট। যতদূর বুঝছি দারুণ পুঁদিচ্চেরি।'

'আলবৎ পুঁদিচ্চেরি! যাকে বাংলায় বলে ডেনজারাস। ল্যাটিন ভাষায় লেখা কিনা।'

কুঁচো চিংড়ির মতো মুখ করে হাবুল জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি আবার ল্যাটিন ভাষা শিখলা কবে? শুনি নাই তো কোনোদিন।'

খুশিতে টেনিদার নাকটা আটআনার শিঙাড়ার মতো ফুলে উঠল : 'নিজের গুণের কথা সব কি বলতে আছে রে। লজ্জা করে না? আমি আবার এ ব্যাপারে একটু—মানে মেফিস্টোফিলিস—বাংলায় যাকে বলে বিনয়ী।'

ক্যাবলা বললে, 'ধেৎ। মেফিস্টোফিলিস মানে হল—'

টেনিদা বললে, 'চোপ!'

পশ্চিমে থাকার অভ্যেসটা ক্যাবলার এখনো যায়নি। মিইয়ে গিয়ে বলল, 'তব ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি।'

'হ্যাঁ—কোই বাত নেহি।'

এর মধ্যে হাবলা আমার কানে কানে বলছিল, 'হঃ ঘোড়ার ডিম,—বিনয়ী না কচুর ঘণ্ট'—কিন্তু টেনিদার চোখ এড়াল না। বাঘা গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাবলা, হোয়াট সেয়িং ইন প্যালাজ ইয়ার?'

'কিচ্ছু না টেনিদা, কিছু না।'

'কিচ্ছু না?'—টেনিদা বিকট ভেংচি কাটল একটা : 'চালাকি পায়া হ্যায়? আমি তোকে চিনিনে? নিশ্চয়ই আমার বদনাম করছিলি। এক টাকার তেলেভাজা নিয়ে আয় এক্ষুনি।'

'আমার কাছে পয়সা নাই।'

'পয়সা নেই? ইয়ার্কি? ওই-যে পকেট থেকে একটাকার নোট উঁকি মারছে একখানা? গো—কুইক—ভেরি কুইক—'

তেলেভাজা শেষকরে টেনিদা বললে, 'দুঃখ করিসনে হাবলা, এই-যে ব্রাহ্মণভোজন করালি, তাতে বিস্তর পুণ্যি হবে তোর। আর সেই ল্যাটিন বইটা থেকে এখন এমন একখানা গল্প বলব না, যে তোর একটাকার তেলেভাজার ব্যথা বেমালুম ভুলে যাবি।

মুখ গোঁজ করে হাবুল বললে, 'হুঁ।'

ক্যাবলা বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব? হিস্টরির এমন চমৎকার বইখানা পাওয়া গেল কোথায়? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নাকি?'

'ছোঃ! এসব বই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়? ভীষণ রেয়ার! দাম কত জানিস? পঞ্চাশ হাজার টাকা।

'অ্যাঁঃ!

ক্যাবলার চশমা লাফিয়ে আর-একবার নেমে পড়ল। হাবুল কুট করে আমাকে চিমটি কাটল একটা, আমি চাটুজ্জেদের রোয়াক থেকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলুম।

ক্যাবলা বোধহয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু টেনিদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—

: 'স্টপ। অল সাইলেন্ট। আচ্ছা, হ্যামলিন শহরের সেই বাঁশিঅলার গল্পটা তোদের মনে আছে?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়—' আমরা সাড়া দিলুম। সে-গল্প আর কে না জানে! শহরে ভীষণ ইঁদুরের উৎপাত—বাঁশিঅলা এসে তার জাদুকরি সুরে সব ইঁদুরকে নদীতে ডুবিয়ে মারল। শেষে শহরের লোকেরা যখন তার পাওনা টাকা দিতে চাইল না—তখন সে বাঁশির সুরে ভুলিয়ে সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায়-যে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল, কে জানে!

টেনিদা বলল, 'চেঙ্গিস খাঁর নাম জানিস?'

'কে না জানে! যা নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর লোক!'

টেনিদা বললে, 'চেঙ্গিস দেশে-দেশে মানুষ মেরে বেড়াত কেন জানিস? হ্যামলিনের ওই বাঁশিঅলাকে খুঁজে ফিরত সে। কোথাও পেত না, আর ততই চটে যেত, যাকে সামনে দেখত তারই গলা কুচ করে কেটে দিত।'

ক্যাবলা বললে, 'এসব বুঝি ওই বইতে আছে?'

'আছে বই কি? নইলে আমি বানিয়ে বলছি নাকি? তেমন স্বভাবই আমার নয়।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'না না, কখনো নয়।'

টেনিদা খুশি হয়ে বললে, তা হলে মন দিয়ে শুনে যা। এসব হিস্টরিক্যাল ব্যাপার, কোনো তক্কো করবিনে এ নিয়ে। এখন হয়েছে কী, আগে মোঙ্গলদের দেশে লোকের বিরাট বিরাট গোঁফদাড়ি গজাত। এমনকি, ছেলেপুলেরা জন্মাতই আধহাত চাপদাড়ি আর চারইঞ্চি গোঁফ নিয়ে।

ক্যাবলা পুরনো অভ্যেসে বলে ফেলল : 'স্রেফ বাজে কথা। ওদের তো গোঁফদাড়ি হয়ই না বলতে গেলে।'

'ইউ—চোপ রাও!'—টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, 'ফের ডিসটার্ব করবি তো—'। আমি বললুম, 'এক চড়ে তোর কান কানপুরে রওনা হবে।'

'ইয়াহ্—কারেক্ট।'—টেনিদা আমার পিঠ চাপড়ে দেবার আগেই আমি তার হাতের নাগালের বাইরে সরে গেলুম। : 'শুনে যা কেবল। সব হিস্টরি। দাড়ি আর গোঁফের জন্যেই মোঙ্গলরা ছিল বিখ্যাত। বারো হাত তেরো হাত করে লম্বা হত দাড়ি, গোঁফগুলো শরীরের দু'পাশ দিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে পড়ত। তখন যদি মঙ্গোলিয়ায় যেতিস তো সেখানে আর লোক দেখতে পেতিস না, খালি মনে হত চারদিকে কেবল গোঁফদাড়িই হেঁটে বেড়াচ্ছে। কী বিটকেল ব্যাপার বল্ দিকি?'

'ওইরকম পেল্লায় দাড়ি নিয়ে হাঁটত কী করে?'—আমি ধাঁধায় পড়ে গেলুম।

'করত কী, জানিস? দাড়িটাকে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক বস্তার মতো করে বেঁধে রাখত। আর গোঁফটা মাথার ওপর নিয়ে গিয়ে বেশ চুড়োর মতো করে পাকিয়ে—'

হাবুল বললে, 'খাইছে।'—বলেই আকাশজোড়া হাঁ করল একটা।

'অমনভাবে হাঁ করবিনে হাবলা'—টেনিদা হাত বাড়িয়ে কপ করে হাবলুর মুখটা বন্ধ করে দিলে : 'মুড নষ্ট হয়ে যায়। খোদ চেঙ্গিসের দাড়ি ছিল কত লম্বা, তা জানিস? আঠারো হাত। বারো হাত গোঁফ। যখন বেরুত তখন সাতজন লোক সঙ্গে গোঁফদাড়ি বয়ে বেড়াত। বিলেতে রানী-টানীদের মস্ত মস্ত পোশাক যেমন করে সখীরা বয়ে নিয়ে যেত না? ঠিক সেই রকম।

আর দাড়ি-গোঁফের জন্যে মোঙ্গলদের কী অহঙ্কার। তারা বলত, আমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। এমন দাড়ি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দাড়ির রাজা সে যে—হুঁ হুঁ!

কিন্তু বুঝলি, সব সুখ কপালে সয় না। একদিন কোত্থেকে রাজ্যে ছারপোকার আমদানি হল, কে জানে! সে কী ছারপোকা। সাইজে বোধহয় এক-একটা চটপটির মতো, আর সংখ্যায়—কোটি কোটি অর্বুদ নির্বুদ। কোথায় লাগে হ্যামলিন শহরের ইঁদুর!

সেই ছারপোকা তো দাড়িতে ঢুকেছে, গোঁফে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। ছারপোকার জ্বালায় গোটা মঙ্গোলিয়া 'ইয়ে ব্বাস—গেছিরে—খেয়ে ফেলল রে—' বলে দাপাদাপি করতে লাগল। দু-চারটে ধরা পড়ে—বাকি সব-যে দাড়ির সেই বাঘা জঙ্গলে কোথায় লুকিয়ে যায়, কেউ আর তার নাগাল পায় না! আর স্বয়ং সম্রাট চেঙ্গিস। রাতে ঘুমুতে পারেন না—দিনে বসতে পারেন না—'গেলুম গেলুম' বলে রাতদিন লাফাচ্ছেন আর সঙ্গে লাফাচ্ছে দাড়ি-গোঁফ-ধরে-থাকা সেই সাতটা লোক। গোটা মঙ্গোলিয়া যাকে বলে জেরবার হয়ে গেল!

হাবুল বললে, 'অত ঝঞ্ঝাটে কাম কী, দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া ফ্যালাইলেই তো চুইক্যা যায়।'

'কে দাড়ি কামাবে? মঙ্গোলিয়ানরা? যা না, বলে আয় না একবার চেঙ্গিস খাঁকে!'—টেনিদা বিদ্রূপ করে বললে, 'দাঁড়ি ওদের প্রেস্টিজ—গর্ব—বল্ না গিয়ে! এক কোপে মুণ্ডুটি নামিয়ে দেবে'।

হাবলু বললে, 'থাউক, থাউক, আর কাম নাই।'

টেনিদা বলে চলল : 'হুঁ খেয়াল থাকে যেন। যাই হোক, এমন সময় একদিন সম্রাটের সভায় এসে হাজির হ্যামিলনের সেই বাঁশিঅলা। কিন্তু সভা আর কোথায়! দারুণ হট্টগোল সেখানে। পাত্র-মিত্র সেনাপতি-উজির-নাজির সব খালি লাফাচ্ছে, দাড়ি-চুল-ঝাড়ছে—দু-একটা ছারপোকা বেমক্কা মাটিতে পড়ে গেল, সবাই চেঁচিয়ে উঠল : মার্-মার্—ওই যে—ওই যে—

বাঁশিওলা করল কী, ঢুকেই পিঁ করে তার বাঁশিটা দিলে বাজিয়ে। আর বাঁশির কী ম্যাজিক—সঙ্গে সঙ্গে সভা স্তব্ধ! এমনকি দাড়ি-গোঁফের ভেতর ছারপোকাগুলো পর্যন্ত কামড়ানো বন্ধ করে দিলে। গম্ভীর গলায় বাঁশিঅলা বললে, 'সম্রাট তেমুজিন—'

'তেমুজিন আবার কোত্থেকে এল?'—আমি জানতে চাইলুম।

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক আছে। চেঙ্গিসের আসল নাম তেমুজিনই বটে।'

টেনিদা আমার মাথায় কটাং করে একটা গাঁট্টা মারল, আমি আঁতকে উঠলাম।

'হিস্টরি থেকে বলছি, বুঝেছিস বুরবক কোথাকার। সব ফ্যাক্টস! তোর মগজে তো কেবল ঘুঁটে--ক্যাবলা সমঝদার ও জানে।

হাবুল বললে, 'ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও—প্যালাডা পোলাপান।'

'এইসব পোলাপানকে পেলে চেঙ্গিস খাঁ একেবারে জলপান করে ফেলত। যতসব ইয়ে—!' একটু থেমে টেনিদা আবার শুরু করল : 'বাঁশিঅলা বললে, সম্রাট তেমুজিন, আমি শহরের সব ছারপোকা এখনি নির্মূল করে দিতে পারি। একটিরও চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু তার বদলে দশ হাজার মোহর দিতে হবে আমাকে।'

ছারপোকার কামড়ে তখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা, দশ হাজার মোহর তো তুচ্ছ। চেঙ্গিস বললেন, 'দশ হাজার মোহর কেন কেবল, পাঁচ হাজার ভেড়াও দেব তার সঙ্গে! তাড়াও দেখি ছারপোকা!'

বাঁশিঅলা তখন মাঠের মাঝখানে মস্ত একটা আগুন জ্বালাতে বললে। আগুন যেই জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সে পিঁ-পিঁ-পিঁ করে তার বাঁশিতে এক অদ্ভুত সুর বাজাতে আরম্ভ করল। আর—বললে বিশ্বাস করবিনে—শুরু হয়ে গেল এক তাজ্জব কাণ্ড। দাড়ি-গোঁফ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্বুদ-নির্বুদ ছারপোকা লাফিয়ে পড়ল মাটিতে—সবাই হাত-পা তুলে ট্যাঙ্গো-ট্যাঙ্গো জিঙ্গো-জিঙ্গো বলে হরিসংকীর্তনের মতো গান গাইতে গাইতে—

আমি আর থাকতে পারলুম না : 'ছারপোকা গান গায়!'

'চোপ'—টেনিদা, হাবুল আর ক্যাবলা একসঙ্গে আমাকে থামিয়ে দিল।

তখন সারাদেশ ছারপোকাদের নাচে-গানে ভরে গেল। চারদিক থেকে, সব দাড়ি-গোঁফ থেকে, কোটি কোটি অর্বুদ-নির্বুদ ছারপোকা লাইন বেঁধে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে গিয়ে 'জয় পরমাতম্' বলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ছারপোকা পোড়ার বিকট গন্ধে লোকের নাড়ি উলটে এল, নাকে দাড়ি চেপে বসে রইল সবাই।

দু-ঘণ্টার ভেতরেই মঙ্গোলিয়ার সব ছারপোকা ফিনিশ। সব দাড়ি, সব গোঁফ সাফ। কাউকে একটুও কামড়াচ্ছে না। চেঙ্গিস খোশমেজাজে অর্ডার দিলেন—রাজ্যে মহোৎসব চলবে সাতদিন।

বাঁশিঅলা বললে, 'কিন্তু সম্রাট, আমার দশ হাজার মোহর? পাঁচ হাজার ভেড়া?'

আরে, দায় মিটে গেছে তখন, বয়ে গেছে চেঙ্গিসের টাকা দিতে। চেঙ্গিস বললেন, 'ইয়ার্কি? দশ হাজার মোহর, পাঁচ হাজার ভেড়া? খোয়াব দেখছিস নাকি? এই, দে তো লোকটাকে ছ-গণ্ডা পয়সা।'

বাঁশিঅলা বললে, 'সম্রাট, টেক কেয়ার, কথার খেলাপ করবেন না। ফল তাহলে খুব ডেঞ্জারস হবে।'

অ্যাঁ! এ যে ভয় দেখায়! চেঙ্গিস চটে বললেন, 'বেতমিজ, কার সঙ্গে কথা কইছিস, তা জানিস? এই—কৌন হ্যাঁয়—ইসকো কানদুটো কেটে দে তো।'

কিন্তু কে কার কান কাটে? হ্যামলিনের বাঁশিঅলা তখন নতুন করে বাঁশিতে দিয়েছে ফুঁ। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ অন্ধকার করে উঠল ঝড়ের কালো মেঘ। চারদিকে যেন মধ্যরাত্রি নেমে এল। হু-হু করে দামাল বাতাস বইল আর সেই বাতাসে—

চড়াৎ—চড়াৎ—চড়াৎ—

না, আকাশজুড়ে মেঘ নয়—শুধু দাড়ি-গোঁফ। ঠোঁট থেকে, গাল থেকে চড়াৎ চড়াৎ করে সব উড়ে যেতে লাগল—জমাট-বাঁধা দাড়ি-গোঁফের মেঘ আকাশ বেয়ে ছুটে চলল, আর সেই দাড়ির মেঘে, যেন গদির ওপর বসে, বাঁশি বাজাতে বাজাতে হ্যামলিনের বাঁশিঅলাও উধাও।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে সারা মঙ্গোলিয়া এ ওর দিকে থ হয়ে চেয়ে রইল। জাতির গর্ব—দাড়ি-গোঁফের প্রেস্টিজ—সব ফিনিশ! সব মুখ একেবারে নিখুঁত করে প্রায় কামানো, কারো কারো এখানে-ওখানে খাবলা-খাবলা একটু টিকে রয়েছে এই যা। সর্বনেশে বাঁশি তাদের সর্বনাশ করে গেছে।

রইল মহোৎসব, রইল সব। একমাস ধরে তখন জাতীয় শোক। আর দাড়ি-গোঁফ সেই-যে গেল, একেবারেই গেল—মোঙ্গলদের সেই থেকে ওসব গজায়ই না, ওই-দু'চারগাছা খাবলা খাবলা যা দেখতে পাস। হ্যামলিনের বাঁশিঅলা—হুঁ হুঁ, তার সঙ্গে চালাকি!

আর সেই রাত্রেই চেঙ্গিস মানুষ মারতে বেরিয়ে পড়ল। বাঁশিঅলাকে তো পায় না—কাজে- কাজেই যাকে সামনে দেখে, তার মুণ্ডুটিই কচাৎ! বুঝলি—এ হল রিয়্যাল ইতিহাস 'স্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনান্‌জা বাই সিলিনি কামুচ্চি, ফিফথ সেনচুরি বি-সি।'

টেনিদা থামল।

ক্যাবলা বিড়বিড় করে বললে, 'সব গাঁজা।'

ভালো করে টেনিদা শুনতে না-পেয়ে বললে, 'কী বললি, প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা! কী যে বলিস! তাঁর পায়ের ধুলো একটু মাথায় দিতে পারলে বর্তে যেতুম রে!'

লজ্জাবতীর পাতা ছুঁলে নুয়ে পড়ে কেন?

ছোঁয়া লাগলে লজ্জাবতী গাছের পাতা নুয়ে পড়ে—এই পরীক্ষা করে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দেখিয়েছিলেন যে মানুষের মতো গাছেরও অনুভূতি আছে।

আগুনের ছেঁকা লাগলে আমরা হাত সরিয়ে নিই, চোখে বালি পড়লে চোখে পানি আসে— এসব যদি আমাদের অনুভূতির লক্ষণ হয়, তাহলে ছুঁলে লজ্জাবতী গাছের পাতা যখন নুয়ে পড়ে তখন তাকেই বা অনুভূতির নয় বলে উড়িয়ে দেব কেন?

লজ্জাবতীর ছোট ছোট পত্রকগুলো আলো পেলে খুলে যায়, অন্ধকারে বন্ধ হয়। কিন্তু হঠাৎ ছুঁলে লজ্জাবতীর পাতা নুয়ে তো পড়েই, ছোট পত্রকগুলোও বন্ধ হয়ে যায়।

লজ্জাবতীর পাতা কেন নুয়ে পড়ে, এ-ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা অনেককিছুই জানতে পেরেছেন। লজ্জাবতীর পাতার গোড়া একটু ফোলা থাকে। এর ভেতরে বড় বড় অনেক কোষ আছে। এইসব কোষ যখন পানিভর্তি হয়ে ফুলে ওঠে, তখন লজ্জাবতী পাতার ডাঁটিটি সোজা হয়। কিন্তু হঠাৎ পাতা ছুঁলে ওই ফোলা কোষগুলো থেকে পানি বাইরে বেরিয়ে পিছনদিককার কোষে চলে যায়, ফলে কোষগুলো চুপসে পড়ে। চোপসানো কোষে পানির চাপ কম থাকে, তাই লজ্জাবতী পাতার ডাঁটিটিও আর সোজা থাকতে পারে না—সে নিচের দিকে নুয়ে পড়ে।

যে-পাতাটিকে ছোঁয়া হয়, এই ব্যাপারটা শুধু-যে তার মধ্যেই নজরে আসে, এমন নয়—আস্তে আস্তে তা ওপর নিচে সব পাতাতেই ছড়িয়ে যায় এবং এইভাবে সব পাতাই নুয়ে পড়ে। শুধু পাতাগুলো নুয়েই পড়ে না, পাতার ছোট ছোট পত্রকগুলোও জোড়া লেগে বন্ধ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, লজ্জাবতীর পাতা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা তড়িৎ-প্রবাহ গাছের সারাশরীরে ছড়িয়ে পড়ে। 'অ্যাসিটাইল কোলিন' জাতীয় একধরনের রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে এই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। এই রাসায়নিক পদার্থ খুবই দ্রুত এক কোষ থেকে আর-এক কোষে যেতে পারে। এর প্রভাবেই পাতার গোড়ার ফোলা-কোষগুলো থেকে খনিজ লবণ হঠাৎই বাইরে বেরিয়ে আসে। খনিজ লবণ বাইরে বেরিয়ে এলে তার সঙ্গে ফোলা-কোষ থেকে পানিও বেরোয়। আর পানি বেরিয়ে এলেই ফোলা-কোষগুলো চুপসে যায়। কোষ চুপসে গেলে তাদের চাপও কমে যায়, ফলে পাতার ডাঁটিটি আর সোজা থাকতে পারে না—নুয়ে পড়ে।

হাশেম খান

সবচেয়ে পুরনো ছবির কথা

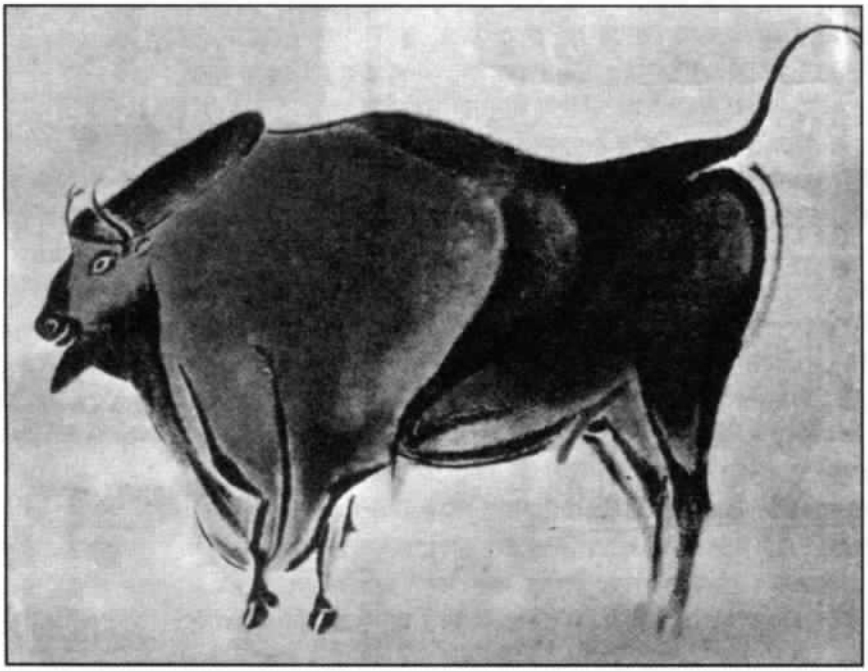

ছবি আঁকা খুব মজার কাজ। রেখার পর রেখা সাজিয়ে, রঙের পর রঙ লাগিয়ে কাগজে যখন একটা ছবি ফুটে ওঠে তখন আনন্দে মন ভরে যায়।

কে, কবে, কখন, ছবি আঁকা শুরু করেছিল, খুব কঠিন এ-কথা বলা। মানুষ কবে থেকে প্রথম ছবি আঁকা শুরু করেছিল—কাল, সময়, ঠিক করে জানা না-গেলেও মানুষের আঁকা সবচেয়ে পুরনো ছবির কথা জানা গেছে।

বহুকাল আগে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে থাকত, বাড়িঘর বানিয়ে বাস করা তখনো শেখেনি—চাষবাস করে ফসল ফলাতেও তারা জানত না, দল বেঁধে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াত, আর পাহাড়ের গুহায় বাস করত। পশু শিকার করে তারা খাবার যোগাড় করত। সেসব পশু ছিল সে-যুগের অতিকায় ম্যামথ, বাইসন, বল্গাহরিণ প্রভৃতি। পশু শিকার করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। সেসব মানুষের গায়ে ছিল লম্বা লম্বা পশম। আমরা যাদের নাম দিয়েছি আদিম মানুষ।

আদিম মানুষ পশুশিকার ছাড়া আর-একটা কাজ করত। তা হল ছবি আঁকা। তারা যেখানে বাস করত—পাহাড়ের গুহার গায়ে শক্ত পাথরের ওপর ছবি আঁকত। আদিম মানুষের এ ছবি-আঁকার খবর মাত্র কয়েক বছর আগে জানা গেছে। আর এ বিরাট খবরটি আবিষ্কার করেছে একটি ছোট্ট মেয়ে।

১৮৭৯ সালে স্পেনে—আলতামিরা নামে এক গুহার খবর পাওয়া গেল। সেখানে আদিম মানুষেরা কোনো-এককালে বাস করত। ঐ এলাকার জমিদার একদিন বের হলেন—গুহার ভেতর তল্লাশি চালাবেন—যদি আদিম মানুষের হাড়গোড় এবং তাদের হাতিয়ার কিছু পাওয়া যায়। সঙ্গে গেল তাঁর পাঁচবছরের মেয়ে। বাবার সঙ্গে সঙ্গে একটু বেরিয়ে আসা যাবে। জমিদার গুহার মেঝে খুঁড়ে হাড়গোড় ইত্যাদি খুঁজছেন। আর মেয়ে মোমবাতি হাতে গুহার ভেতর এদিক-সেদিক ঘুরে দেখছে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল—বাবা, ষাঁড়। বিরাট ষাঁড়। মেয়ের চিৎকারে বাবা চমকে উঠলেন। গুহার ভেতর ষাঁড় আসবে কোত্থেকে! দেখা যাক। ছুটে গেলেন মেয়ের কাছে।

ষাঁড়ই বটে, তবে জ্যান্ত নয়। গুহার দেয়ালে আঁকা এক অতিকায় ষাঁড়ের ছবি। কে এঁকেছে এই ষাঁড়, এ গুহায়—এত অন্ধকারে? আদিম মানুষরা নয়তো?

বাবা ও মেয়ে আরও এগিয়ে গেলেন। গুহার গায়ে আঁকা অসংখ্য জীবজন্তু।

ছোট্ট মেয়ের এই আবিষ্কারের খবর ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। দেশ-বিদেশ থেকে পণ্ডিত লোকদের ভিড় বাড়তে থাকল আলতামিরায়। জল্পনা-কল্পনা চলল—কেন ছবি আঁকত আদিম মানুষ? কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—হতেই পারে না। আদিম মানুষের আঁকা নয় এ ছবি। অসভ্য ও বুনো মানুষের খাওয়া আর বাঁচাই ছিল একমাত্র চিন্তা। তারা কী জন্য আঁকবে ছবি?

তর্কবিতর্ক চলল এসব ছবি নিয়ে। দেখতে দেখতে ষোলো বছর পেরিয়ে গেল। ১৮৯৫ সালে আলতামিরার মতোই আরেকটি আদিম মানুষের গুহা আবিষ্কার হল স্পেনেই। পর পর স্পেনের পিরেনিজের পাহাড়ি অঞ্চলে আরও অনেকগুলো গুহার খবর পাওয়া গেল। গুহায়-যে আদিম মানুষ বসবাস করত তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল। তাদের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ারই হল এসব প্রমাণ।

এরপর ফরাসি দেশে ও উত্তর-আফ্রিকায় আরও অনেকগুলো গুহার খোঁজ পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারও তিনটি বালকের। তারা গিয়েছিল পাহাড়ে ঘুরতে—সঙ্গে ছিল তাদের কুকুর। কুকুর গেল জঙ্গলে হারিয়ে। কুকুরকে খুঁজতে খুঁজতে তারা এসে হাজির হল আদিম মানুষের পরিত্যক্ত গুহায়।

পর পর এতগুলো গুহা আবিষ্কারের পর আদিম মানুষের ছবি-আঁকা সম্পর্কে আর কারও সন্দেহ রইল না।

পণ্ডিতেরা হিসেব করে বলেছেন, পুরনো প্রস্তরযুগের শেষভাগের আদিম মানুষরা এসব ছবি এঁকেছিল। এসব গুহা-চিত্রের বয়স খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বছর থেকে তিরিশ হাজার বছর পর্যন্ত।

শিকার খোঁজা আর শিকার করাই ছিল আদিম মানুষের প্রধান কাজ। শিকার করা ছাড়া খাবার জোগাড় করার অন্য কোনো উপায় তারা তখনো বের করতে পারেনি। সবসময় শিকার করা নিয়েই তারা মাথা ঘামাত। তাই তারা ছবিই এঁকেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শিকারের প্রয়োজনেই তারা শিকারের ছবি এঁকেছে।

দুদিন ধরে বাইসনের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। শিকারকে কিছুতেই ধরাশায়ী করা যাচ্ছে না। তিনদিনের দিন শিকারে বের হবার আগে বাইসনের ছবি এঁকে বের হল। বিশ্বাস—ছবি আঁকা হল যখন, বাইসন ধরা পড়বেই। কিংবা বল্গাহরিণ এঁকে তাকে তীর ছুড়ে জখম করার দৃশ্য আঁকা হল। বিশ্বাস—এভাবেই ছবি আঁকার জাদু দিয়ে বল্গাহরিণকে শিকার করা যাবে। এমনি করে আদিম মানুষ সে-যুগের যেসব জীবজন্তু শিকার করেছে তার শিকারের দৃশ্য এঁকে গেছে। যেমন : ম্যামথ (লোমওয়ালা অতিকায় হাতি), ঘোড়ার পাল, বন্য শূকর ও শিকারির ছবি।

অনেকেই অনুমান করেছেন অন্য কারণেও আদিম মানুষ ছবি এঁকেছে। সে-যুগে যখন খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যেত সে-সময় গুহার বাইরে বের হওয়ার উপায় ছিল না। গুহার ভেতর সময় কাটবে কী করে? ব্যস, ছবি আঁকো—যত ইচ্ছে। অনেকে হয়তো শুধু আঁকার তাগিদেই ছবি এঁকেছে।

জীবজন্তুর ছবি ছাড়া আরও একধরনের ছবি এঁকেছে আদিম মানুষ। তা হল হাত—হাতের তালু। হাতকে তারা খুব মূল্যবান মনে করত। কারণ হাতই ছিল তাদের প্রধান সহায়। হাত দিয়ে তারা যুদ্ধ করত, শিকার করত, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি থেকে শুরু করে আগুন জ্বালা, হাতের ইশারায় ভাবের আদানপ্রদান করা—অসংখ্য কাজ করতে হত। হাতের ছবিগুলো বেশ মজার। মনে হয় হাতের তালু শক্ত পাথরের উপর রেখে তার চারপাশ দিয়ে রঙ লাগিয়ে গেছে। ফলে পাথরের গায়ে হাতের ছবি ফুটে বেরিয়েছে।

এসব হাতের ছবিতে কোনোটায় একটা আঙুল কাটা, কোনো হাতের কড়ে আঙুল নেই। এতে বোঝা যায় তখনকার জীবনযাত্রা কত কঠিন ছিল। যুদ্ধ করতে গিয়ে কিংবা শিকারে গিয়ে হাতের আঙুল খুইয়েছে।

আদিম মানুষ সবাই কি ছবি আঁকত? তা কেন হবে? আদিম মানুষের মধ্যেও কিছু লোক ছবি আঁকায় পারদর্শী ছিল। তারাই এই ছবিগুলো এঁকেছে।

গুহা-চিত্রের শিল্পমান কেমন—এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞরা রায় দিয়েছেন—অসভ্য হলেও আদিম মানুষ অত্যন্ত উন্নতমানের চিত্রকলা উপহার দিয়েছে। জীবজন্তুর বিশেষ বিশেষ দিক বা মূল পরিচয় তারা জোর দিয়ে এঁকেছে। যেমন বাইসন—তার শক্তিশালী দেহ, তড়িৎগতি ও ভয়ঙ্কর রূপটাই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। ফটো তুললে যেমন ছবি হয়—তেমন ছবি আঁকার প্রয়োজন বা ইচ্ছে তাদের ছিল না। ছবিতে আলোছায়া ঠিক হল কিনা, উপর থেকে দেখা, না পাশ থেকে দেখা—সেসবের ওপর তারা মোটেই জোর দেয়নি। জন্তুর পরিচয়টাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। জন্তুর স্বভাব-চরিত্র, গতি, বলিষ্ঠতা ইত্যাদি মিলিয়ে তার আসল রূপটা নিখুঁতভাবে এঁকে রেখেছে। যেমন আলতামিরা গুহার বাইসনের ছবি, ফ্রান্সে দরদনের 'ফন্ট দ্য গ্যাম' গুহার বল্গাহরিণ, বাইসন ও ঘোড়ার একসারি পশু ও শিকারের দৃশ্য।

আঁকার জন্য যেসব রঙ ব্যবহার করা হয়, প্রস্তরযুগে এরূপ রঙের প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা ছবিতে রঙ লাগাত নিজেদের তৈরি রঙ দিয়ে। লাল মাটি, হলুদ মাটি, পশুর চর্বি দিয়ে গুলিয়ে নিয়ে রঙ তৈরি হত। কালো রঙ তৈরি করত পশুর হাড় পুড়িয়ে। সেই রঙ তৈরির পাথরের বাটির পাত্র গুহায় পাওয়া গেছে। এই তিনটি রঙেই গুহা-চিত্র আঁকা হয়েছে। পশুর পশম দিয়ে তুলি বানিয়ে নিত। কিংবা গাছের ডাল চিবিয়ে বা থ্যাবড়া করে নিয়ে তা দিয়ে ছবিতে রঙ লাগাত। পশুর হাড় কেটে চোখা করে তা দিয়ে পাথরের গায়ে আঁচড় কেটে ড্রইং করা হত।

যে-উপায়ে ও যে-উপকরণে গুহা-চিত্র আঁকা হোক-না কেন, নিখুঁতভাবে ছবি আঁকায় তাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তার প্রমাণ হাজার হাজার বছর পরও গুহার গায়ে আঁকা আশ্চর্য ছবিগুলোর ঔজ্জ্বল্য মোটেই নষ্ট হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভুলুরাম শর্মা

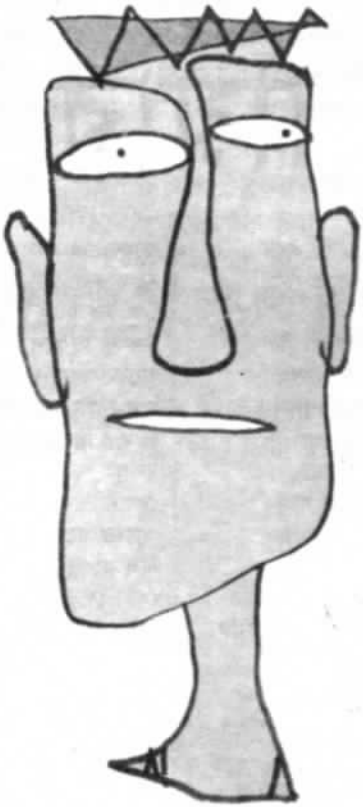

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে
টেরিটি বাজারে গেল মনিবের ফরমাশে।
মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রাদ্ধের
জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের।
বাবু বলে, ভুলো না হে, আরো চাই দরমা।
ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভুলু শর্মা।
কাঁকরোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে।
শাঁক আলু কচু কি না পারে না সে চিনতে।
বকুনি খেয়েছে যেই মাছওলা মিনসের,
তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের।
বাবু বলে, কামরাঙা এতগুলো হবে কী।
ভুলু বলে, কানে আমি শুনি নাই তবে কি।
দেখলেম কিনছে যে ও-পাড়ার সরকার,
বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার।
কানে গুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী
বাবু বলে ফিরে দিয়ে এস তুমি এখনি।
মনিবের হুকুমটা শুনল সে হাঁ করে,
ফিরে দিতে চলে গেল কিছু দেরি না করে।
বললে সে, দোকানিকে যা করেছি জব্দ—
ফলগুলো ফিরে নিতে করেনি টুঁ শব্দ।
বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে তামাকে।
ভুলু বলে, সে-কথাটা বলোনি তো আমাকে।
এসেছি উজাড় করে বাজারের ঝুড়িটা—
দোকানির মাসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা।

জোয়ান অব আর্ক

মাত্র উনিশ বছরের জীবন ছিল সেই চাষার মেয়েটির যিনি শুনতে পেতেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, যিনি তাঁর স্বদেশকে বিজেতার নিগড় থেকে মুক্ত করেছিলেন, আর একটি নির্বীর্য জাতির প্রাণে ও মেরুদণ্ডহীন এক রাজকুমারের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন এক নূতন উদ্দীপনা। ইতিহাসে সেই মেয়েটি 'জোয়ান অব আর্ক' এই বিচিত্র নামে পরিচিত হয়েছেন। এই বীরাঙ্গনার জীবনের কাহিনী পৃথিবীর সকল দেশের লোকই জানে। কিন্তু জোয়ানের জীবনের কাহিনী এমনই সুন্দর যে তা কখনো পুরাতন হয় না, কিম্বা তার পুনরুল্লেখ ক্লান্তিকর বলে বিবেচিত হয় না। পৃথিবীর একাধিক শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও লেখক তার জীবনকাহিনীকে কবিতা ও সাহিত্যে রূপায়িত করে যেমন যশস্বী হয়েছেন, তেমনি কত চিত্রকর ও ভাস্কর ঐ অমর কাহিনীকে রঙে ও রেখায় আর প্রস্তরে রূপায়িত করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পৃথিবীর আর কোনো নারীর ভাগ্যে এমন গৌরবলাভ ঘটেনি। ইতিহাসের বিশাল গগনে জোয়ান অব আর্ক এই নামটি নক্ষত্রের দীপ্তি নিয়ে আজো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। মহাজীবনের চিত্রশালায় বিশ্বাস ও সাহসের দৃষ্টান্ত হিসেবে এই কৃষক কুমারীর নাম আজো ভাস্কর রয়েছে এবং থাকবেও চিরকাল। এই সামান্য চাষির মেয়ে গত পাঁচশত বছর যাবৎ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে দেবীর মতো পুজো পেয়ে আসছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর দুটি নেই।

ফ্রান্সের একটি নগণ্য পল্লীগ্রাম দঁরেমি। সেই গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক-পরিবারে জোয়ান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তখন ঘরে-বাইরে চতুর্দিকে

তার শত্রু। অথচ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম কয় দশকে তার অবস্থা ছিল ঠিক এর বিপরীত; একটি বিরাট জাতির সকল রকম সম্পদের চিহ্নই তখন তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল। তার জমি ছিল উর্বরা ও শস্যশালিনী, আর কৃষকেরা ছিল সুখী ও পরিশ্রমী। সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্সই তখন শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল এবং ঐতিহাসিকদের মতে, ফ্রান্স ভিন্ন ইউরোপের আর-কোনো দেশের জীবনযাত্রার মান এত উন্নত ছিল না, আর জনসাধারণও এমন সুখী ছিল না। সেদিনের ইউরোপীয় চিন্তাধারায় একমাত্র ফ্রান্স ভিন্ন আর-কোনো দেশই নানা বিষয়ে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি।

একশো বছর পরে ফ্রান্সে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেল। তখন ঘরে ও বাইরে তার অনেক শত্রু। এই সুযোগে ইংল্যান্ড ফ্রান্স আক্রমণ করল। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর যুদ্ধ চলতে থাকল দুই দেশে। প্রাচীনকালের সেই ধর্মযুদ্ধের (Crusade) পর পৃথিবীতে এমন দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ আর কোথাও চলেনি। ইতিহাসে এই যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে 'The Hundred Years War' বা 'একশো বছরের যুদ্ধ'। ফ্রান্সের সিংহাসন তখন শূন্য; যুবরাজ সপ্তম চার্লস (ষষ্ঠ চার্লসের পুত্র ডফিন) তখনো পর্যন্ত অনভিষিক্ত। তিনি তখন একরকম রাজ্যহারা ও বন্ধুহারা অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এই বিপদে কী করা উচিত। চার্লসের জীবনের ঠিক এমনি সংকটকালে তাঁর কাছে আশার বাণী বহন করে এনেছিলেন ক্ষুদ্র দঁরেমি গ্রামের সেই কৃষক-কুমারী জোয়ান।

শতবর্ষের যুদ্ধের শোচনীয় ফল তখন জাতির জীবনের সর্বস্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। রাজদরবারে চলছে শুধু ষড়যন্ত্র, আর অসন্তুষ্ট রাজকর্মচারীবৃন্দ একে একে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে দ্বিধাবোধ করছিল না। সকলের উপরে দুর্বল দেহ ও অনভিষিক্ত এক তরুণ রাজা। এর আগে ফ্রান্সের আর-কোনো রাজাকে এমন দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়নি। চার্লসের গর্ভধারিণী জননী পর্যন্ত তাঁর পুত্রকে এই সময় বর্জন করেছিলেন।

দেশের জনসাধারণের দুর্দশায় জোয়ানের মন বিষণ্ণ। এতবড় ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশের আজ কী শোচনীয় অবস্থা! তিনি যতই চিন্তা করেন ততই তাঁর কোমল হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে। একদিন জোয়ান তাঁর স্বভাবমতো তাঁদের কুঁড়েঘরের পিছনদিককার গাছটির তলায় বসে নীল আকাশের দিকে উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ যেন চারদিকে আলোয় আলোকিত হয়ে গেল। আকাশ থেকে একটা দৈববাণী যেন ভেসে এল—'ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করবে তুমি। ঘর ছেড়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো। যুবরাজের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে তোমাকে।' কুমারী জোয়ানের সমস্ত সত্তা যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল এই দৈববাণীতে। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে তাঁর হৃদয়ে অগ্নিময় প্রেরণা সঞ্চার করল। মায়ের কাছে এসে তিনি যখন সব কথা বললেন তখন মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শিরচুম্বন করে তিনি বলেন, 'দৈববাণী আবার কী? এ তোর মনের ভ্রম, বাছা।'

জোয়ানের বয়স যখন মাত্র বারো বছর তখন তিনি এই দৈববাণী শুনেছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি আজীবন কুমারী থাকবেন এবং পবিত্র জীবনযাপন করবেন। শতবর্ষের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সিংহাসন তখন ইংরেজদের করতলগত হবার উপক্রম হয়েছে, এমন সময়ে এই নিরক্ষর চাষির মেয়ের আবির্ভাব ঘটল তার স্বজাতির ইতিহাসে। অতঃপর ক্রমাগত বালিকা সেই দৈববাণী শুনতে থাকেন এবং সেইসঙ্গে তিনি নানারকম আশ্চর্য দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। তখন থেকেই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল তাঁর জন্মভূমি ফ্রান্সকে রক্ষা করা, আর যুবরাজকে রিমস্-এর ক্যাথিড্রালে অভিষিক্ত করা। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনীদের কাছে, তাঁর পিতামাতার কাছে জোয়ানের এই ধারণা উদ্ভট বলেই মনে হত। কিন্তু প্রত্যাদিষ্টা বালিকা তখন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন।

অবশেষে জোয়ান যখন ষোলো বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। শয়নে-স্বপ্নে, জাগরণে, ধ্যানে তিনি সেই একই দৈববাণী শুনতেন : 'ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করবে তুমি; ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো; যুবরাজের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে তোমাকেই।' জোয়ান আবার গেলেন জেলার শাসনকর্তার কাছে। এবার তিনি দিব্যপ্রেরণায় উদ্ভাসিত সেই কিশোরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করলেন যে, এ মেয়ে সত্যিই দৈবাদেশ শুনেছে। তিনি যুবরাজের নামে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন জোয়ানের হাত দিয়ে, আর তাঁর হাতে দিলেন একটি তলোয়ার। তারপর ১৪২৯ সনের জানুয়ারি মাসে, পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে আর সঙ্গে ছয়জন অনুচর নিয়ে বালিকা এলেন যুবরাজের দরবারে।

যুবরাজ সপ্তম চার্লস তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যুবরাজের মনে এই ধারণা হল যে, এই কিশোরী দৈবশক্তির আধিকারিণী। তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরাও সেই কিশোরীর দুরন্ত আনন ও উদীপ্ত কথা শুনে তাঁকে দৈবশক্তিসম্পন্না এক নারী বলেই বিশ্বাস করলেন।

জোয়ানের কথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কাতারে কাতারে সৈন্যরা এসে দাঁড়াল ফ্রান্সের পতাকার তলায়। দেহে তাঁর বর্ম, কটিদেশে কৃপাণ, হাতে ফ্রান্সের পতাকা, অশ্বপৃষ্ঠে সকলের পুরোভাগে চলেছেন সেই কিশোরী। সেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে জোয়ান সোজা চলতে লাগলেন ওর্লেয়াঁর অভিমুখে।

ওর্লেয়াঁ দক্ষিণ-ফ্রান্সের এটি মস্তবড় শহর। বহুদিন ধরে শত্রুরা এই শহরটি অবরোধ করে রেখেছে। জোয়ান আসার সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ ভেঙে পড়ল, শত্রুরা করল পশ্চাদপসরণ।

পর পর চারটি যুদ্ধে ইংরেজরা হার মানল। এতদিনে যেন কিশোরীর স্বপ্ন সত্য হল। রিমস্ শহরের ক্যাথিড্রালে যুবরাজ চার্লসের অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হল। জোয়ান বললেন : আমার কাজ শেষ হল। এবার আমি গ্রামে ফিরে যাই।

জোয়ান অব আর্ক-এর বিচার দৃশ্য

কিন্তু তখনো ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্স ত্যাগ করে যায়নি। তাই দুর্বলচিত্ত সম্রাট চার্লস জোয়ানকে ফিরে যেতে দিলেন না। যাই হোক, রাজার আদেশে তাঁকে আবার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হল।

এবার দুঃসময় এল, প্রত্যেকটি যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটতে লাগল। বার্গান্ডি ফ্রান্সের একটা বড় জেলা, এখানকার ডিউক তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। ইংরেজ ও বার্গান্ডিয়ানরা তখন প্যারিস শহর দখল করে বসেছে।

শত্রুর হাত থেকে রাজধানী রক্ষা করার ভার পড়ল জোয়ানের উপর। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে উভয়পক্ষে, এমন সময় রণক্ষেত্রে শোনা গেল কুমারী জোয়ান নিহত হয়েছেন। আসলে সেটা নিছক গুজব ছিল। শত্রুর কাছে থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তাঁরই কয়েকজন অনুচর এই কথা রটিয়ে দিয়েছিল।

এই গুজবের ফলে ফরাসি-সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। জোয়ানকে তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে শত্রুসৈন্যরা নিয়ে গেল ডিউকের শিবিরে। বার্গান্ডির ডিউক প্রচুর অর্থের বিনিময়ে জোয়ানকে সঁপে দিলেন ইংরেজদের হাতে। বিচারে সেই কিশোরী ডাইনি বলে সাব্যস্ত হলেন। তখনকার দিনে আইনের ব্যবস্থা ছিল এই যে ডাইনিদের পুড়িয়ে মারতে হবে। একটি প্রকাশ্য স্থানে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়। একটি ক্রুশ বুকে নিয়ে জোয়ান দ্বিধামাত্র না করে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। তখন তাঁর মুখে মাত্র একটি কথা উচ্চারণ হতে শোনা গিয়েছিল : যিশু!

দশ হাজার দর্শকের অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিপথে জোয়ানের সোনার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আকীর্ণ হয়ে রইল সেই স্বর্ণভস্ম। জোয়ানের আত্মদান ব্যর্থ হয়নি। ঐতিহাসিকদের অভিমত এই যে, 'The martyrdom of Joan gave to France a sense of moral unity such as the country had never yet known.' এই কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। এক অপূর্ব মনোবল নিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার বেদিমূলে তিনি তাঁর জীবন ও যৌবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এক নিরক্ষর গ্রাম্যবালিকার এই আত্মত্যাগের সেদিন প্রয়োজন ছিল।

'জীবনী শতক' বই থেকে

সবচেয়ে বেশি শব্দ

সবচেয়ে বেশি শব্দ রয়েছে ইংরেজি ভাষায়; সেখানে সাধারণ শব্দের সংখ্যা ৪,৯০,০০০ এবং পরিভাষার সংখ্যা ৩০,০০,০০০! তবে সাধারণত অত শব্দের মধ্যে নিয়মিত ব্যবহৃত হয় ৬০,০০০ শব্দ ও পরিভাষা।

অবলুপ্তির পথে তিমি

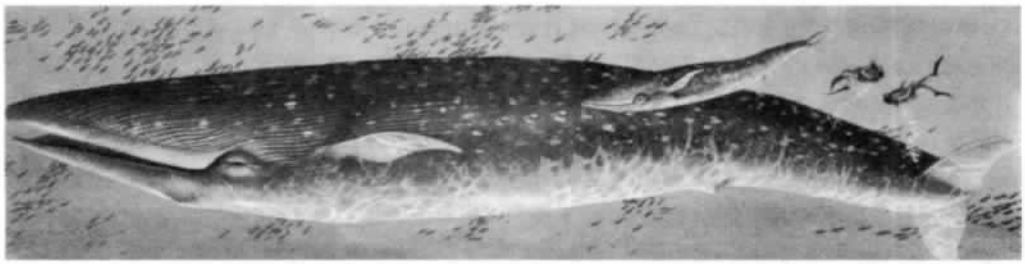

প্রাণীকুলের মধ্যে সর্ববৃহৎ বা স্থূলাকার জন্তুর মধ্যে স্তন্যপায়ী তিমিই প্রথমস্থান অধিকার করে। একটা বৃহত্তম তিমি বা নীল তিমি ১০০ ফুট লম্বা এবং ১৫০ টন ওজনের হয়। প্রাণীবিদ্যাবিশারদ এদের নাম দিয়েছেন : ব্যালিনপটেরা মালকুলিমাস। এই প্রাণী একটি বৃহৎ অবলুপ্ত ডাইনোসর-এর ৪ গুণ, ৩০০টা হাতি বা ১৬০০ মানুষের সমান আয়তনের ওজন-বিশিষ্ট। এরা সমুদ্রে এবং বিশেষ করে এন্টার্কটিকা মহাসাগরে বাস করে। একটি স্তন্যপায়ী হিসেবে ঠাণ্ডায় বাস করতে যেয়ে এদের বিশেষ কতগুলো পরিবর্তন গ্রহণ করতে হয়েছে। এরা দেখতে মাছের মতন, কারণ পানিতে বাস করে। হাত পা নেই, তার বদলে আছে মাছের মতো লেজ এবং সামনে দুটো পাখনা। কিন্তু আরও একটা বিশেষ পরিবর্তন এদের গ্রহণ করতে হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য। স্তন্যপায়ী তিমি ঠাণ্ডা পানিতে বাস করে। এর জন্য এদের দেহের তাপ কমে যেতে পারে। তাই ত্বকের নিচে জমা হয়েছে এক-দেড় ফুট মেদ এবং এরও নিচে দেহের অন্যান্য অঙ্গাদি রয়েছে। এর জন্য উষ্ণরক্তা বিশিষ্ট এই প্রাণীগুলো জমে যায় না। তাপের তারতম্য হয় না। আর এই প্রচুর মেদই তাদের জন্য কাল হয়েছে।

নীল তিমি (Blue whale), সি তিমি (Sea whale), ফিন তিমি (Fin whale), কুঁদোওয়ালা তিমি (Humpback) থেকে মেদ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এদের দাঁত নেই, তাই এরা মিস্টিসেটি উপবর্গভুক্ত।

অডমটসেটি উপবর্গভুক্ত প্রাণীদের (তিমি) মধ্যে কিলার বা খুনে-তিমি, ডলফিন, পরপাজ, স্পার্ম-তিমি প্রধান তবে তাদের মেদ খুবই অল্প এবং আকারও ছোট।

আমরা আজ তিমিদের নিয়ে ভাববো। বৃহৎ বপুর হওয়া সত্ত্বেও এরা খুদে ক্রাস্টাসিয়া ক্রিল (ইউফাওসিয়া সুপারবা) খেয়ে জীবনধারণ করে। এক টন মাংস তৈরি করতে একটি তিমিকে ১০ টন ক্রিল খেতে হয়। ১০ টন ক্রিলকে ১০০ টন খুদে এককোষী উদ্ভিদ খেতে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ঐ পরিবেশের সবাই ক্রিল-এর ওপর এবং ক্রিল জলজ উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

কিলার (খুনে তিমি) ও স্কুইড খাদক স্পার্ম-তিমি খুব সাংঘাতিক। খুনেরা নীল-তিমির মাত্র ৮ ভাগের ১ ভাগ হলেও একঝাঁক (প্রায় ৪০টা) খুনে একটি নীল-তিমিকে আক্রমণ করে ছিঁড়ে এর জিহ্বা এবং অন্যান্য অঙ্গ খেয়ে ফেলে।

প্রায় ৪,০০০ বছর থেকে তিমি-শিকারের নজির আছে। আগে এ-কাজ খুবই বিপদসঙ্কুল হলেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে এটা খুবই সহজ হয়েছে। জাহাজে চড়ে হার্পুন দিয়ে অনায়াসে এদের শিকার করা যায়। তারপর কারখানায় এনে চামড়া ছাড়িয়ে মেদ কেটে বয়লারে সিদ্ধ করে তেল বানানো হয়। একটা তিমি থেকে প্রায় ২৫ টন তেল পাওয়া যায়। এছাড়াও মাংস খাওয়া হয়। তেল জ্বালানিতে, রান্না করায়, তৈলাক্তকরণ (Lubricating)-এ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় সাবান তৈরিতে। চিরুনি বা চালুনির ন্যায় ব্যবহৃত হয়, ব্যালিন, তা দিয়ে বহু সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরি হয়। একটা তিমি থেকে দেড় টন ব্যালিন পাওয়া যায়। আর এক টনের দাম ২০০০ পাউন্ড। তেল থেকে গ্রিজ, মার্জারিন, লুব্রিকেটিং এবং ভোজ্যতেল হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯৩০ সনে যেখানে ৪২,০০০ নীল তিমি ছিল সেখানে ১৯৬৩ সনে ২২,০০০ হয়েছিল। আরও ধরার ফলে বর্তমানে এক/দেড় হাজার আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এই বহুলব্যবহৃত মূল্যবান দ্রব্যাদির জন্য দৈত্যসম নীল তিমিদের প্রচুর পরিমাণে ধরা হচ্ছে। ফলে ওদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

তাই এরা প্রায় শেষ হতে চলেছে। কারণ এদের ধরা হচ্ছে। এদের বংশবৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া হচ্ছে না। কারণ, প্রজননক্ষমতার দিক দিয়ে বিচার করলে বৃহৎ প্রাণীরা স্বল্পতম বংশবিস্তারে আগ্রহী। ফলে বংশবৃদ্ধির বদলে এরা মানুষ এবং খুনেদের হাতে মারা পড়ছে। এরা অবলুপ্তির পথে। কয়েক বছরের মধ্যেই এরা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এদের আর দেখা যাবে না। ঐতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপ ডাইনোসর যেমন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, এরাও ইতিহাস হয়ে থাকবে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, আমরা আমাদের একটা বৃহৎ সম্পদ হারাব। আমরা কি চিন্তা করছি এদের থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে, প্রকৃতির অন্য কিছু থেকে এই জিনিশ পাওয়া যাবে কি না?

আনন্দমেলা থেকে

৪৮ বছর অজ্ঞান

৩২ বছর ৯৯ দিন অজ্ঞান অবস্থায় বেঁচে থাকার রেকর্ড হয়েছে ক্যারোলিন কার্লসোনের [Karoline Karlsson]। ক্যারোলিনের জন্ম ইসুডেনের মোনস্‌টেরাস্ [Monsteras] শহরে, ১৮৬২ সালে। তিনি ১৮৭৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। বহু চিকিৎসাতেও তাঁর জ্ঞান ফেরানো যায় না। অচৈতন্য অবস্থায় ১৯০৮ সালে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি বিছানায় পড়ে থাকেন! তারপর হঠাৎ-ই ক্যারোলিনের জ্ঞান ফিরে আসে; এরপর তিনি ৮৮ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি মারা যান।

বর্তমানেও অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন এমন একজন মহিলার নাম এলাইনে এস্‌পোজিটো [Elaine Esposito]। তার জন্ম ১৯৩৪ সালের ৩ ডিসেম্বর। নিবাস ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের টারপোন স্প্রিংস-এ। ১৯৪১ সালের আগস্ট অ্যাপেনডিকেটমি অপারেশনের পর থেকে তার আর জ্ঞান ফেরেনি।

শিবরাম চক্রবর্তী

কলকারখানা

কারখানা দু-রকমের। কাণ্ড-কারখানা আর কল-কারখানা। কল-কারখানাও আবার দু-রকমের হতে পারে, কিন্তু সেটা বঙ্কিমের পাল্লায় পড়ার আগে আমার ইয়াদ হয়নি।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বিনা-নোটিশে খতম হওয়ায় রেনিডের মতোই হঠাৎ এসে গেল ছুটিটা। বঙ্কিম বললে, 'রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে কী হবে, চল্ তোদের বাড়ি যাই। তোকে একটা নতুন ধরনের খেলা দেখাব।'

নতুন ধরনের খেলাই বটে! কিন্তু শেষপর্যন্ত না-দেখলে বোঝাই যায় না—খেলোয়াড়টিকে অন্তত। সত্যি, বঙ্কিম-যে এত খেলাও জানে!

আমি বললাম, 'তাই চল্। বাবা আপিস গেছেন, তাঁর বসবার ঘরটা ফাঁকা। মা ঘুমুচ্ছেন তেতলায়, কেউ কোথাও নেই। বেশ পিসফুল এ্যাটমসফিয়ার।'

আমাদের বাড়ির দোরগড়ায় এসে বঙ্কিম বললে, 'তোদের বাড়ি টেলিফোন আছে তো রে?'

'না। টেলিফোন করতে হলে আমরা পিসেমশায়ের বাড়ি যাই। এখান থেকে আধমাইল। অন্য জায়গার থেকে পয়সা লাগে কিনা!'

'সেখানকার এ্যাটমসফিয়ার কেমন? এইরকম পিসফুল?' বঙ্কিমের প্রশ্ন হয়।

'পিসে অবশ্য এখন আপিসে, কিন্তু—তা বলে মোটেই পিসফুল নয়।' আমি বলি : 'বরং পিসিফুল বলতে পারিস। আমার পিসি রাতদিন সারাবাড়ি চষছেন। তাছাড়া বাড়িটা দুর্দান্ত রকমের

পিসতুতো-ভাই-ফুল। কাচ্চা-বাচ্চা সব, কিন্তু কেউ তারা দুপুরে ঘুমোয় না—আর, যাকে বলে—অফ আটমোস্টফিয়ার। এক-একটি ভয়ঙ্কর আবহাওয়া।'

'তাহলে সেখানে গিয়ে কাজ নেই। আমাদের বাড়িই চল্, আমাদের টেলিফোন আছে। তোকে চকোলেট খাওয়াব।' বঙ্কিম বলল।

টেলিফোনের জন্য না, চকোলেটের খাতিরেই বঙ্কিমের বাড়ি গেলাম।

গিয়েই বঙ্কিম টেলিফোন নিয়ে বসল—অবশ্য, চকোলেটের বাক্স সামনে রেখেই।

'খেলাটা হচ্ছে এই'—বঙ্কিম আমাকে বোঝাতে থাকে, 'এই হচ্ছে টেলিফোন (টেলিফোনকে সে পাকড়ায়) আর এর নাম, বুঝলি, রিসিভার—এমনি করে ধরতে হয়।

(রিসিভারটা ও হাতায় ধরে) এইবার আমি একটু চোখ বুজব। চোখ বুজে বুঝলি একটা নম্বর আন্দাজ করব এরপর। যা মনে আসে—যে-কোনো নম্বর।

'রং নম্বর?'

'রং হোক রাইট হোক—রং বেরং-এর যে-কোনো রকম হোক না! এই যেমন ধর্....'

চোখ বুজে রিসিভারটাকে কানে ধরে বঙ্কিম উদাহরণস্বরূপ হয়ে ওঠে।

...'হ্যালো, বড়বাজার ৭০৭০? হ্যালো, আপনারা বড়বাজার সত্তর সত্তর? আপনি কে? দৌবারিক দাশ...মিষ্টান্নবিক্রেতা?...ভালো কথা—আপনাদের দোকানে কোনো পচা সন্দেশ আছে আজ? নেই? সব বেচেবুচে দিয়েছেন? পাড়াতেই করেছেন তো?... বেশ বেশ!... ও, আমি? আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি, পাড়ার ডাক্তার। ভালো করে কেন এখনো কলেরা লাগছে না এখানে, সেই কারণে ভারি ভাবিত আছি। খুব কসে পচা সন্দেশ চালান মশাই, বুঝলেন? কক্ষনো কদাপি টাটকা থাকতে বেচবেন না। আগে পচতে দিন—রীতিমত পচুক—পচিয়ে তারপর ছাড়ুন। পচিয়ে পচিয়ে বেশ সুপাচ্য করে পাচার করবেন...বুঝেছেন...'

বঙ্কিম দৌবারিককে ত্যাগ করল।

'এই একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। তেমন খুব ভালো দৃষ্টান্ত নয় যদিও। দোকানদারদের আমি পছন্দ করি না—পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। ওদের নিয়ে বিশেষ সুবিধে হয় না। ডোমেস্টিক লোক হলেই খেলাটা ভালো খেলে। তবে আজেবাজে কিছু এইভাবে যাবার পর এক-একটা এমন মজার লোক কলে পড়ে তখন এসব-সমস্ত লোকসান পুষিয়ে যায়... কেমন, খেলাটা তোর কেমন লাগছে?'

ওর কলের সময়ে আমার কেরামতি দেখাচ্ছিলাম। একটার পর একটা চকোলেটদের মুখে পুরছিলাম চোখটোখ না-বুজেই। ধ্বংসাবশেষটিকে গিলে বললাম, 'মন্দ না। হাতে কোনো কাজ না-থাকলে আধঘণ্টাটাক এইভাবে কাটাবার পক্ষে ভালোই হত। অবশ্যি, বাবারা যদি টের না পায়। বিশেষ আমার মতোন বাবা। দে, এবার আমি করি...'

হাতে-কলমে যেমনটি শিক্ষা পেয়েছি—কাজে লাগাই। রিসিভার কানে লাগিয়ে চোখ বুজতে হয়...আন্দাজ-মার্কা একটা নম্বরও বলে দিই...

'হ্যালো, এটা? এটা ইস্কুল? দয়া করে একটু অঙ্কের মাস্টারকে ডেকে দেবেন...ক্লাসে গেছেন তিনি? লাইব্রেরিতে কে আছেন এখন? ইতিহাসের মাস্টার? তবে আচ্ছা, তাঁকেই ধরতে বলুন।'

ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হোক, আপত্তি কী?

'হ্যালো, মাস্টারমশাই? আমার ছেলেকে আপনি যা পড়াচ্ছেন তা আর বলে কাজ নেই! এরকম প্রাইভেট টিউশনি কদ্দিন থেকে করছেন মশায়? আমার ছেলেকে পড়াবার নামে যা ফাঁকি দিচ্ছিলেন—ছিঃ! সে-কথা আর বলে কাজ নেই...'

'আজ্ঞে...আজ্ঞে...আপনি কী বলছেন!' আওয়াজ আসে রিসিভারে।

গলাটা বাবাসুলভ করে আমি বজ্রের ন্যায় গর্জন করি : 'আর আজ্ঞে আজ্ঞেতে কাজ নেই। এই আমার স্পষ্টকথা শুনে রাখুন। আপনাকে আজ থেকে আর আমাদের বাড়ি পড়াতে আসতে হবে না। পড়ান তো ছাই, যা আমার ছেলের কাছে শুনছি, আপনি নাকি তার ঘাড় ভেঙে আলুকাবলি খান, সিনেমা দ্যাখেন, তারপর তার জন্মদিনে-পাওয়া ফাউন্টেন পেনটাও একদিনের মতো ধার নিয়ে জন্মের মতো সাবাড় করেছেন—মেরে দিয়েছেন কি কোথাও ঝেড়ে দিয়েছেন—কে জানে! কিন্তু এসব কী!'

অপর প্রান্ত থেকে এবার সন্দিগ্ধ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। 'দেখুন, আপনার রং নম্বর হয়নি তো? আমি তো আপনাকে বা আপনার ছেলেকে ঠিক ধরতে পারছি না!'

'আর পারবেনও না। আজকের সন্ধ্যের গাড়িতেই আমরা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছি। ভাগলপুর সটকে পড়ছি সটাং। আপনার মতো মাস্টারের খপ্পর থেকে বাঁচাতে হলে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখি না। নমস্কার।'

টেলিফোন ছেড়ে বঙ্কিমের দিকে তাকালাম—'কী? কীরকম হল। প্রথম চেষ্টা হিসাবে নেহাত মন্দ হয়নি, কী বলিস?'

বঙ্কিম ঘাড় নাড়ল—একটু বাঁকাভাবেই।

তারপর ওর পালা। ওর বরাতে একটা হল নো-রিপ্লাই, একটা ফিরিঙ্গি মেম—যার কথার মাথামুণ্ডু বোঝে কার সাধ্যি—যদিও আমাদের বঙ্কিমও ইংরেজি বোলচালে কিছু কম যায় না। কিন্তু হলে কী হবে, ওর বিলিতি সাধুভাষা মেমটার কানে ঢুকলেও মগজে সেঁধলো কি না কে জানে! বঙ্কিম বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলে! শেষপর্যন্ত তার টেলিফোনে জুটল এক আর্দালি—আর্দালি কিংবা চাপরাশি—সে তো স্পষ্টতই ওর মুখের ওপর বলে বসল—'কেয়া বুরবাক্কা কা মাফিক বাত করতা হ্যায়?'

এই ধরনের বাতচিতের পর বঙ্কিম ভারি দমে গেল। রিসিভার ছেড়ে দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকল।

তখন আমি পাকড়ালাম। প্রথমেই পাকড়ালাম এক নামকরা সাহিত্যিককে। সাহিত্যসম্রাট জাতীয়, উপন্যাস লিখতে তিনি ওস্তাদ। তাঁর উপন্যাসের কাঠামোর কোথায় কোন গলদ তাঁকে আমি অকাতরে জানালাম। আশ্চর্য! এর সমস্তই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। কীভাবে গল্প ফাঁদলে আরো ভালো হয়, তারও কিছুকিছু হদিশ তাঁকে আমি দিলাম—পরবর্তী রচনায় সেগুলো তিনি কাজে লাগাবেন জানালেন আমায়।

বঙ্কিম তো গুম হয়ে ছিলই, এখন আরো গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখ কালো হয়ে উঠতে দেখলাম—আমার হিংসাতেই, বলাই বাহুল্য।

কালো মুখে ও রিসিভারটাকে হাতে নিল এবার। নিয়ে চোখ বুজল। আমি সেই ফাঁকে ওর আর-একটা চকোলেটকে মুখের তল্লাটে সরিয়ে ফেললাম—ও চোখ বুঝে থাকতে থাকতেই।

বঙ্কিমের ভাগ্যে এবার পার্ক স্ট্রিটের থানা এসে পড়ল। থানা শুনে আর সে এগুতে সাহস পেল না। 'ওরে বাব্বা', বলে সে রিসিভারটা রেখে দিল—তৎক্ষণাৎ। বললে, 'থানা ধরা ঠিক নয়। উলটে থানাতেই ধরে নিয়ে যায় ফের। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলেও তাই।'

আমি ধরলাম। আমার টেলিফোন-জালে এবার একজন লেডি-ডাক্তার ধরা পড়লেন। ভালোই হল আরো। বহুবিধ সদালাপের পর তাঁর কাছ থেকে মা-র অম্বলের ব্যামোর একটা পেটেন্ট দাওয়াই বাৎলে নিলুম—ফি-টি কিচ্ছু না দিয়েই—বিলকুল বিনে-পয়সায়।

আমার সাফল্যের ওপর সাফল্যে এবং নিজের ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় বঙ্কিম ক্রমেই চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠছিল। এবার সে চটেমটে চকোলেটের বাক্সগুলো তুলে নিয়ে নিজের ড্রয়ারের মধ্যে বন্ধ করল।

বঙ্কিমটা ঐরকম। ভারি হিংসুটে। অবশ্যি, আমি একটু বেশি-বেশি চাখছিলাম তা ঠিক, তবুও চকোলোটের এই বাজে-খরচ তাও হয়তো ওর প্রাণে সইত, কিন্তু ওর খেলায় ওকেই এসে

হারিয়ে দেয়া— এটা বুঝি কিছুতেই ওর বরদাস্ত হচ্ছিল না।

ক্রমেই ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এল। ওর মুখে একটা ক্রূর হাসি খেলা করতে লাগল। ওর ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল। 'এইবার শেষবার— আমার পালা হয়েই খতম!' এই বলে সে রিসিভারটাকে নিজের কানে লাগাল।

'...ও! আপনি? কদিন থেকেই আপনাকে ফোন করব করব ভাবছিলাম। ভাগ্যিস আপনাকে আজ পাওয়া গেল টেলিফোনে!'

বঙ্কিমের মুখে হাসি আর ধরে না।

অনেক ধরাধরির পর কাউকে ধরতে পারলে কার না আনন্দ হয় আবার!

'আপনার ছেলের স্বভাব-চরিত্রের কথা না বলে পারছি না। সমস্ত আপনাকে খুলে বলাই আমার উচিত। এই বয়সেই ওর স্বভাবের ভেতর য়্যাতো গলদ ঢুকেছে যে, আপনাকে বলব-বলব মনে করছি কিছুদিন থেকেই, কিন্তু...' বঙ্কিম বলেই চলে। বলতে বলতে মাঝে মাঝে বঙ্কিম কটাক্ষে আমার দিকে তাকায়। আমিও ওকে ইঙ্গিতে উৎসাহ দিই—চালাও—চালিয়ে যাও! খাসা চালিয়েছ ভাই!

বাস্তবিক, এমন ফলাও করে চমৎকার করে শুরু করেছে বঙ্কিমটা!

'...সিগারেট? হ্যাঁ সিগারেট তো টানেই, বান্ডিল বান্ডিল বিড়ি ফুঁকে পার করে দিচ্ছে মশাই, সিগারেটের কথা কী বলছেন? সম্প্রতি আবার গাঁজা টানতেও শুরু করেছে। ...আজ্ঞে হ্যাঁ...আমাদের খোট্টা দারোয়ানের সঙ্গে। প্রথমে লোটা লোটা ভাঙ উড়াচ্ছিল, তখন আমি তেমন কিছু মনে করিনি, ভেবেছিলাম এ-বন্ধুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হবে না,বন্ধুত্ব অচিরেই একদিন ভাঙবে। কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল। এখন তা গাঁজায় গিয়ে গড়িয়েছে। তাই আপনাকে খোলাখুলি সমস্ত জানাতে বাধ্য হলুম।...

'...আজ্ঞে, কেন গাঁজা খায় তা আমি বলতে পারি না।

'...ইস্কুল? কোথায় ইস্কুল! ইস্কুলে দু-একটা ক্লাস করেই সে আমাদের দারোয়ানের আস্তানায়

চলে আসে। এসে প্রাণভরে গাঁজা টানে। এই তো, এখনো টানছে তো। সমানে টেনে চলেছে। আমার দোতলার পড়ার ঘরে বসে বিটকেল গন্ধ পাচ্ছি তার—নিজের নাকেই পাচ্ছি। এমন মাথা ঘুরছে আমার যে কী বলব। আপনি এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসুন-না—হাতেনাতে ধরতে পারবেন...'

'বাহাদুর। বাহাদুর!!' আমি মুক্তকণ্ঠে ওর প্রশংসা না করে পারি না।

'...য়্যাঁ, কী বলছেন, কাজ ফেলে এখন আসতে পারা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আজ বাড়ি ফিরলেই ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবেন? তাড়িয়ে দেবেন বাড়ির থেকে? একেবারে—জন্মের মতোই? তা, আপনার ছেলে, যা-খুশি, যেমন অভিরুচি আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন।

বঙ্কিম হাসিমুখে রিসিভার রেখে দিল।

'ফাস-কেলাস!' আমি বলে উঠি— 'একটা ছেলের দফা একেবারে রফা—জন্মের মতো খতম করে দিয়েছিস। আজ ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে বেচারার...'

বঙ্কিম হাসিমুখে বললে, 'হুম।'

'বাপস! অন্য কারো বাবা না হয়ে যদি আমার বাবা হত তাহলে যে কী দাঁড়াত ভাবতেই আমি শিউরে উঠছি! আমি তো ভাই আস্ত থাকতুম না! আমার একটি কথা বলবার আগেই বাবা আমার হাড় এক জায়গায় আর মাংস এক জায়গায় করে রাখতেন। সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা করে। মাংসের কিমা দেখেছিস? সেই কিমার মতোই অনেকটা...'

'তাহলে জেনে রাখো', বঙ্কিম বাধা দিয়ে জানায়, 'তোমার বাবাই। তোমার বাবার আপিসেই এতক্ষণ আমি ফোন করছিলাম—আর কখনো গায়ে পড়ে আমার সাধের খেলা মাটি করতে আসবে?'

রোবট কাহিনী

রোবট-শব্দটি এসেছে পূর্ব-ইউরোপের স্লাভোনিক ভাষা থেকে। স্লাভদের এই ভাষায় রোবট-শব্দের অর্থ হচ্ছে দাসত্ব। এই সূত্র থেকেই যন্ত্র-দাস বা যন্ত্র-ক্রীতদাস অর্থে রোবট-শব্দটির ইংরেজিভাষায় প্রথম ব্যবহার করেন ইউরোপীয় লেখক কারেল চাপেক, তাঁর আর-ইউ-আর নাটকে। নাটকটি প্রাগ-এ প্রথম অভিনীত হয় ১৯২১ সালে। চাপেক-এর নাটকের পর থেকেই রোবট-শব্দটি ইংরেজিভাষায় পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেয়।

প্রথম রোবট কে তৈরি করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য মার্কিন-ব্রিটিশ স্নায়ুবিজ্ঞানী উইলিয়াম গ্রে ওয়ালটারের নাম করা হয়। সম্ভবত তিনিই প্রথম রোবট-পশু তৈরি করেছিলেন।

ওয়ালটার তাঁর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-পশুর নাম দিয়েছিলেন টেসটিউডো—ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ কচ্ছপ। বিদ্যুৎচালিত টেসটিউডো যন্ত্রটি তিনি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাতে সেটি কোনো জীবন্তপ্রাণীর একাধিক প্রতিক্রিয়া নকল করতে পারে। যেমন, যন্ত্রটির চোখের জায়গায় বসানো ছিল আলোক-তড়িৎ কোষ; স্পর্শ অনুভব করার জন্য ছিল সুবেদি ব্যবস্থা; এছাড়া, সামনে-পিছনে কিংবা বাঁক নিয়ে চলার জন্য ছিল একাধিক মোটর ও চাকার আয়োজন।

টেসটিউডো অন্ধকারে চলে বেড়াতে পারত। চলার পথে যখনই সে কোনোকিছুতে বাধা পেত তখনই কিছুটা পিছিয়ে এসে সামান্য বাঁক নিয়ে, আবার এগিয়ে যেত সামনের দিকে। এইভাবে

বারবার বাধা পেলেও টেসটিউডো একসময়ে বাধাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারত। আবার তার তড়িৎ-চোখ কোনো আলো দেখতে পেলে সরাসরি এগিয়ে যেত সেই আলোর দিকে। যতই সে এগোয়, আলোর তীব্রতা তত বেড়ে ওঠে। যখন আলোর তীব্রতা অতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যেত, তখনই টেসটিউডো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার পিছিয়ে আসত। কিন্তু টেসটিউডোর ব্যাটারির ক্ষমতা কমে গেলে তার আচরণ পালটে যেত। তখন সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় অতিরিক্ত তীব্রতা সত্ত্বেও সেই আলোর খুব কাছে এগিয়ে যেত এবং আলোর পাশে রাখা একটি ব্যাটারি-চার্জার-এর সাহায্যে নিজের ব্যাটারিকে আবার চার্জ করে নিত। ব্যাটারি চার্জ করে নেয়া মাত্রই টেসটিউডো আবার আলোক-সচেতন হয়ে উঠত। ফলে তীব্র আলোর কাছে থেকে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিছিয়ে আসত।

আজকের দিনে টেসটিউডোর মতো বুদ্ধিমান খেলনা হয়তো অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু ওয়ালটারের সময়ে তাঁর বুদ্ধিমান রোবট-পশু যে একটি অভিনব আবিষ্কার ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রোবট কত রকমের হয়?

বিভিন্ন জিনিশের যেমন শ্রেণীবিভাগ আছে, তেমনি রোবটেরও শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। রোবটকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : টার্টল, আর্ম ও মোবাইল।

টার্টল অনেকটা গ্রে ওয়ালটারের টেসটিউডোর মতো—ছক-বাঁধা নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে চলাফেলা করে।

আর্ম হল বাহুসম্পন্ন রোবট, যা একই জায়গায় স্থির থেকে শুধু যান্ত্রিক হাত নেড়ে কোনো জিনিশ তুলে নেয়, জোড়া লাগায় বা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে।

আর মোবাইল হল টার্টল-এর চেয়ে বুদ্ধিমান চলমান মোটর-রোবট। এ-ধরনের রোবটের বহু বিচিত্র নির্দেশ মেনে কাজ করার ক্ষমতা আছে। যেমন, কুকুরকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে, বা গ্লাসে জল ঢেলে হাতে তুলে দেয়া—এরকম আরো বহু কাজ।

রোবটের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটি কম্পিউটার, আর তাকে যেসব নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলোকে কম্পিউটার-প্রোগ্রাম বলা যেতে পারে। এই নীতি কাজে লাগিয়ে পশ্চিমের জগতে নানারকম মোবাইল ডোমেস্টিক রোবট কিংবা পার্সোনাল রোবট তৈরি করা হচ্ছে। আর্ম-রোবটদের বেশিরভাগ কলকারখানায় কাজে লাগানো হয়। আর টার্টল রোবট বিভিন্ন গবেষণা ও বুদ্ধিমান খেলনা তৈরি করতে বেশি কাজে লাগে।

পৃথিবীতে রোবট-ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে রোবটের সংখ্যা কোন দেশে বেশি?

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকের হিসেব অনুযায়ী প্রতি দশলাখ মানুষপিছু রোবটের সংখ্যা হিসেব করলে পৃথিবীতে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে সুইডেন। সে-দেশে এই সংখ্যা হল ১৬০০। এর অন্যতম কারণ, সুইডেনে শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব। এই হিসেবের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান জাপানের। সেখানে প্রতি দশলাখ নাগরিকপিছু ১০৮০টি রোবট রয়েছে। রোবট-ব্যবহারকারী উল্লেখযোগ্য দেশগুলোর তালিকায় সবার শেষে ইতালি—তার সংখ্যা মাত্র ৫০। পার্শ্ববর্তী ভারতেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে, তবে সেই সংখ্যা এখনও পর্যন্ত নিতান্তই নগণ্য।

ছোটদের বিজ্ঞানকোষ থেকে

বিপ্লব দাশ

বোতল-বার্তা

যদি কখনো সমুদ্র-সৈকতে বেড়াতে যাও—চট্টগ্রামে বা কক্সবাজারে, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হলে ছিপি-আঁটা একটা বোতল দেখতে পারো সেখানে। একটা কেন, চাই-কি বেশিও পেতে পারো। সেই বোতলের ভেতর পাবে একখানা কুপন। সেটা অস্ট্রেলিয়া পাঠালে তার বিনিময়ে বহু টাকার উপহার-দ্রব্য পাবে।

ব্যাপারটা খুলেই বলছি। ডেভিড জনায় নামে অস্ট্রেলিয়া-বিখ্যাত এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শতবিংশতিতম জন্মোৎসব পালিত হয়েছে বিগত ১৯৫৮ সালে। সেই উৎসবটা স্মরণীয় করবার জন্য প্রতিষ্ঠানের মালিকরা কয়েকটি বোতলে প্রায় সত্তর হাজার টাকার উপহার-কুপন ভর্তি করে সমুদ্রে ফেলেছেন। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ, সেসব বোতলের দু-একটিকে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে কেপ হর্নে। বাকিগুলোর খোঁজখবর কেউ পায়নি। সেজন্যই বলছিলুম, ভাগ্য প্রসন্ন হলে তুমিও পেতে পারো দু-একটা বোতল।

তুমি হয়তো ভাবছ, এতদিনে সে-বোতল কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু বোতলকে অতটা তুচ্ছ ভাবতে পারো না। সমুদ্রের ভয়ঙ্কর ঝড়ে বড় বড় জাহাজ ডুবে যেতে পারে, অথচ ছিপি-আঁটা বোতলের কিছুই হবে না। ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে বোতল দিব্যি এগিয়ে যাবে স্রোতের টানে।

সামান্য একটু টক্কর লাগলেই বোতল ভেঙে যায় সত্যি, কিন্তু না ভাঙলে সে-বোতল শত শত বছর ধরে অক্ষয় হয়ে থাকবে। কেন্টের উপকূল থেকে একটু দূরে একটা জাহাজডুবি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগে। বিগত ১৯৫৪ সালে ডুবুরিরা তার সন্ধান করতে গিয়ে কতকগুলো বোতল পায় জাহাজের ভগ্নাবশেষের সঙ্গে। সে-বোতলে কী বস্তু ছিল তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু বোতলগুলো এতদিন পরেও নতুন বোতলের মতোই রয়েছে।

খেয়ালি মানুষ অনেক সময় বোতলের ভেতর অনেককিছু লিখে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে। বেশিদিনের কথা নয়—১৯৫৬ সালে সুইডেনের এক নাবিক সমুদ্রের একঘেয়ে জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে ছোট্ট একখানা চিঠি লিখল পত্রমিতালি পাতাতে ইচ্ছুক যে-কোনো এক মেয়ের উদ্দেশে। সেই চিঠি বোতলে ভরে ফেলে দিল সমুদ্রে। দু-বছর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সে-বোতল গিয়ে ঠেকল সিসিলির উপকূলে। এক মেয়ে তা কুড়িয়ে পেল। কৌতূহলের বশেই চিঠি লিখল সেই নাবিককে। নাবিকও চিঠি পেয়ে তার উত্তর পাঠাল সঙ্গে সঙ্গে। এমনি করে চলল চিঠিপত্রের আদানপ্রদান। তারপর আরও দু-বছর পরে একবার নাবিকটির জাহাজ এসে ভিড়ল সিসিলি দ্বীপে। এতদিন পরিচয় ছিল চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে, এবার চাক্ষুষ পরিচয়ের পরে মেয়েটির সঙ্গে নাবিক যুবকের বিয়ে হয়ে গেল।

ভাসমান বোতল সবচেয়ে বেশি উপকারে লেগেছে সমুদ্রস্রোতের গতি ও গতিপথ নির্ণয়ে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার পোস্টমাস্টার জেনারেল ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আমেরিকা থেকে ব্রিটেনের ডাকজাহাজ পৌঁছতে সাধারণত যে-সময় লাগে, তার চেয়ে দু-এক সপ্তাহ কম সময়ের ভেতর সেখানে পৌঁছে ইয়াঙ্কি তিমিশিকারিদের জাহাজ। অনুসন্ধানে জানা গেল, ইয়াঙ্কি তিমিশিকারিরা সমুদ্রের স্রোতের খোঁজখবর রাখে এবং অনুকূল স্রোতে জাহাজ চালিয়ে সময় সংক্ষেপ করে। বেঞ্জামিন অবশেষে শিকারিদের সাহায্যে একটা চার্ট তৈরি করলেন এবং সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সিলকরা কতকগুলো বোতল ছেড়ে দিলেন সমুদ্রে। বোতলের ভেতর ছিল চিঠি। চিঠিতে অনুরোধ করা হয়েছিল, বোতল যারা কুড়িয়ে পাবে তারা যেন চিঠিটা অনুগ্রহ করে বেঞ্জামিনের কাছে ফেরত পাঠায়। এভাবে বোতলগুলো সংগ্রহ করে তিনি সমুদ্রস্রোতের পথ নির্ণয় করে নিখুঁত একটা চার্ট তৈরি করে ফেললেন। আজও সে-চার্টের বিশেষ কোনো রদবদল করতে হয়নি।

সবচেয়ে দীর্ঘপথ সমুদ্রভ্রমণের কৃতিত্ব যে-ভাসমান বোতলটি অর্জন করেছিল, তার ডাকনাম ছিল 'ফ্লাইং ডাচম্যান'। কয়েকজন জার্মান বৈজ্ঞানিক সে-বোতলটি দক্ষিণভারত মহাসাগরে নিক্ষেপ করে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। সে-বোতলে যে চিঠিখানা ছিল, বোতল না-ভেঙেই অনায়াসে তা পড়া যেত। চিঠিতে বলা ছিল, কেউ সেটা কুড়িয়ে পেলে কোথায় কখন পেল তা জানাতে হবে এবং আবার সেটা ফেলে দিতে হবে সমুদ্রে।

জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সে-বোতলটি পড়েছিল সমুদ্রের পূর্বগামী স্রোতে। কারণ, সেটা গিয়ে ঠেকেছিল দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণ মাথায়। সেখান থেকে বোতলটাকে কয়েকবারই সমুদ্রে ফেলবার পরে আশেপাশে গিয়ে ঠেকে। পরে অবশ্যি কেপহর্ন থেকে আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পুনরায় ভারত-মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এমনকি ভারত-মহাসমুদ্রের যে-জায়গা থেকে তার যাত্রা শুরু, সে-জায়গাও সে ছাড়িয়ে যায়। এমনি করে দীর্ঘকাল অকূল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে সে-বোতল কূল পায় ছয় বছর পরে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সে-বোতল গিয়ে ডাঙায় ওঠে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে। এমনি করে বোতলটি ২,৪৪৭ দিনে ১৬ হাজার মাইল সমুদ্রপথ সফর করে বিনা-খরচায়। দেখা যাচ্ছে, দৈনিক ৬/৭ মাইল সমুদ্রপথ সে অতিক্রম করে গেছে ৬ বছর অবধি।

চলমান বোতলের গতি নির্ভর করে পানির স্রোত ও হাওয়ার ওপরে। সমুদ্রের কোনো-কোনো জায়গায় এক মাইল অতিক্রম করতে কম করেও তার লাগতে পারে একমাস। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের পাল্লায় পড়লে একদিনে তাকে নিয়ে ফেলবে একশো মাইল দূরে।

বোতলের গতি কখন কোনদিকে হবে কেউ তা আগে সঠিক বলতে পারে না। একবার ব্রাজিলের উপকূল থেকে দুটি বোতল একত্রে নিক্ষেপ করা হয় সমুদ্রে। প্রথম বোতলটি ১৩০ দিন অবধি চলতে থাকে পূর্বদিকে। ফলে তাকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় আফ্রিকার উপকূলে। দ্বিতীয়টা সঙ্গীকে ফেলে চলতে থাকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং ধরা পড়ে গিয়ে সেন্ট্রাল আমেরিকার নিকারাগুয়ায়।

অবশ্যি বোতলের বেলায় সবসময়েই-যে এক যাত্রায় ভিন্ন ফল ফলে তা নয়। একবার একজোড়া বোতল ফেলা হল আটলান্টিকের মাঝ-দরিয়ায়। তারা সঙ্গ-ছাড়া না হয়ে ৩৫০ দিন ভ্রমণের পর উঠল গিয়ে ফ্রান্স-উপকূলে মাত্র কয়েক গজ দূরত্বের ব্যবধানে।

প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পরেও ইউরোপের আশেপাশে সমুদ্রে অনেক মাইন ভাসমান অবস্থায় ছিল। সেসব অঞ্চলে জাহাজ-চলাচল তখন নিরাপদ ছিল না। কোথায় কোথায় সেসব থাকতে পারে তা নির্ণয় করা হয় ভাসমান বোতলের সাহায্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও জাহাজ-চলাচলের নিরাপত্তার জন্য একই পন্থা অবলম্বন করা হয়।

বিপদাপন্ন জাহাজের নাবিকরা বহুবারই বোতল দ্বারা সমুদ্র থেকে বাইরের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে বলে শোনা যায়। ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে একবার 'লেনি' নামক এক আমেরিকান জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহ শুরু করে বিস্‌কে উপসাগরে। জাহাজের সাধারণ নাবিকরা সব ক'জন অফিসারকে একে একে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। পরে আমেরিকায় ফিরে আসবার পরিবর্তে জাহাজ গ্রিসদেশে নিয়ে যাবে বলে মনস্থ করে। ভ্যান হোডেক নামে একজন বেলজিয়ান স্টুয়ার্ড ছিল ঐ জাহাজে। সে-বেচারা অন্যান্যদের সঙ্গে বিদ্রোহ না-করে নিরপেক্ষ ছিল। সে লেখাপড়া জানত বলে বিদ্রোহীরা মনে করেছিল জাহাজ চালিয়ে নেবার জন্য তার দরকার হবে। আসলেও কিন্তু সে জাহাজ চালাতে জানত। সে কৌশলে বিদ্রোহী নাবিকদের ভুলিয়ে গ্রিসের পরিবর্তে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে এল ফ্রান্স-উপকূলের কাছাকাছি। বিদ্রোহীরা জানল, তারা স্পেনের ধারে এসে পৌছেছে। ভ্যান হোডেক সেখান থেকে বোতলের সাহায্যে বিপদের খবর বাইরে পাঠাল অতিগোপনে। ঘটনাক্রমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি বোতল গিয়ে উঠল ফ্রান্সের পশ্চিম-উপকূলে। প্রথমে ফ্রান্সের লোকেরা মনে করেছিল কেউ তামাশা করে এ সংবাদ পাঠিয়েছে। তবু তারা কৌতূহলের বশে ছোট্ট একখানা যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। সে-জাহাজ গিয়ে অবশেষে বিদ্রোহী নাবিকদের গ্রেপ্তার করে আনে। লন্ডনে তাদের বিচার হলে চারজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। 'লেনি' জাহাজের আমেরিকান মালিক ভ্যান হোডেককে তার কাজে খুশি হয়ে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন।

বছর-ষাটেক আগে সবচেয়ে আজব ব্যাপার ঘটেছে মি. মাতসুয়ামা নামক একজন জাপানি নাবিকের পাঠানো বোতলে। মাতসুয়ামা চুয়াল্লিশজন লোকসহ এক জাহাজ নিয়ে বের হয় গুপ্তধনের সন্ধানে। পরে তাদের জাহাজডুবি হয়ে তারা আটকা পড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের এক প্রবাল দ্বীপে। সেখানে একে একে প্রায় সবাই অনাহারে মৃত্যুবরণ করার পরেও কিছুদিন বেঁচে থাকে মাতসুয়ামা। সে বসে-বসে ছোট্ট একটুকরো কাঠের গায়ে জাহাজডুবির খবর খোদাই করে। পরে সেই টুকরোটি একটি বোতলে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেয়। শুনলে তোমরা অবাক হবে, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রে নিক্ষেপ-করা তার সে-বোতল ভাসতে ভাসতে জাপানে গিয়ে ওঠে গত ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৫০ বছরের অধিক কাল পরে। আরও তাজ্জব ব্যাপার, বোতলটা উঠেছিল মাতসুয়ামার যে-গ্রামে জন্ম ঠিক সেই গ্রামে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে একজন মার্কিন পাদ্রি বাইবেলের বাণী প্রচার করেছেন বোতলের সাহায্যে। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা এ-যাবত মোট ১৫ হাজার বোতলে বাইবেলের বাণী লিখে সমুদ্রে পাঠিয়েছেন। তার ফলে ১৪০০ জন লোক তাঁকে চিঠি লিখে সেই বাণীর প্রাপ্তি স্বীকার করেছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে কোথাকার বোতল কোথায় গিয়ে উঠে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সেজন্যেই বলছিলাম, চট্টগ্রাম বা কক্সবাজারে গেলে চাই-কি দু-একটা বোতল তোমারও নজরে পড়তে পারে।

হাস্যকৌতুক

১

নাসিমা আর তার বোন শামিমাকে তার খালাম্মা দুটি পিঠা দিয়েছিলেন। শামিমা বড়টা নেবার জন্যে একটু চালাকি করে বলল, তুই-ই আগে নে নাসিমা। নাসিমা কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বড়টাই নিয়ে নিল।

রাগে দুঃখে শামিমা বলল, তুই একেবারে অভদ্র রে।

নাসিমা বলল, অভদ্র হলাম কেমন করে? তুমি হলে কোনটা নিতে?

—আমি তো ছোটটাই নিতাম।

—তাহলে ছোটটাই তো পেয়েছ তুমি। এ নিয়ে দুঃখ করছ কেন? বলল নাসিমা।

২

বাচ্চারা বসার ঘরে যখন টেলিভিশন দেখছিল বাবা-মা তখন রাতের খাবারের জন্য সবকিছু গুছিয়ে রাখছিল। এমন সময় খাবার-ঘরে কোনো-একটা কাচের জিনিস ভাঙার আওয়াজ বাচ্চাদের কানে এল। শুনে বাচ্চাদের একজন বলল, 'নিশ্চয়ই আম্মার হাত থেকে কিছু পড়েছে।'

অন্যজন : কী করে বুঝলে, আম্মার হাত হতে পড়েছে? আব্বার হাত থেকেও পড়তে পারে।

প্রথমজন : না,আব্বা নয়। তাহলে এতক্ষণে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যেত।

সিংহকে বনের রাজা বলা হয় কেন?

পৃথিবীর সব দেশেই সিংহকে প্রতাপ-প্রতিপত্তি, বিক্রম ও শক্তির প্রতীক বলে গণ্য করা হয় সিংহকে। শক্তিমান পুরুষদের নিয়ে প্রায়ই আমরা মন্তব্য করতে শুনি সিংহ-হৃদয় পুরুষ। বিজিত খেলোয়াড়দের পুরস্কার হিসেবে যে-শিল্ড দেয়া হয়—শক্তির প্রতীক হিসেবে তার অনেকগুলোতেই সিংহের মূর্তি খোদাই-করা থাকে। এমনকি অনেক পতাকাতেও সিংহের ছবি চিত্রিত করা হয়।

সাধারণত এটাই বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে বনের মধ্যে সকল প্রাণীর চেয়ে সিংহই সব থেকে শক্তিশালী। অন্য যে-কোনো প্রাণীকে সে লড়াইয়ে হারিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু কথাটি সবসময় সত্য নয়। এদেরকে বনের রাজা বলা হয় এইজন্য যে, এরা এদের শিকারকে এত ক্ষীপ্রগতিতে আক্রমণ করে যে, আক্রান্ত প্রাণীটি নিজেকে প্রতিরক্ষা করবার সময়ই পায় না। নিজ দেহ থেকে বড় দেহধারী প্রাণী—যেমন, জিরাফ ও বন্য মোষকে এরা পিছন থেকে আক্রমণ করে। তারপর শক্তিশালী থাবা, নখর ও তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে আক্রান্ত প্রাণীটির দেহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। একদিকে শক্তি ও অন্যদিকে শিকার ধরবার দ্রুততার জন্যই সিংহকে বনের রাজা বলা হয়।

প্রায় ২০০০ বছর আগেও ইউরোপের নানা অঞ্চলে সিংহ দেখতে পাওয়া যেত। তারপর ধীরে-ধীরে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে। বর্তমানে আফ্রিকা ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের জঙ্গলে এদেরকে দেখা যায়। সিংহ মাংসভোজী প্রাণী। বন্য জীবজন্তু মেরে তার মাংস খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। বিড়াল-গোষ্ঠীর প্রাণী এরা। পূর্ণবয়স্ক একটি সিংহের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৩ মিটার, ওজন হয় ১৮০ থেকে ২২৫ কিলোগ্রাম। সিংহী আকারে ছোট হয় এবং ঘাড়ে এদের কেশর থাকে না।

সাধারণত সিংহীরাই শিকারের খোঁজে বের হয় এবং শিকার ধরে মারে। এদের বাচ্চাগুলো বিড়ালছানার মতো লাফিয়ে চলে। সিংহের গর্জনও বিখ্যাত। বেড়ালের মতো এরা গাছে চড়তে পারে না।

জঙ্গলে ৪ থেকে ৩০টি সিংহের এক-একটি দল থাকে। দলবদ্ধ হয়ে এরা বসবাস করে। এই দলকে বলে প্রাইডস (Prides)। দিনের বেলায় এরা বিশ্রাম করে আর রাতের বেলায় শিকার ধরে। হাতি ও জলহস্তীকে (Hippopotamus) এরা আক্রমণ করে না। জেব্রা, হরিণ, ভালুক, শিয়াল প্রভৃতি বন্যজন্তুকে এরা বেশি শিকার করে। একাকী থাকলে এরা কাউকে আক্রমণ করে না। তবে উত্যক্ত করলে কিংবা আক্রান্ত হলে এরা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

যেসব সিংহ মানুষের মাংসের স্বাদ পায় তারা পরে মানুষ-খেকো সিংহে পরিণত হয় এবং লোকালয়ের কাছাকাছি কোনো জঙ্গলে বাস করা শুরু করে। সুযোগ পেলেই তখন তারা মানুষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি হত্যা করে।

সিংহকে পোষ মানানো যায়। সিংহকে সার্কাসে নানারকম খেলা দেখাতে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ।

জর্জ বার্নার্ড শ'

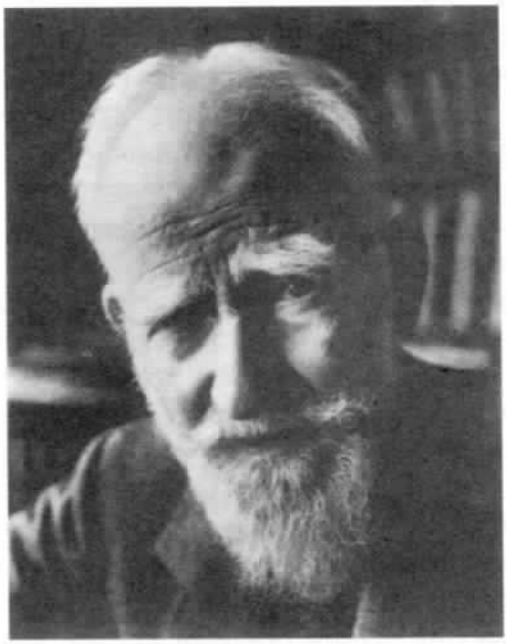

মানুষের মাঝখান থেকেই এমন কিছু মানুষের জন্ম হয় যাঁরা তাঁদের নিজেদের সময় এবং পরবর্তী সময়কে দারুণভাবে প্রভাবিত করে যান। মানুষ তো একসময় চলে যাবেই, কিন্তু এসব মানুষ এমন কিছু রেখে যান, যা নিয়ে পরবর্তী সময়ের মানুষ মাথা উঁচু করতে পারে, গর্বে বুক ফুলিয়ে চলতে পারে। জর্জ বার্নার্ড শ' এ-ধরনের একজন মানুষ। মানুষ তাঁর সাধারণ পরিচয়; কিন্তু তিনি পরিচিত তাঁর কাজের জন্য, তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির জন্য।

১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই তারিখে আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে বার্নার্ড শ'র জন্ম। মা লুসিন্দা এলিজাবেথ, বাবা জর্জ কার শ'। বার্নার্ড শ'রা তিন ভাই-বোন। দুই বোন লুসি ও আগনিস। মার আগ্রহেই তেরো বছর বয়সে একটি সানডে স্কুলে বার্নার্ড শ'র লেখাপড়া শুরু হয়।

পনেরো বছর বয়সে বার্নার্ড শ'র পরিবার দারুণ অর্থসঙ্কটে পড়েন। সাধারণ পরিচয়ে তিনি একজন মানুষ; কিন্তু ব্যবসায় মন্দা। সংসার প্রায় অচল। এমনকি বড় বাড়িটি পরিবর্তন করে একটি ছোট্ট বাড়িতে উঠে আসতে হল তাঁদের। সংসারের এ-দুঃসময়ে শ' বসে থাকলেন না। ডাবলিনে একটি ল্যান্ড এজেন্ট অফিসে কাজ নিলেন। অফিস-বয়ের কাজ। মাসে পান আঠারো শিলিং। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যিনি ভুবনবিখ্যাত হবেন তাঁর কি একই অবস্থায় পড়ে থাকা মানায়? চাকরিতে উন্নতি হল। দক্ষতার গুণে অল্পদিনেই ক্যাশিয়ার হয়ে গেলেন। বেতন বেড়ে গেল, মাসে সাত পাউন্ড।

এর মাঝে মা ও বোনেরা লন্ডনে চলে গেছেন। কিন্তু বার্নার্ড চাকরিতে মন লাগাতে পারলেন না। পাঁচ বছরের মাথায় চাকরি ছেড়েছুড়ে দিয়ে মা-বোনের কাছে লন্ডনে চলে এলেন। লন্ডন তো আর

যে-সে জায়গা নয়! এখানে শেক্সপিয়র ছিলেন, শেলি-কিটস্-বায়রন ছিলেন—আরো কত খ্যাতিমান মানুষ! এই আকর্ষণেই বার্নার্ড শ' চলে এলেন লন্ডনে। জ্ঞান অর্জনের নেশা তাঁর আগেই ছিল। লন্ডনে আসাতে নেশাটি আরো বেড়ে গেল।

লন্ডনের বিশাল পাঠাগার ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যান প্রতিদিন। লেখাপড়া করেন। সুস্বাদু খাদ্যের মতো বইপত্র চেখে-চেখে দেখেন। পড়লেন কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' বইটি। পড়লেন ভাগনারের গানের বই, আরো কত কী! এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই শ'র একদিন পরিচয় হল নাট্যকার ও নাট্যসমালোচক উইলিয়াম আর্চার ও সিডনি ওয়েবের সঙ্গে। এর ফলে নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মাল। শুনলেন হেনরি জর্জের রাজনৈতিক বক্তৃতা। বড় ভালো লাগল। হেনরি জর্জের লেখা পড়লেন। এ-সবকিছুর মাঝে পেলেন এক নতুন জীবনের সন্ধান। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এসব কথা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। সোজা কথায় বললে—এ সময়ে অজস্র বইপত্র পড়ে অনেক গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি এসে শ'র ধ্যানধারণা ও চিন্তায় প্রচুর ভাঙচুর হল। এসব অভিজ্ঞতায় তাঁর ভেতরে নতুন বিশ্বাসের জন্ম হল।

শুধু শরীরে নয়, অন্তরেও বেড়ে উঠতে লাগলেন জর্জ বার্নার্ড শ'। নতুন চিন্তায়-কল্পনায় তিনি জেগে উঠলেন। ঠিক করলেন মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। সোজাসুজি সত্যের কথা বলবেন। একবার নেতা হওয়ার সখ জেগেছিল তাঁর মনে। সেভাবে নিজেকে প্রস্তুতও করতে লেগেছিলেন। কিন্তু বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তৃতা করা আর মানুষের যথার্থ মঙ্গলের জন্য কাজ করা দুটো আলাদা ব্যাপার—এ-সত্যকথাটি যখন বুঝতে পারলেন তখন রাজনৈতিক নেতা হবার বাসনা ত্যাগ করে অন্য পথ ধরলেন।

নাটক ও সংগীত বিষয়ে সমালোচনা লিখতে শুরু করলেন বার্নার্ড শ'। তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজের মতো করে লিখলেন, আর তাই-ই মানুষকে বেশি করে আকর্ষণ করল। শিক্ষিত সমাজ প্রথমবারের মত তাঁর উপস্থিতি টের পেলেন। 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকায় সমালোচনা লিখে তিনি বিপুল সাড়া জাগালেন। এই পত্রিকাতে লেখালেখির সময় তাঁর এইচ. জি. ওয়েলস ও অস্কার ওয়াইল্ডের মতো বিখ্যাত দুজন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। নাটকের সমালোচনা লিখতে-লিখতেই জর্জ বার্নার্ড শ' একসময় নাট্যকার হয়ে উঠলেন।

১৮৯২ সালে সারা ইউরোপে নাটকের মেলা বসল। চারদিকে বিখ্যাত-বিখ্যাত সব নাট্যকারের নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। ইউরোপ জুড়ে উৎসবে মেতে উঠল নাট্যামোদীরা। এ-বছর অর্থাৎ ১৮৯২-র ২ ডিসেম্বর জ্যাক জেনের ইনডিপেন্ডেন্ট থিয়েটারে প্রথমবারের মতো অভিনীত হল জর্জ বার্নার্ড শ'র নাটক 'দি উইডোয়ার্স হাউসেস'। এখানে এই নাটক-মেলায় একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। নাটকের প্রথম রজনীতে জর্জ বার্নার্ড শ' এলেন। নাটক-শেষে দর্শকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও রুচিশীল তারা নাটকের বেশ প্রশংসা করলেন; কিন্তু যারা সাধারণ দর্শক, মানে নাটক নিয়ে যারা মোটেও মাথা ঘামান না বা বোঝার চেষ্টা করেন না, তারা একেবারেই খুশি হলেন না। বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ-নিন্দা করতে লাগলেন। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে উত্তেজিত শ' উঠে আসলেন মঞ্চে। ছয় ফুট লম্বা পাতলা চেহারার মানুষটি আইরিশ হলেও ইংরেজিতে বলতে শুরু করলেন। সে তো বলা নয়—অনর্গল অগ্নিবর্ষণ। প্রচণ্ড শক্তিতে বললেন, 'আমি জর্জ বার্নার্ড শ'। জাতিতে আইরিশ, এই নাটক লিখেছি। শুনুন, সস্তা হাল্কা গান-বাজনার জন্য থিয়েটার নয়। শেক্সপিয়রের যুগ এটা নয়, এখন থেকে থিয়েটারে ইবসেন আর বার্নার্ড শ'র যুগ শুরু হল। এখন থেকে থিয়েটার হবে শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির দর্শকদের জন্য। কথাটি মনে রাখবেন।' এর পর আর কী। সবাই প্রথমে স্তম্ভিত হল, তারপর অভিনন্দন জানাল উদীয়মান এই নাট্যপ্রতিভাকে।

বার্নার্ড শ' বুঝে গেলেন নাটকই তাঁর পথ। এ-পথেই তিনি চলবেন, তাঁর কথা বলবেন, কাজ যা-কিছু এ-পথেই করবেন। এ-পথ বেয়েই তিনি পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। ইংল্যান্ডের ক্ষয়িষ্ণু নাট্যশালা সংস্কারের কথা ভাবলেন। কালোপযোগী নাটকের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

প্রথম নাটক রচনার তিন বছর সময়ের মধ্যে আরো ছ'খানা নাটক লিখে ফেললেন। প্রতিটি নাটকই বিষয়বস্তুর দিক থেকে ভিন্ন-ভিন্ন। লিখলেন, 'দি ফিলানডার'—নির্মম ব্যঙ্গ করলেন সমাজকে এ-নাটকে। তারপর 'মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন'। দ্বিতীয় নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে ধুন্ধুমার হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। এ-নাটক প্রচলিত মানসিকতাকে প্রচণ্ড আঘাত করল। অনেকেই এ-নির্দয় সত্যকে সহ্য করতে পারল না। পার্লামেন্টে এ-নাটক নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডার পর নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হল। পরে অবশ্য ১৯২৪ সালে জনমতের চাপে সেন্সর-কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হলেন। এরপর একের পর এক নাটক : 'আর্মস এ্যান্ড দ্য ম্যান', 'ক্যান্ডিডা', 'দি ম্যান অব ডেসটিনি', এবং 'ইউ নেভার ক্যান টেল'।

চল্লিশ বছর বয়সে শ' বিয়ে করলেন মার্লোট পেইনহাউন সেন্ড নামের এক বিদুষী আইরিশ মহিলাকে। জর্জ বার্নার্ড শ'র জীবনের প্রয়োজনেই যেন দেখা হয়েছিল এই মহিলার সঙ্গে। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর দু'জনে পাশাপাশি থেকে সুন্দর জীবনযাপন করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর দু-বছর যখন বাকি অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে শ' লিখছেন 'সিজার এ্যান্ড ক্লিওপেট্রা', এরপর 'ম্যান্ড এন্ড সুপারম্যান'। ১৯০৫ সালে বিখ্যাত অভিনেতা গ্র্যানভিল বার্কার নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। শ'র খ্যাতি ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা পৌঁছে গেল। ঐ বছরই হাডসন থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা রবার্ট লোরেন 'ম্যান এ্যান্ড সুপার ম্যান' মঞ্চস্থ করেন। নাটকের সাফল্যে শ' নিজেই থ হয়ে গেলেন। শুধু রয়ালিটি বাবদই পেলেন পঞ্চাশ হাজার ডলার।

বার্নার্ড শ' যে শুধু সাহিত্যকর্ম নিয়েই মেতে থাকতেন তা নয়। রাষ্ট্র-সমাজ-সভ্যতার প্রয়োজনে সব সময়ই নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ইংল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে সমাজতন্ত্র নিয়ে শুধু হাসি-ঠাট্টা হত সেখানেই তিনি—সমাজতন্ত্রকে একটি সম্মানজনক অবস্থায় উন্নীত করেছিলেন। এ-লক্ষ্যে 'ফ্যাবিয়ান সোসাইটি' নামে একটি সংগঠনও তিনি গড়েছিলেন। এর পেছনে চিন্তা ছিল মানুষে-মানুষে সমতা সৃষ্টি করা, অকারণ রক্তপাত বা সংঘর্ষে না গিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে ধাপে-ধাপে সমাজের পরিবর্তন করা। ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শ' যখন কথা বললেন, তখন ইংল্যান্ডের লোকজন খেপে গেল। শ'র শান্তির আবেদন সবাই নাকচ করে দিল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষে শ' আবার রচনা করলেন নতুন যুগের উপযোগী নতুন-নতুন নাটক ও প্রবন্ধ। মানুষ তাঁকে অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক হিসেবে আবার অভিনন্দন জানাল। যুদ্ধোত্তর সময়ে তাঁর রচিত নাটকগুলোর মধ্যে 'সেন্ট জোয়ান' প্রসিদ্ধ।

১৯২৫ সালে জর্জ বার্নার্ড শ' সাহিত্যকর্মের পুরস্কার হিসেবে পান নোবেল প্রাইজ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথসহ গোটা পৃথিবী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

এক শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অন্য শতাব্দীর মাঝ বরাবরে চলে এলেন বার্নার্ড শ'। বৃদ্ধ হলেন কিন্তু দমলেন না একটুও। বাইরের বয়স বাড়ল কিন্তু ভেতরে অদম্য প্রাণসত্তা আর সতেজ লেখনীশক্তি অটুটই ছিল।

এই বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বিশাল বিখ্যাত মানুষটি ১৯৫০ সালের ২ নভেম্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যান। তবে যে-বিচিত্র সৃষ্টি ও কর্মময় জীবনের ছাপ তিনি রেখে গেছেন, সেটা কোনোদিনই মুছে যাবার নয়।

সাজেদুল করিম

কিন্টু-শীন্টুর কাণ্ড

কিন্টু-শীন্টুকে নিয়ে আর পারা গেল না।

ঐ তো সেদিন বাড়িতে মেহমান এলেন। আম্মা বললেন : 'যা তো, বাবা শীন্টু, শিগ্‌গির দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আয়। আর দেখবি, দোকানি যেন ওজনে কম না দেয়।' কিন্তু দোকানি যে-পরিমাণ মিষ্টি পাঠাল, তাতে আম্মার সন্দেহ।

বাটখারা-টা আনিয়ে তিনি পরীক্ষা করলেন।—প্রায় ছটাক-দুই কম। আর কী, আম্মা তো খাপ্পা! দোকানিকে সে কী কড়া চিঠি : 'কী হে বাপু, টাকা তো দিলাম পুরো এক সেরের-ই। অথচ ওজনের বেলায় কেন দু'ছটাক কম?'

দোকানিও কম না। পাল্টা উত্তরটা দিল চমৎকার : 'মহাশয়া, ওজন আমরা ঠিকই দিয়েছি। তবে যদি সত্যিই দু'ছটাক কম পেয়ে থাকেন, তাহলে জানবেন নিশ্চয় আপনার শীন্টু ওজনে দু'ছটাক বেড়েছে।

এমনি সব ব্যাপার শীন্টুকে নিয়ে।

এবার তাহলে শোনো শীন্টুর ব্যাপার। সেবার গ্রীষ্মের ছুটি। মা ঠিক করলেন, কিন্টুকে নিয়েই মামা বাড়ি যাবেন। শীন্টুর সে কী কান্না। মা বললেন, দেখ্ শীন্টু, তোকে সঙ্গে নিয়ে সেবার যা লজ্জা পেলাম। এবার কিন্টু-ই যাবে। দেখিস কিন্টু আমার লক্ষ্মীমণি। মামা-মামীর কাছে মা-এর নাম উজ্জ্বল করে তবে বাড়ি ফিরবে।

ওহ্, একটা কথা বলিনি বুঝি? কিন্টু-শীন্টু ছিল যমজ-ভাই। চেহারায় হুবহু এক। একজনা যেন আর-একজনার আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি! অবিকল একরকম। কিন্তু চেহারায় এক হলে কী হবে? দু'জনার দু'রকমের প্রকৃতি। শীন্টু ঝটপট। চটপট। অস্থির। এই তার স্বভাব। কিন্তু কিন্টু তার বিপরীত। স্মার্ট তো একেবারেই নয়, বরং কেমন-যেন ধীর-স্থির। শান্তশিষ্ট। তবে অবশ্য [বুঝতেই তো পারছ]—লেজ বিশিষ্ট!!

সে যাক গে। মামা-বাড়ি গিয়ে কিন্টু সত্যিই একদম পালটে গেল। মা-কে যেমন-যেমন কথা দিয়েছিল ঠিক তেমনি ভালোছেলে বনে গেল। ছুটোছুটি ক'রে আম-কাঁঠাল পেড়ে খাওয়া তো দূরের কথা, সে একটা নিরালা ঘরে বসে রাতদিন পড়াশুনা করে। মা তো জবর খুশি। কিন্টু বলল : মা, রোজ মামাতো ভাইবোনেরা এসে বারবার জ্বালাতন করে। কড়া নাড়ে। শান্তিতে পড়াশুনা করতে দেয় না। তুমি বরং বাইরে থেকে দোরটা তালা-চাবি দিয়ে আটকে দিও। খাবার সময় ডেকে নিলেই হবে।

মা তো বেজায় খুশি : কিন্টু—তাঁর কিন্টু-মণি—সত্যিই তাহলে মা-বাবার নাম উজ্জ্বল করবে।

এদিন মামা ছিলেন বাইরে। মফস্বলে। ফিরে এসে বলল, এ কী করেছিস রিজিয়া? কিন্টুকে কেন ও-কামরায় আটকে রেখেছিস?

মা হেসে বললেন, না ভাইজান। ও নিজেই নিজেকে আটকিয়েছে। ও আজকাল নিয়মিত পড়াশোনা করে।

মামা বললেন, হুঁ—পড়াশোনা না ঘণ্টা! শিগ্‌গির দরজাটা খোলো। এক-ঝুড়ি আধা-পাকা ফজলী আম আমি কিনে রেখেছিলাম ও-ঘরটাতে। ভাবলেম—ঘরে তো কেউ যায় না—সেখানে রেখে দেয়া যাক চৌকিটার নিচে। মফস্বল থেকে ফিরে এলে সবাই মিলে খাব।

মামার কথা শেষ হতে-না-হতেই মা, মামাতো ভাইবোনেরা দিল ছুট। গিয়ে দেখে ঝুড়িটা প্রায় নিঃশেষ হয়েছে। সামান্য কয়েকটা মাত্র বাকি আর তারি সুগন্ধে মাছিগুলো ভনভন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। মা হায়-হায় করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।—তুই দেখি শীন্টুকেও ছাড়িয়ে গেছিস, কিন্টু! সত্যিই মা-বাবার মুখ এবার উজ্জ্বল করলি!

এ তো গেল গ্রীষ্মের ছুটি।

এবার এল পুজোর ছুটি, অর্থাৎ যাকে বলে কিনা 'শারদীয় অবকাশ'। কিন্টু-শীন্টুর ফুফুর বাড়ি আবার ঢাকা। সুতরাং 'শারদীয় অবকাশ' যখন এল, ওরা দু'জনাই বায়না ধরে বসল, ওরা এবার ঢাকায়ই যাবে। আম্মার অবশ্য ইতিমধ্যে সুশিক্ষা হয়েছে—একজনাকে নিয়ে লাভ নেই। বরং দু'জনাই এবার মায়ের সাথে ঢাকা গেল।

ফুফুআম্মার বাড়ি কিন্তু মামাবাড়ির বিপরীত। ফুফু আদর করেন বটে, কিন্তু কড়া শাসন। সুতরাং ফুফুআম্মার বাড়িতে কিন্টু-শীন্টু একদম ঠাণ্ডা। চুপচাপ।—টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

ফুফুআম্মার বাড়ির খুব কাছেই একটা সন্দেশ-রসগোল্লার দোকান। কাজেই, কিন্টু-শীন্টুর নিত্যি ঐ দোকানটার চারপাশে ঘুরঘুর ঘোরাঘুরি। একদিন ফুফুআম্মা বললেন, 'যা তো, বাবা শীন্টু, এ টাকাটা দিয়ে মিষ্টি কিনে আন্।' বলে দশটা টাকা দিলেন শীন্টুর হাতে। সেদিন কিনা বিকেলবেলা ফুফুআম্মার মেয়ে শীলার জন্মদিন। আর সে-উপলক্ষেই এ খরচাটা।

আর কী! টাকা হাতে পেয়েই শীন্টু দিল ছুট। মিষ্টির দোকানে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ল সন্দেশ। সেখান থেকে খানিকটা সন্দেশ দিতে বললে দোকানিকে। দোকানি যখন সন্দেশ দিল, শীন্টু বললে : আচ্ছা সন্দেশ থাক। তার বদলে সমান দামের রসগোল্লা-ই দাও। দোকানি তাই করলে। এবার রসগোল্লা খেয়েই শীন্টু রওনা দিল। 'কী হে, দাম দিলে না?'—দোকানি পেছন থেকে ডাকল। শীন্টু যেন কিছুই জানে না : 'দাম? কিসের?' 'বা রে, রসগোল্লা খেলে। দাম দেবে না?' 'ওহ্, রসগোল্লা? সে তো আমি

কিনেছি সন্দেশের বদলে।' তা হলে সন্দেশেরি দাম দাও।' 'বা রে, সন্দেশ কি খেয়েছি যে দাম দেব?' বলেই ফের রওনা দিল। দোকানি তো হতভম্ব! কেমনতরো খদ্দের রে বাবা! কিন্তু পরক্ষণেই সে তার ইতি-কর্তব্য স্থির করে ফেলল। সে-ও ছুটল শীন্টুর পিছু-পিছু। শীন্টু অবশ্য এবার তার পদযাত্রা বাড়িয়ে দিল এবং খানিক পরেই ভোঁ-দৌড়। দোকানিও কিন্তু কম না। শাদা-পোশাক পরা এক ট্রাফিক পুলিশ ছিলেন দাঁড়িয়ে। তারি সাহায্য নিয়ে শিগ্‌গির শীন্টুকে পাকড়াও করে ফেলল।

হাতেনাতে ধরা পড়ে শীন্টু জড়োসড়ো হয়ে বলল : 'দেখুন, সত্যিই আমি চোর নই। মিষ্টি দেখলে আমি কেমন যেন হয়ে যাই। তাই ও-কাণ্ডটা ঘটল। তবে যদি আমায় ছেড়ে দেন, আমি কথা দিচ্ছি, আমি পুরো দশটাকার জিনিশই কিনব আপনাদের এখান থেকে।' বলেই ফুফুআম্মার দেয়া দশটা টাকা দেখায়। টাকা দেখে দোকানি আশ্বস্ত হয়। পথের লোকজনও বলল : 'ছেড়ে দিন। ছেলেমানুষ। তাছাড়া, ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। হাতে অভিভাবকের দেয়া একখানা মিষ্টির ফিরিস্তি-ও দেখা যাচ্ছে। কিনবেই বোধ হয়।' দোকানিও দেখে, মন্দ কী! ঝামেলায় গিয়ে কী লাভ! কিনবে যখন বলছে, কিনুক।

ক্রমে ভিড় কেটে গেল। শুধু একজন প্রফেসর সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দোকানি তাঁকে অনুরোধ করে বসালেন—সাক্ষী হিসেবে। কী জানি আবার যদি ভেগে পড়ে। এবার শীন্টু বলল : বেশ। কিনব যখন তাহলে ফর্দ-মাফিক একটা-একটা করে 'আইটেম' দেখাও। প্রফেসরও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। এদিকে শীন্টু করলে কী! রসগোল্লা তো আগেই চেখেছে। এবার লেডিক্যানি, এটমবম্ব, সন্দেশ, মালপুয়া, বুঁদে, চমচম, পানতুয়া, একটা একটা করে চেখে দেখল। তারপর বলল : 'দেখুন, আপনার নমুনাগুলো মন্দ না। তবে কিনা, আমি চেয়েছিলাম আরও একটু ভালো পদ। জানেন তো, আমার ফুফু বড্ড কড়া মানুষ। যা-তা মিষ্টি মুখে দেন না। তা আপনি যখন সেরকম কিছু দেখাতে পারলেন না, তবে চলি। ধন্যবাদ।'

বলেই রওনা দিল।

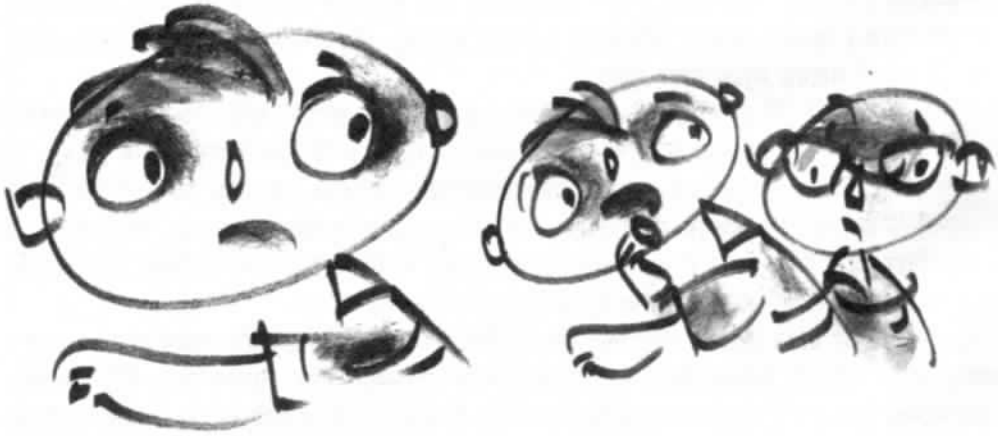

প্রফেসর দেখেন, বা রে! পুলিশের চক্ষে ধুলো দিয়ে, দোকানির হয়রানি করে, মিষ্টি চেখে, দিব্যি সরে পড়ছে। এ তো হতে পারে না। ওর পকেট থেকে ওই দশটাকার নোটখানা খসাতেই হবে। কী ভেবে, তিনি তৎক্ষণাৎ দোকানির কাছ থেকে দশটাকার পরিমাণ রসগোল্লা চেয়ে নিলেন। তারপর বললেন : 'শোনো খোকা। তুমি বুঝি রসগোল্লার খুব ভক্ত?'

'জি হ্যাঁ। সে কী আর বলতে!!'

দন্তরাজি বিকশিত ক'রে শীন্টু বলল।

'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে এ রসগোল্লাগুলো সব খাওয়াই?'

'খাওয়াবেন? আপনি! এতগুলো রসগোল্লা! নাহ্ আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'না হে, ঠাট্টা নয়। তোমার মতো ছেলেবেলায় আমিও রসিক ছিলাম। বাজি ধরে রসগোল্লা খেতাম। আজকেও তোমার সাথে আমার বাজি। তবে একটা শর্ত।—তোমাকে এ দশটাকার রসগোল্লা সম্পূর্ণ খেতে হবে। একটি কম খেয়েছ কী, অমনি তোমার হার। আর তখখুনি এ সমস্ত রসগোল্লার দাম তোমাকেই দিতে হবে। আর তারি প্রমাণ স্বরূপ—তোমার ওই দশটাকার নোটখানা এ দোকানির কাছে গচ্ছিত রাখো।'

'আর যদি পারি, স্যার?'

'যদি পারো তো তোমার দশটাকা ফেরত তো পাবেই। তাছাড়া পাবে আরো দশটাকা, আমার কাছ থেকে পুরস্কার। আর রসগোল্লার দাম-টাম আমিই চুকিয়ে দেব। কেমন রাজি? এই লোকজনেরা সব সাক্ষী।'

শীন্টুর জিভে জল এসে গেল।

সে রাজি হয়ে গেল। প্রফেসর ভাবলেন—দশটাকার রসগোল্লা খাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। সুতরাং শীন্টুকেই তার দুষ্টুমির শাস্তিস্বরূপ দশটা টাকা খুইয়ে যেতে হবে।

এদিকে শীন্টুর কিন্তু অতসব ভাবাভাবি নেই। 'প্রাণ-ভরে আগে খেয়ে নেই। তারপর দেখা যাবে।'—এই হচ্ছে তার মনের ভাব।

সুতরাং সে লেগে গেল খাওয়ায়।

গপাগপ সে খেয়েই চলল। কিন্তু কিছুক্ষণ খেয়েই সে বুঝতে পারল, সে মস্তবড় ভুল করেছে। লোভের বশে সে রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু দশটাকার রসগোল্লা! সত্যিই সোজা কথা নয়। তবু সে প্রায় আধাআধি সাবাড় করে এনেছে। হঠাৎ বললে : 'স্যার, আমি বাথরুমে যাব।' ভদ্রলোক বললেন : 'কী? বাথরুমের তো কথা ছিল না!'

'বাথরুমের আবার কথা থাকে নাকি, স্যার? এলেই যেতে হয়।'

প্রফেসর দেখেন, সত্যিই বাথরুমে যদি যেতে হয়, না দিয়ে তো আর পারা যায় না। শীন্টু হেসে বলল : 'ঘাবড়াবেন না, স্যার। আমার ফুফুর বাড়িটা ফুটপাথের ওই ওধারেই। আমার সাথে পুলিশ থাকুক। দেখুন, আমি এখুখুনি ফিরে আসছি।'

ট্রাফিক-পুলিশও মজা দেখবার জন্যে ফের ফিরে এসেছে। আরো অনেকে এসে জড়ো হয়েছিল। শেষপর্যন্ত কী দাঁড়ায়, দেখার জন্যে ট্রাফিক-পুলিশ রাজি হয়ে গেল।

সুতরাং বাসার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল : 'কিন্তু খোকাবাবু। খবরদার! তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু! শীন্টু মুখে বলল : 'এই এখখুনি ফিরে আসছি।' কিন্তু বাড়ির ভেতর গিয়ে, আসলে কিসের বাথরুম? শীন্টু তাড়াতাড়ি কিন্টুকে সমস্ত কথাটা খুলে বলল। তারপর বলল : 'হ্যাঁরে, কিন্টু। তোর চেহারা তো অবিকল আমারি মতোন। আর তারি জন্যে সারাটা জীবন তুই আমার কারণে কত-না চড়-থাপ্পড় খেলি। নে—আজকে ঋণশোধের দিন এসেছে। চটপট আমার প্যান্ট আর হাওয়াই শার্টটা পরে নে।'

হলোও তাই। কোনো কথাবার্তা না বলে, শীন্টুর পোশাক পরে, কিন্টু বাকি রসগোল্লাটা-ও সেরে দিয়ে এলো।

প্রফেসারের তো আক্কেল গুড়ুম!

খুদে একটা ছেলে-যে এত্তোখানি রসগোল্লা একা গিলতে পারবে, এ তাঁর ধারণাতেই ছিল না। সুতরাং কী আর করেন বেচারি প্রফেসর! বাজির শর্ত অনুযায়ী, পকেট থেকে কড়কড়ে দুখানা দশটাকার নোট বের করলেন এবং একখানা দিয়ে প্রথমত মিষ্টির দামটা চুকালেন, মায় যেসব নমুনা শীন্টু প্রথমত চেখেছিল তাদের দাম-ও। আর বাদবাকি দশটাকার নোটখানা কিন্টুর হাতে দিয়ে তবে বিদেয় হলেন। এদিকে গচ্ছিত দশটাকার নোটখানাও কিন্টু ফেরত পেল। সুতরাং আর কী! শীন্টু বের হয়েছিল দশটাকা হাতে করে; আর শীন্টু-বেশী কিন্টু এবার বাড়ি ফিরল বিশটাকা পকেটে নিয়ে।

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীযুদ্ধের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এখানে কি নেই গণিতের খেলা? আছে বৈ কি! পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে, রোজ বৃহস্পতিবার। কিন্তু সেদিন হিজরি তারিখ ছিল কত? এ-বিষয়ে খুব কম লোকই খবর রাখে। একটু হিসেব কষলে দেখা যাবে যে, সেদিন ছিল ৫ সাওয়াল, ১১৭০ হিজরির কাছাকাছি, মানে ঈদুল ফিতরের মাত্র কয়েক দিন পরে। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের জন্য একটি অতি পবিত্র দিন। ঐদিনের পরেও উৎসব চলতে থাকে আরও কয়েকদিন। ঐ সময় মুসলমান মাত্রই মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি থেকে বিরত থাকে। এমন সময় সৈন্যরা মনমানসিকতায় যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত থাকে। ক্লাইভ তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে উদগ্রীব হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পরে ভাগীরথী অতিক্রম করে পলাশী-প্রান্তরে এসে হানা গাড়ল।

বাকি ইতিহাস সকলেই জানো! মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজকে পরাজয় মেনে নিতে হল; আর বাংলার স্বাধীনতার সূর্য চিরদিনের জন্য না-হলেও, দুশো বছরের জন্য অস্তমিত হল।

'গণিতের রহস্য' বই থেকে

অলিম্পিকের গোড়ার কথা

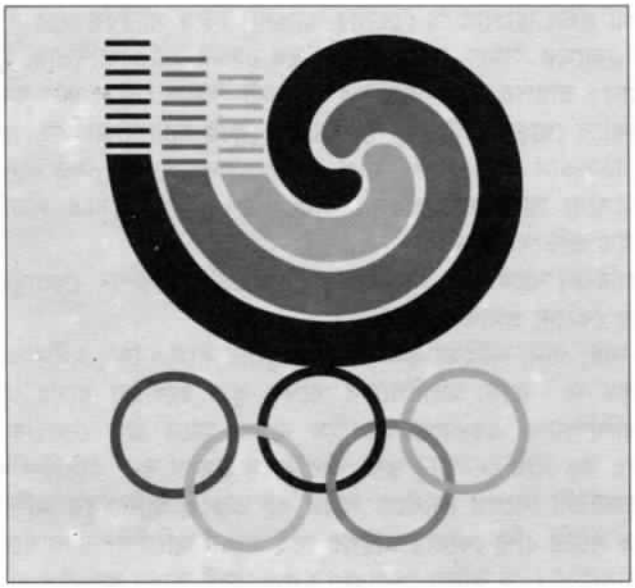

অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে, ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। চার বছরের ব্যবধানে এক-একবার বসত এই খেলাধুলার আসর। ঐ সময় সারা গ্রিসে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হত সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ। দেশের নানা প্রান্ত থেকে রাষ্ট্রনেতা, শিল্পী, লেখক, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড় সবাই এসে জমা হতেন অলিম্পিয়ায়।

গ্রিসের দক্ষিণ-পূর্বদিকে আছে এক পাহাড়ঘেরা উপত্যকা। তারই নাম অলিম্পিয়া। সেই অলিম্পিয়ার মাঠে প্রথম বসেছিল এই খেলাধুলার আসর। তার থেকেই এই ক্রীড়া-অনুষ্ঠানের নাম হয়ে গেল অলিম্পিক।

অতীতের সেইসব অলিম্পিক খেলাধুলার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে ইতিহাসের পাতায়। তার থেকে জানা যায় যে, ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। যে-কোনো প্রতিযোগীকেই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে হত নিজের যোগ্যতা। দশমাস অলিম্পিয়ার জিমন্যাশিয়ামে শরীরচর্চা করার পর প্রত্যেক প্রার্থীকে দিতে হত যোগ্যতার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই মিলত দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ।

এছাড়া গ্রিক ভাঁজের (নকশা-আঁকা ভাঁড় ও কলসি) গায়ে লাল বা কালো রঙের আঁকা ছবি দেখেও বিজয়ীর পুরস্কার কী ছিল অথবা কী কী বিষয়ে কেমনভাবে প্রতিযোগিতা হত তার কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যেসব তরুণ বিজয়ী হত তারা রাতারাতি হয়ে উঠত সারা গ্রিসের প্রিয়পাত্র। অথচ যে-প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এত মাতামাতি সেই খেলাধুলার বিজয়ীর

পুরস্কার ছিল একগুচ্ছ অলিভ-পাতা বা লরেন্স-পাতা দিয়ে তৈরি একটি মুকুট। সেইসঙ্গে পানীয় ভর্তি একটি আমাফোরা বা কলসি। এই মুকুট আর কলসি জিতে নেবার জন্যে সেকালে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারত গ্রিসের যে-কোনো তরুণ।

এই অলিম্পিকের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল রথ-চালনা। আর রথ-চালনার দৌড়-প্রতিযোগিতাটি ছিল যেমন রোমহর্ষক তেমনি আকর্ষণীয়। চার-ঘোড়ার রথে চেপে প্রায় চল্লিশজন প্রতিযোগী যখন হিপোগ্রামে (খেলার আঙিনা) গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াত তখন উল্লাসে ফেটে পড়ত স্টেডিয়ামের সমস্ত দর্শক। এই রথ-চালনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই শুরু হত অলিম্পিকের অনুষ্ঠান। তারপর একে একে দূর ও নিকট-পাল্লার দৌড়, ঢাল তলোয়ার নিয়ে দৌড়, বিনা লাগাম ও রেকাবে ঘোড়া ছোটানো, প্যানক্রেশন (কুস্তি আর বক্সিং-এর মাঝামাঝি একধরনের মারাত্মক দ্বন্দ্বযুদ্ধ), ডিসকাস ছোড়া, লাফ, ঝাঁপ, পেন্টাথেলন—পরপর চলত নানা অনুষ্ঠান। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ছিল পেন্টাথেলন। লাফ, ঝাঁপ, দৌড় প্রভৃতি পাঁচটি বিষয়ে পর পর অংশগ্রহণ করতে হত প্রতিযোগীকে।

শোনা যায়, কোরিকস নামে এক দৌড়বিদের প্রচেষ্টাতেই অলিম্পিক খেলাধুলার পত্তন হয়েছিল; কিন্তু ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নেই।

অতীতে মানুষ নাচ, গান, সাহিত্য এমনকি খেলাধুলার সঙ্গেও কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান জুড়ে না দিয়ে তৃপ্তি পেত না। তাই অলিম্পিকের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিল ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান আর দেবতার নাম। অলিম্পিয়ার একপ্রান্তে আলটিস নামক স্থানে ছিল দেবরাজ জিউসের মন্দির। এই জিউস গ্রিকদের বড় প্রিয় দেবতা। তাই তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল অলিম্পিক অনুষ্ঠান। জিউস মন্দিরের পূজারিণী বিশেষ তিথিতে পবিত্র ওলিভকুঞ্জে জ্বালাতেন অলিম্পিক মশাল। সেই মশাল জ্বালানো হত সূর্যের রশ্মি থেকে। তারপর সেই আগুন অলিম্পিয়ার আসরে বয়ে নিয়ে যেতেন গ্রিসের সেরা খেলোয়াড়রা। যে কদিন খেলাধুলা চলত, সেই কদিন অনির্বাণ রাখা হত ঐ জিউসের আগুন। সাধারণত সাতদিন ধরে চলত এই অনুষ্ঠান। তারপর নিজের হাতে সেই আগুন নেভাতেন জিউসের পূজারিণী।

অলিম্পিয়ার মাঠ ঘিরে গ্রিক-স্থপতিরা তৈরি করেছিলেন এক অপূর্ব স্টেডিয়াম। আগাগোড়া শ্বেতপাথরে তৈরি সেই স্টেডিয়াম ও জিউস-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এই স্টেডিয়ামের পাশে ছিল হিপোড্রাম ও জিমন্যাশিয়াম। হিপোড্রামটি নাকি সাজানো ছিল ৩০০০ মূর্তি দিয়ে। তার কিছু কিছু নিদর্শন এখনো রাখা আছে বিশ্বের নানা মিউজিয়ামে।

শোনা যায় অলিম্পিয়ায় শেষ খেলাধুলার আসর বসেছিল ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে। সেটা ছিল ২৯৩তম অলিম্পিক। এরপর রাজা থয়োডোসিরসের আজ্ঞায় বন্ধ হয়ে যায় সেই সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান। এখন পুরনো অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'অলিম্পিক্স'।

ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত ক্রীড়াসংগঠক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তা (১৮৬৩-১৯৩৭) নবপর্যায়ে আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা করেন। ১৮৯৬ সালে গ্রিসের ঐতিহ্যবাহী এথেন্সে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসে তাঁরই উদ্যোগে। প্রতি চারবছর পর পর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সব দেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে অলিম্পিক ক্রীড়াভূমি।

সুকুমার রায়

হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি

(প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সন্দেশে সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা কথা ছাপিয়েছি; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার-কাহিনীর কোনো উল্লেখ করিনি। সত্যি, এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সেসব কাহিনী কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরি থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এসব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।)

হেঁশোরাম হুঁশিয়ার ও দলবল

২৬শে জুন ১৯২২॥ কারাকোরম, বন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দু'জন শিকারি (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে।

নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিশপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি চন্দ্রখাই আর শিকারি দু'জন সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ, আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিশ।

দু'শো ঘণ্টা পথ চলে আমরা একজায়গায় এলাম; সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড় বড় গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত মস্ত লালরঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম—তাতে হলদে শাদা ফুল হয়েছে—এক-একটা দেড় হাত

লম্বা। আর-একটা গাছে ঝিঙের মতো কী সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপহাপ গুবগাপ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

আমি আর শিকারি দু'জন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার একটা মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট-দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড় কী-একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথমে দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তারপর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর; তারপর দেখি, মানুষও নয়, বাঁদরও নয়—একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো করে হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তারপর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসল। জন্তুটা মহাখুশি হয়ে একগ্রাসে আস্ত একখানা পাঁউরুটি আর প্রায় আধসের গুড় শেষ করে, তারপর পাঁচ-সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেয়া হয়েছিল, সেই টিনটাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রীমুখ করে সে কান্নার সুরে গাঁও-গাঁও শব্দে বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাথেরিয়াম।

২৪শে জুলাই, ১৯২২॥ বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার জিনিশ আছে, নতুন নতুন এতসব গাছপালা ফুলফল জীবজন্তু যে, তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দুশো রকম পোকা আর প্রজাপতি, আর পাঁচশ রকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি-যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোনো জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কী হয়। সেবার যখন কটক টোডন আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে-কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরিপের যন্ত্র দিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিশাবে হল ষোলো হাজার ফুট কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়াল্লিশ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দু'জনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দু-হাজার সাতশ ফুট। বোধহয় আমাদের যন্ত্রে কোনো দোষ হয়ে থাকবে। যা হোক, এটা নিশ্চয়ই যে এ-পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চূড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরি করে পথ চলতে হয়।

আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং 'ভাইয়া রে, ভাইয়া' বলে কেঁদে অস্থির। যা হোক, মিনিট-দশেক ঐরকম হাত-পা ছুড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্তমতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোনো সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না। আমি তার নাম দিয়েছি গোমরাথেরিয়াম। এমন খিটখিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আমরা আর দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজ-টোয়াজ করে

খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রীমতন মুখ করে, ফোঁস-ফোঁস ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারাগায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

১৪ই আগস্ট, বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর॥ ট্যাপ ট্যাপ থ্যাপ থ্যাপ ঝুপঝাপ।— সকালবেলায় খেতে বসেছি, এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতো বড়-একটা অদ্ভুতরকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোনদিকে চলবে তার কিছুই-যে ঠিকঠিকানা নাই। ডান পা এদিকে যায় তো, বাঁ পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনদিকে চায়, দশ পা না-যেতেই পায়ে-পায়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো করে দেখে, কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়কে গেল যে তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত-দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে। আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ করো, তাহলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার-পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।" ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ক্যাট ক্যাট শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপটাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতে সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজি লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড় সিংয়ের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সে-আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিঙের বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দুই

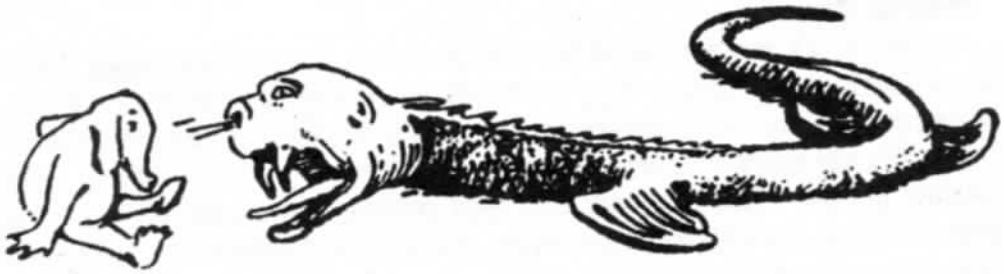

বেচারাথেরিয়াম ও চিল্লানোসোরাস

ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দু'জনের তেজ কী তখন! আমি আর দু'জন কুলি লক্কড় সিঙের জামা ধরে টেনে রাখছি; সে আমাদের-সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুসি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমতো ভারিক্কি মানুষ; সে ছক্কড় সিঙের কোমর ধরে লটকে আছে, ছক্কড় সিং তাই-সুদ্ধ মাটি থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্‌ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা-যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক, এই ল্যাগব্যাগ পাখি বা ল্যাগব্যাগর্নিসের কতগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে ॥ আমাদের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। তরিতরকারি যা ছিল, তা তো আগেই ফুরিয়েছে। টাটকা জিনিশের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস আর মুরগি আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়। তাছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ আর মাংস— এইসব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এইসব জিনিশ গুনছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে লক্কড় সিং ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। আমরা বললাম, "ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়?" কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘণ্টা গেল অথচ লক্কড় সিঙের দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরোবার পরামর্শ করছি এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে। দেখেই আমরা সুড়সুড় করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, "পালিও না, পালিও না, ও কিছু বলবে না।" তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে সে ঐ অতবড় জানোয়ারটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে, সে সকালবেলা কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখে জন্তুটা মাটিতে শুয়ে 'কোঁ কোঁ' শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে বেশ করে ধুয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, "তাহলে ওটা ওইরকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।" জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম।

সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকেলবেলা আর-এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর প্যাঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যেরকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে-শুয়ে একটা গাছের লম্বা-লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চিৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেইরকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে, কতক দৌড়িয়ে, একমুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না-পেরে ভয়ে-ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু—সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটেরই কিছু কিছু আদল আছে। সে একহাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে; আর একটা ছোট নিরীহগোছের কী যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি। কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চিৎকারই চলতে লাগল;

ল্যাংড়াথেরিয়াম

খাবার কোনো চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি।" আমি বললাম, "কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমতো না লাগে, তাহলে জন্তুটা খেপে গিয়ে কী জানি করে বসবে, তা কে জানে?" এই বলতে বলতেই ধেড়ে-জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, "জন্তুটার নাম দেওয়া যাক চিল্লানোসোরাস।" ছক্কড় সিং বলল, "উ বাচ্চাকো নাম দেও বেচারাথেরিয়াম।"

৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে॥ নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পড়েছি। আর কোনোদিকে এগোবার জো নেই। দেয়ালের মতো খাড়া পাহাড়; সোজা দুশো-তিনশো হাত নিচে সমতল জমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই একরম। নিচে যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এইসব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত-পঞ্চাশেক নিচেই কী যেন একটা ধড়ফড় করে উঠল। দেখলাম, বেশ একটা মাঝারি গোছের তিমিমাছের মতো মস্ত কী-একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঘুমোচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ-সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনোটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনোটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কী যেন খুঁটে-খুঁটে বের করে খাচ্ছে।

এইরকম দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কটকটাং-কট শব্দ করে প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল। এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তারপর যে কী হল আমার ভালো করে মনে

নেই। খালি একটু-একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব বিটকেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটানো আর জন্তুটার ভয়ানক কটকটাং আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল, তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার যোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিঙের একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে; লক্কড় সিঙের বাঁ হাতটা এমন মচকে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে; আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই একহাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর-এক হাতে এক মুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিশপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।

(প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরি এখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও এ খবর জানবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, এর কাছেই সব খবর পাবে। চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে-কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই :

আমরা। আপনারা যে-সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সেসব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়?

চন্দ্র। সেসব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কী! হারিয়ে গেল? এমন এমন জিনিশ সব হারিয়ে ফেললেন?

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু-যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে-দেশের ঝড় তো আপনারা দেখেননি। তার এক-এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড় বড় তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুশ করে উড়িয়ে নেয়। একবার তো ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল সে তো আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা-কম্পাস, প্ল্যান, ম্যাপ, খাতাপত্র—কিছুই আর বাকি রাখেনি। কী করে যে ফিরলাম তা শুনলে আপনার ওই চুলদাড়ি সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনোদিন না-খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিনমাস লেগেছিল।

আমরা। তাহলে আপনার প্রমাণ-ট্রমাণ যাকিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কী প্রমাণ চাই? আর এই আপনাদের সন্দেশের জন্য কতকগুলো ছবি এঁকে এনেছি; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, "আপনি কোন থেরিয়াম?" আর একজন বলল, "উনি হচ্ছেন গল্পথেরিয়াম--বসে বসে গল্প মারছেন।" শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চীনেবাদাম আর গোটা-আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপার তো এই। এখন তোমরা কেউ যদি আরো জানতে চাও, তাহলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসর হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব আনিয়ে দিতে পারি।)

পৃথিবীর সেরা জাদুঘর লুভ্‌র

জাদুঘর-এর মূল ভবন

মোনালিসার ভুবনমোহিনী হাসির কথা কে না জানে? লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির এই অমর চিত্রটির মৃদু হাসির ব্যাখ্যা যুগ-যুগ ধরে মানুষ লিখে আসছে। অথচ সে হাসি আজও সেই পূর্বের মতোই রহস্যময় এবং ঘোরতররকম বিতর্কিত। এই মোনালিসাকে দেখতে হলে আমাদের যেতে হবে প্যারিস শহরের লুভ্‌র জাদুঘরে। এরকম জাদুময় জাদুঘরও পৃথিবীতে আর আছে কি-না সন্দেহ। মানবসভ্যতার বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন যুগের সম্পদ থরে-থরে বোঝাই করে রাখা হয়েছে এই জাদুঘরটিতে।

লুভ্‌র আসলে একটি বিশাল প্রাসাদ (পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রাসাদ), আলাদাভাবে যেটিকে দেখার জন্যই একসময় লোকের ভিড় হত। সেখানে ১২০০ খ্রিস্টাব্দে রাজা ফিলিপ অগ্যস্ত যখন প্রথম লুভ্‌র বানান তখন সেটি একটি দুর্গ ছাড়া কিছুই ছিল না। স্যেন নদীর ধারে রূপবতী প্যারিস শহরের পাহারার জন্যই লুভ্‌রের জন্ম। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া এই আধা-গথিক, আধা-রেনেসাঁস স্টাইলের প্রাসাদটিতে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি প্রাসাদটির দুর্গ-দুর্গ ভাবটা দূর করার জন্য অনেক দেওয়াল ভেঙে ফেলেন এবং তার চত্বরে চমৎকার চমৎকার বাগান সৃষ্টি করেন। রাজা দ্বিতীয় আরির মৃত্যুর পর রানী কাতরিন দ্য মেদিচি এই প্রাসাদে থাকতে আসেন। তবে তিনি ঠিক লুভ্‌রে না-থেকে তার থেকে ৫০০ গজ দূরে তুইলেরি প্রাসাদ বানান। লুভ্‌র, তুইলেরি প্রাসাদ এবং তুইলেরির বাগিচা মিলে অবশেষে যা দাঁড়াল তা আজও দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

কাতরিন দ্য মেদিচির পর বিভিন্ন রাজা-রাজড়ারা প্রচুর ব্যয় করে লুভ্‌রের চেহারার রদবদল করেছেন। বড় বড় শিল্পী নিয়োগ করে তাঁরা লুভ্‌রের গায়ে কারুকার্যের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। শিল্পীদের দিয়ে তাঁরা আঁকিয়েছেন প্রাসাদটির বিভিন্ন সুবিস্তৃত ছাদ। এছাড়া থেকে-থেকে নতুন-নতুন ঘর তো তাঁরা বাড়িয়েছেনই। তারপর একসময় শিল্পী ক্লোদ পেরো এসে প্রাসাদে জুড়ে দিলেন বিস্ময়কর সব স্তম্ভ, স্রেফ শিল্পকীর্তি হিসেবেও যাদের মূল্যায়ন করা মুশকিল।

লুভ্‌রকে যত্নের সঙ্গে বাড়িয়ে তুলেছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা চতুর্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই। মহামন্ত্রী কার্দিনাল রিশল্যু একসময় রাজকীয় টাকশালটিকে তুলে এনেছিলেন লুভ্‌রে এবং চতুর্দশ লুই প্রাসাদটির বিভিন্ন ঘরে স্টুডিও বসাতে অনুমতি দিয়েছিলেন রাজ্যের বড় বড় শিল্পী এবং ভাস্করদের। এ-ছাড়া স্বয়ং নেপোলিয়ন লুভ্‌রের জন্য যা করেছেন তা তো ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। নেপোলিয়ন যখন ফ্রান্সের সম্রাট হন ততদিনে লুভ্‌র জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। ষোড়শ লুইয়ের আমল থেকেই লুভ্‌রকে জাদুঘর তৈরির চেষ্টাচরিত্র চলছিল। মনীষী দিদেরো তাঁর ঐতিহাসিক 'বিশ্বকোষ'-এ লুভ্‌রকে জাদুঘর বানানোর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। তবে প্রথাসিদ্ধভাবে এই কাজটা যেদিন সম্পন্ন হয় সে-তারিখটা ১৭৯৩ সনের ১০ আগস্ট। অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের চার বছর পর।

নেপোলিয়নের বহুমুখী প্রতিভার কথা আমরা জানি। বীরপুরুষ নেপোলিয়নের প্রচণ্ড টান ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি। যে-দেশই তিনি জয় করেছেন সে-দেশেরই পুরনো শাস্ত্রের নতুন চর্চার রেওয়াজ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে নজরানা বা উপঢৌকন হিসেবে কিছু শিল্পকর্ম দাবি করতেন এবং সেইসব অমূল্য সম্পদ নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখতেন লুভ্‌রে। এভাবে সামান্য ক'বছরে লুভ্‌রের সম্পদ যে কী বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন তা বাড়িয়ে বলার দরকার হয় না। একবার লুভ্‌রে গেলেই হদিশ মেলে। তবে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ১৮১৫ সনের ভিয়েনা কংগ্রেসের বৈঠকের পর নেপোলিয়নের যোগাড়-করা বহু কাজ ইউরোপের দেশগুলোয় ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু যে-দরদ এবং ভালোবাসা দিয়ে নেপোলিয়ন লুভ্‌রের সংগঠনের কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন, সেই কাজ কিন্তু তাঁর বিদায়ের পরও অব্যাহত থেকেছে।

লুভ্‌র খুবই সোহাগের সঙ্গে স্মরণ করেছে নেপোলিয়নকে। নেপোলিয়নকে নিয়ে আঁকা তিনটি বিশাল, অসাধারণ তৈলচিত্র আজও ঝুলছে লুভ্‌রে। এর মধ্যে অমর শিল্পী লুই দাভিদের আঁকা নোত্রদামে নেপোলিয়নের রাজমুকুট গ্রহণ ছবিটি কখনও ভোলা যাবে না। রানী জোসেফিন হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছেন। দেবতুল্য মূর্তি নেপোলিয়নের, তিনি তাঁর হাতে নিজের মুকুটটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রোমের পোপ, তাঁর হাতে ধর্মের দণ্ড, মাথায় ধর্মের মুকুট। নোত্রদাম চার্চের ভিতরটায় মানুষের ভিড় যেন উপচে পড়ছে। এত ডিটেলে এবং দরদে গোটা ছবিটা আঁকা যে কিছুতেই যেন চোখ ফেরানো যায় না। তবে দাভিদ ইচ্ছাকৃতভাবেই ছবিতে নেপোলিয়নের মা লেতিজিয়াকে এঁকেছেন যদিও তিনি ওই আসরে উপস্থিত ছিলেন না।

আঁতোয়ান গ্রো'র আঁকা নেপোলিয়নের ছবিটিও স্মরণীয়। নেপোলিয়ন তখনও সম্রাট নন, জেনারেল বোনাপার্ত মাত্র। তিনি প্রাচ্যের জাফা শহর অধিকার করার পর সেখানকার প্লেগের রোগীদের দেখতে এসেছেন। রোগীরা অবাক হয়ে দেখছে তাকেই। ভারি জীবন্ত ছবি।

লুভ্‌রকে কেবল একটা শিল্পের গ্যালারি ভাবলে ভীষণ ভুল করা হবে। একটা সাধারণ জাদুঘর ভাবলেও একই রকম ভুল হবে। শিল্পকলা, ইতিহাস এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ মিলেমিশে লুভ্‌রকে একধরনের কালাধারে পরিণত করেছে।

আগেই বলা হয়েছে লুভ্‌র দেখা মানে মানবসভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। মিশরীয়, আসিরীয়, গ্রিক, রোমক এবং আধুনিক ইউরোপের সভ্যতার নিদর্শনের পাশাপাশি প্রাচ্যের

অন্যান্য আদি এবং মধ্যযুগীয় সভ্যতার বহু শিল্পবস্তু, প্রস্তরলিপি এবং দলিল-দস্তাবেজ এখানে আছে। এই মুহূর্তে লুভ্‌রের সম্পদের তালিকায় চার লক্ষ জিনিশের হিসেব আছে। এর সবটাই অবশ্য দর্শকের সামনে মেলে ধরা সম্ভব হয়নি। বিশেষ-বিশেষ ঘর আছে যেখানে পৌরাণিক সম্পদ নিয়ে এখনো পণ্ডিতেরা গবেষণা করেন। দর্শকদের জন্য যেটুকু দেখানোর ব্যবস্থা আছে তা ভালোভাবে দেখে উঠতে দিনের পর দিন কেটে যায়।

লুভ্‌রে একটা অংশ আছে যেখানে দাঁড়ালে আমরা প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া, সুমের কিংবা আক্কাদে পৌঁছে যাই মনোগতভাবে। প্রথম ব্যাবিলনীয় রাজত্বের একটা নিদর্শনের কথাই বলি বরং। জিনিশটি একাধারে একটি শিল্পকর্ম এবং ঐতিহাসিক দলিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৭৯২ থেকে ১৭৫০-এর মধ্যে খোদাই-করা রাজা হামুরাবির অনুশাসনলিপি। সওয়া দুই মিটার লম্বা কালো পাথরে আক্কাদিয় ভাষায় খোদাই-করা এই লিপিতে সে-সময়কার আইনব্যবস্থার কথা বলা আছে : "যাতে রাজ্যের লোক কঠোর শৃঙ্খলা এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার রপ্ত করতে পারে।" পাথরের মাথার দিকটায় স্বয়ং হামুরাবিকে দেখা যাচ্ছে সূর্যদেবতার উপাসনায় রত।

পারস্যের আকেমেনিদ রাজত্বের গৌরবের ছটা দেখি রাজা দারিয়ুসের (খ্রিস্টপূর্ব ৫২১-৪৮৫) প্রাসাদের বড় বড় স্তম্ভগুলিতে। সুসার এই বিখ্যাত প্রাসাদটির স্তম্ভগুলি প্রায় সেইভাবেই সাজিয়ে রাখা আছে লুভ্‌রে। এছাড়া একটু এধার-ওধার করে ঘুরে দেখা যায় পারসীয় টেরাকোটা, ফিনিসীয়দের ব্যবহার্য জিনিশপত্র, এবং ইসলামিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন সময়ের শিল্পকীর্তি, সমরাস্ত্র এবং তৈজসপত্র।

মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কিত গবেষণার পক্ষেও লুভ্‌র একটা অসাধারণ আশ্রয়। মিশরীয় সভ্যতার গোড়া থেকে শেষ অবধি আলোচনা করা সম্ভব লুভ্‌রের সম্পদ বিশ্লেষণ করে। মিশরের হাজার-হাজার বছরের পুরনো মমির কথা ছেড়েই দিলাম। একটা জায়গায় তো মিশরের একটা প্রাচীন মন্দিরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই সুপ্রাচীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বানিয়ে তোলা হয়েছে, ঠিক যেভাবে সেটি দাঁড়িয়ে ছিল নীলনদের আশপাশের কোনো অঞ্চলে কয়েক হাজার বছর আগে।

লুভর-এ রাখা বিখ্যাত ছবিগুলোর একাংশ

খ্রিস্টপূর্ব আড়াই-তিন হাজার বছরের মিশরীয় সম্পদে লুভ্‌র আকীর্ণ। এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে রাজা দিদুফ্রি, সাজকগুরু আমেনেমহাতাংখ, দেবী নেপথিস, চতুর্থ আমেনোফিস, দেবী হাঠোর, কিংবা প্রাচীন মিশরের টলেমোইক, রোমক কিংবা বাইজানটাইন পর্যায়ের অসংখ্য রাজা রানী, রাজন্যের মূর্তি। পিরামিডের ভিতরের জিনিশ দিয়েই একজায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে পিরামিডের অভ্যন্তর। এছাড়াও প্রাচীন ছোরা-ছুরি, তীর-ধনুক, বাসন-কোসন, জলের পাত্র, শিলালিপি, হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটায় লুভ্‌র এক অন্যতম ডিসনিল্যান্ড—যার কোনো জিনিশপত্রই কাল্পনিক নয়, ঐতিহাসিক।

লুভ্‌রে আশ্চর্যভাবে বেঁচে আছে প্রাচীন গ্রিস এবং রোম। আমি গ্রিস এবং ইতালি যাওয়ার আগে একটা প্রাথমিক গবেষণা করে নিয়েছিলাম লুভ্‌রে বসে। পরে ওই দুটো দেশে গিয়ে যে কী সুবিধে হয়েছিল তা কী বলব। এথেনসে পারথেনন দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলাম। এই পারথেননের 'এরগাসতিনিস' ফ্রিজটা আমি লুভ্‌রেই প্রথম দেখি। পারথেননের আরও অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি রাখা আছে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। অলিম্পিয়া থেকে আনা 'হারকুলিস এবং ক্রিটের ষাঁড়' মূর্তিটিও (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০) লুভ্‌রে আছে। আর আছে গ্রিসের অমর ভাস্কর প্রাকসিটিলিসের 'অ্যাপোলো এবং টিকটিকি' (৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) নামক অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি।

তবে যে-দুটি প্রাচীন মূর্তির জন্য লুভ্‌র বিশ্ববিখ্যাত এবার তাদের কথায় আসি। লুভ্‌রে ঢুকেই যে-হলঘর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো আছে অসংখ্য রোমক প্রস্তরমূর্তি। বিভিন্ন সিজার, বিভিন্ন রাজনীতিক এবং স্মরণীয় রদের মূর্তি সে-সব। তাদের পেরিয়ে আসতেই একটা বিশাল সিঁড়ি পড়ে। খুব চওড়া এবং বেশ উঁচু সিঁড়ি সেটা। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলেই চোখে পড়বে 'সামোথ্রাসের জয়' ভাস্কর্যটি। মুণ্ডবিহীন এক অতিকায় মানবী, যার গতি সামনের দিকে, যার পিঠ জুড়ে দুটি বিশাল পক্ষ। হাওয়ার ঝাপটায় তার বস্ত্র গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে, কিন্তু তার বিজয়ী পক্ষযুগল যেন সমস্ত বায়ুবেগকে উপেক্ষা করেই উড্ডীন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে রোদীয়দের নৌ-বিজয়ের স্মারক এই মূর্তি। এক মস্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়ানো এই মূর্তি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু হবে মাটি থেকে।

মোনালিসা তো লুভ্‌রে আছেই, তা ছাড়াও আছে বিশ্বখ্যাত সম্পদ ভেনাস ডি মিলো-র সেই প্রসিদ্ধ ভাস্কর্যকর্মটি। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেলোস দ্বীপে গ্রিক-দেবী আফ্রোদিতির এই মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়। তখন ফরাসি সরকার ছয় হাজার ফ্রাংক দিয়ে এটি কিনে নিয়ে লুভ্‌রে স্থাপন করেন। অনেক পণ্ডিতের মতে এটা গ্রিক-ভাস্কর প্রাকসিটিলিসের কাজ। সে মত অবশ্য এখন বদলেছে, তবে মূর্তিটির সমস্ত মুখে, শরীরে, বস্ত্রে গ্রিক-জিনিয়াসের ছাপ স্পষ্ট। এত নিখুঁত, এত সাবলীল, আশ্চর্যরকম সুন্দর এবং গভীর মূর্তি না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গোটা নারীজাতির সৌন্দর্য যেন এই অর্ধনগ্না, হস্তবিহীন শিল্পকর্মের মধ্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। প্রাচীন শিল্পকর্মের জগতে ভেনাস ডি মিলোর স্থান একেবারে শৌর্য এবং মহত্ত্বের শিখরে। প্রাচীন গ্রিসের অমর শিল্পীদের মূর্তি কিংবা রেনেসাঁস যুগের অন্যতম শিরোমণি মিকেলাঞ্জেলার 'পিয়েতা', 'ডেভিড' কিংবা মোজেস'-এর সঙ্গে এর তুলনা চলে।

মিকেলাঞ্জেলোর 'মৃত্যুপথযাত্রী দাস' ভাস্কর্যটিও লুভ্‌রে আছে। আছে রেনেসাঁস-যুগের সমস্ত মহান শিল্পীদের আঁকা ছবি। যে-ঘরটিতে রাখা আছে মোনালিসাকে সেই ঘরেই আছে পল ভেরোনেজের ৩০ ফুট × ৩০ ফুট তৈলচিত্র 'কানা শহরে বিয়ের উৎসব'। ওফ! কী ছবি। বিশাল ছবির মধ্যিখানে যিশু বসে আছেন। মোনালিসার থেকে চোখ কেড়ে নিয়ে যায় এই ছবি। ছবি তো নয় যেন সাক্ষাৎ জীবন! ঘুরতে ফিরতে চারদিকে চোখে পড়ে তিশিয়ান, রাফায়েল, ফ্রা আঞ্জেলিকো, পাওলো উচ্চেলো, আন্দ্রেয়া মানতেনিয়া, সিমাব্যু, কারাভেগ্গিয়োর ছবি কিংবা সানদ্রো বত্তিচেলির ফ্রেসকো। ইনি বলেন আমায় দেখ, তো উনি বলেন আমায় দেখ। লুভ্‌রে সাজানো

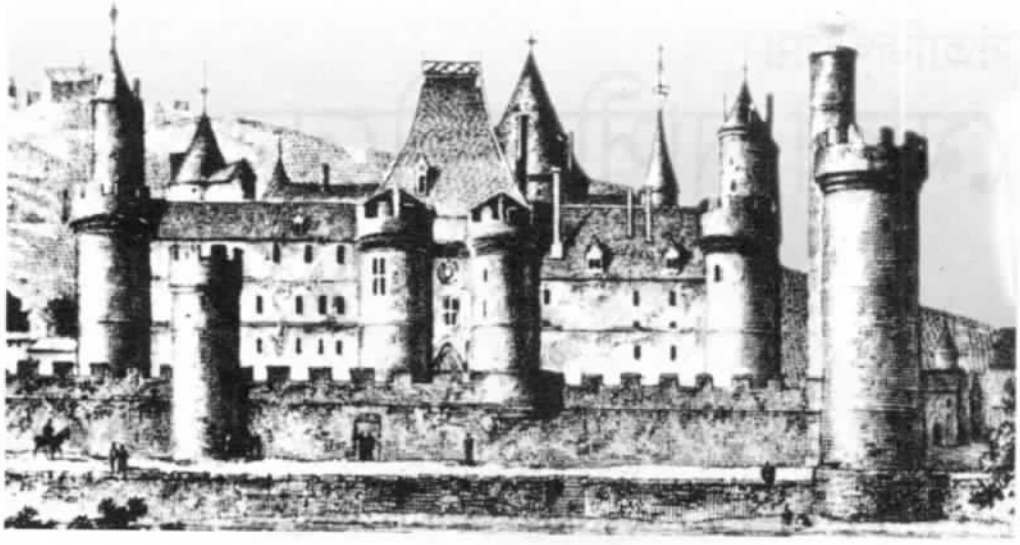

কিং ফিলিপ-এর সময় এ ভবনেই শুরু হয় জাদুঘরের

স্রেফ রেনেসাঁস আমলের ছবি নিয়েই অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। এখানে সেসব ছবির নাম দেওয়ারও জায়গা হবে না।

সময়ের দিক থেকে আরও এগিয়ে এলে আমরা মুখোমুখি হব রুবেনসের, ভ্যান ডাইকের, আলব্রেখট ডুরর, ভেরমির ফ্রানজ হালস, হলবেইন এবং ওই অমর মানুষ রেমব্রানটের। আমার এবং বহু মানুষের জীবনে রেমব্রানটের উপস্থিতি ঈশ্বরের মতো। আলো-আঁধারির যে গভীর, চেতনাময় জগৎ তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তার উপমা কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টি দিন এবং রাত্রি। রেমব্রানটের বৃদ্ধ বয়সের আত্মপ্রতিকৃতি রাখা আছে লুভ্‌রে। দেখে মনে হবে তিনি ওইখানেই সশরীরে অনন্তকালের জন্য বসে আছেন।

তাছাড়া লুভ্‌রে রাখা আছে স্পেনদেশের তিন শ্রেষ্ঠ—ভেলাসকেজ, এল গ্রেকো এবং গোইয়ার ছবি। ফরাসি শিল্পকলার সব মহান শিল্পীর কাজও হাজির লুভ্‌রে। সম্প্রতি অতি আধুনিক যুগের শিল্পীদের কাজ অন্য এক গ্যালারিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে দাভিদ, প্রোদেহ, জেরিকো, দেলাক্রোয়া, অ্যাংগর, মিলে, কুরবে, পুস্যাঁ বা ক্লোদ লোরহ্যাঁকে দেখতে হলে আমাদের বারবার যেতে হবে লুভ্‌রেই। ফরাসি শিল্পকলার ভিত বানিয়ে গেছেন এঁরাই।

লুভ্‌রে মজার জিনিশপত্রের মধ্যে আছে ফরাসি রাজাদের হিরে-জহরত-সোনা-দানা। চোখ ধাঁধিয়ে যায় দেখতে-দেখতে। পঞ্চদশ লুইয়ের হীরেতে মোড়ানো মুকুট দেখলে গা ছমছম করে। সংগ্রহশালার সবচেয়ে বড় হীরেটা কিন্তু গিয়েছিল আমাদের মাদ্রাজ শহর থেকে। তুলনায় অনেক ছিমছাম, অনাড়ম্বর সম্রাট নেপোলিয়নের মুকুট, যে-মুকুট আমরা লুই দাভিদের ছবিতে দেখেছি। অনতিদূরে দেখা যাবে মারি আঁতোনেতের নিজস্ব চেয়ার, কিংবা রাজা পঞ্চম চার্লসের রাজদণ্ড।

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে যখন লুভ্‌র মেট্রো স্টেশনে দাঁড়াব, দেখব সেই স্টেশনটিকেও অমূল্য সম্পদ দিয়ে একটা খুদে লুভ্‌র বানিয়ে রেখেছেন ফরাসি সরকার। অপার বিস্ময়ে মুখ ফুটে এবার হাসিই বেরিয়ে আসবে।

আনন্দমেলা থেকে

সত্যজিৎ রায়

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

■ গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করল নাসীরুদ্দীনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বললে, 'মোল্লাসাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না!' নাসীরুদ্দীন এক কথায় রাজি।

দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসীরুদ্দীন উপস্থিত সবাইকে সেলাম জানিয়ে বললে, 'ভাই সকল, বলো তো দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি?'

সবাই বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে তো আমরা জানি না।'

মোল্লা বলল, 'এটাও যদি না-জানো তাহলে আর আমি কী বলব। যাদের বলব তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কী করে?'

এই বলে নাসীরুদ্দীন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এল।

গায়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার তার বাড়িতে গিয়ে হাজির।

'আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর-একটিবার আসতেই হবে মসজিদে।'

নাসীরুদ্দীন গেল, আর আবার সেই প্রথমদিনের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করল। এবার সব লোকে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'

'সবাই জেনে ফেলেছ? তাহলে তো আর আমার কিছু বলার নেই'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার বাড়ি ফিরে গেল।

গাঁয়ের লোক ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসীরুদ্দীন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তার সেই বাঁধা প্রশ্ন করল। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক, তাই অর্ধেক বলল 'জানি', অর্ধেক বলল 'জানি না'।

'বেশ, তাহলে যারা জানো তারা বলো, আর যারা জানো না তারা শোনো'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার ঘরমুখো হল।

■ নাসীরুদ্দীন একজন লোককে মুখ ব্যাজার করে রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখে জিগ্যেস করলে তার কী হয়েছে। লোকটা বললে, 'আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে মোল্লাসাহেব। হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাই নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছি, যদি কোনো সুখের সন্ধান পাই।'

লোকটির পাশে তার বোঁচকায় কতগুলো জিনিশপত্র রাখা ছিল। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র নাসীরুদ্দীন সেই বোঁচকাটা নিয়ে বেদম বেগে দিল চম্পট। লোকটাও হাঁ হাঁ করে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু নাসীরুদ্দীনকে ধরে কার সাধ্য! দেখতে দেখতে সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে হাওয়া। এইভাবে লোকটিকে মিনিটখানেক ধোঁকা দিয়ে সে আবার সদর-রাস্তায় ফিরে বোঁচকাটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

এদিকে সেই লোকটিও কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির। তাকে এখন আগের চেয়েও দশগুণ বেশি বেজার দেখাচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় তার বোঁচকাটা পড়ে আছে দেখেই সে মহাফুর্তিতে একটা চিৎকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গাছের আড়ালে থেকে নাসীরুদ্দীন বললে, 'দুঃখীকে সুখের সন্ধান দেবার এও একটা উপায়।'

■ নাসীরুদ্দীন একবার ভারতবর্ষে এসে এক সাধুর দেখা পেয়ে ভাবলে, 'আমার মতো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। এঁর সঙ্গে আলাপ না-করলেই নয়।'

তাঁকে জিগ্যেস করতে সাধু বললেন তিনি একজন যোগী; ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তাঁর ধর্ম।

নাসীরুদ্দীন বললে, 'ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি মৎস্য একবার আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।'

এ-কথা শুনে যোগী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'আমি এত দীর্ঘকাল প্রাণীর সেবা করেও তাদের এত অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। একটি মৎস্য আপনার প্রাণরক্ষা করেছে শুনে এই দেখুন আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না তো কে থাকবে?'

নাসীরুদ্দীন যোগীর সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে যোগের নানা কসরত শিক্ষা করলে। শেষে একদিন যোগী বললেন, 'আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে যদি সেই মৎস্যের উপাখ্যানটি শোনান।'

'একান্তই শুনবেন?'

'হে গুরু!' বললেন যোগী, 'শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'তবে শুনুন', বললে নাসীরুদ্দীন, 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায়-যায় অবস্থায় আমার বঁড়শিতে একটি মাছ ওঠে। আমি সেটা ভেজে খাই।'

সুব্রত বড়ুয়া

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়

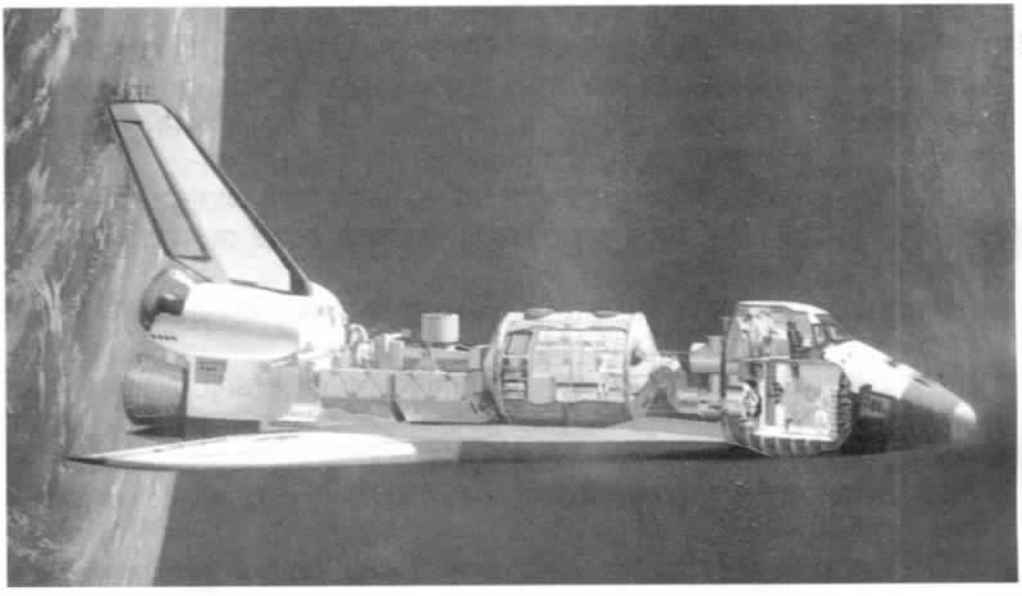

আকাশে উড়ার স্বপ্ন মানুষের বহু দিনের। অনন্ত নীল আকাশে ডানা মেলে পাখিকে উড়তে দেখে মানুষও চিরকাল স্বপ্ন দেখে এসেছে, একদিন ওই পাখির মতোই আকাশে উড়বে তারা। একদিন সে-স্বপ্ন সফল হল। আমেরিকার রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় নির্মাণ করলেন উড়োজাহাজ। আসল ডানা হল না বটে পাখির মতো, কিন্তু কলের ডানা করল এই অসাধ্য সাধন।

কিন্তু তারপর?

উড়োজাহাজ আর কত উপরেই বা উড়তে পারে! আকাশ তো নিঃসীম। মহাশূন্যের সীমাটাই বা কোথায়?

দিনের আলোয় দেখা দেয় সূর্য। তার তপ্ত কিরণে ঝলসে ওঠে পৃথিবী। আর রাতের আকাশে ওঠে চাঁদ, সুদূর মহাশূন্যের ওপার থেকে হাতছানি দেয় নক্ষত্র আর নীহারিকাপুঞ্জ।

কোথায়, কত দূরে ওদের বাস? আসলে কেমন তারা দেখতে? গ্যালিলিও-র দূরবীন দিয়ে তাদের আরো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তাতে আশা মিটল না। আকাশের ওপারে আকাশ আর অনন্ত মহাশূন্যের রহস্য জানতে হবে মানুষকে।

মহাশূন্যে সবচেয়ে কাছের হল চাঁদ, পৃথিবীর উপগ্রহ। সেখানে যাওয়ার চেষ্টাই করা যাক না প্রথমে। তদ্দিনে মানুষের জ্ঞান আর বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অনেক দূর। এবার নিঃসীম মহাশূন্যের দিকে হাত বাড়ালেও বাড়াতে পারে মানুষ। সেই হল মহাকাশবিজ্ঞানের শুরু।

উনিশ-শ উনসত্তর সালের ২১ জুলাই মনুষ্যবাহী প্রথম মহাশূন্যযান পৌছল চাঁদে। আমাদের ঘড়িতে তখন দুপুর বারোটা বেজে সতেরো মিনিট। আর চাঁদে তখন সূর্যোদয়ের ক্ষণ অতিক্রান্ত। দিগন্তের সমুদ্র থেকে ভেসে উঠছে রক্তিম সূর্য। প্রসন্ন আলোয় উদ্ভাসিত সকল দিগন্ত। চাঁদের বুকে প্রথম যে-মানুষটির পদচিহ্ন পড়ল, তাঁর নাম নীল আর্মস্ট্রং। তাঁর সঙ্গী ছিলেন মাইকেল কলিন্স এবং এডুইন ই অলড্রিন। তাঁরা যে-মহাশূন্যযানটিতে চড়ে চাঁদে পাড়ি দিয়েছিলেন, সেটির নাম এপোলো-১১।

মহাশূন্যযানের সাহায্যে চন্দ্রে প্রথম মানুষ অবতরণ করানোর কৃতিত্ব যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, মহাশূন্য-অভিযান শুরুর কৃতিত্ব কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের। ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর প্রথম মনুষ্যনির্মিত উপগ্রহ স্পুটনিক-১ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাশূন্য-অভিযান শুরু করে। এটির ওজন ছিল ১৮৪ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় দুই মণ দশ সেরের কাছাকাছি। পৃথিবীর চারদিকে একটি কক্ষপথে স্পুটনিক-১-কে স্থাপন করা হয়, আর ৯৬ মিনিটে একবার করে এটি প্রদক্ষিণ করতে থাকে পৃথিবীকে।

এর এক মাস পরই ৪ নভেম্বর দ্বিতীয় স্পুটনিক উঠল আকাশে। সঙ্গে কুকুর লাইকা। এটির ওজন ছিল প্রথমটির প্রায় ছ'গুণ অর্থাৎ ১১২০ পাউন্ড। মহাকাশের প্রথম যাত্রী কুকুরটি অবশ্য জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি পৃথিবীতে। কিন্তু এই অভিযান থেকে বিজ্ঞানীরা পেলেন বহু তথ্য আর ভবিষ্যতের মহাশূন্য যাত্রায় এসব তথ্যের গুরুত্ব হল অপরিসীম।

এসব কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছিল মহাশূন্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। স্পুটনিক-২ এর প্রায় তিন মাস পর ১৯৫৮ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রথম মার্কিন মহাশূন্যযান কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১-কে স্থাপন করা হল মহাশূন্যে। এর ওজন মাত্র দশ পাউন্ড।

এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা আলাদা আলাদাভাবে পর পর অনেকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করলেন মহাশূন্যে। অতঃপর ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি রাশিয়ার প্রথম 'লুনিক' চন্দ্র-অভিমুখে যাত্রা করে। দুঃখের বিষয়, তা চাঁদের প্রায় ৪,৬৬০ মাইল দূর দিয়ে চাঁদের এলাকা অতিক্রম করে যায় এবং শেষে একটি কক্ষে অধিষ্ঠিত হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে।

প্রথম লুনিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও বিজ্ঞানীরা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। একই বছর দ্বিতীয় 'লুনিক' চাঁদে গিয়ে পৌছায় ১৩ সেপ্টেম্বর।

এরপর গেল তৃতীয় 'লুনিক'। এটি তুলে পাঠাল চাঁদের যে-দিকটা আমরা দেখি না সেদিকের আলোকচিত্র। এগুলির সবই ছিল মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযান।

প্রথম মহাশূন্যে যাত্রা করেন যিনি, তাঁর নাম ইউরি গ্যাগারিন, একজন রুশ নাগরিক। সে দিনটি ছিল ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল। রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাকাশচারীর নাম মেজর হার্মান টিটভ।

প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী এলান শেপার্ড। ১৯৬১ সালের ৫ মে তিনি মহাশূন্যে যাত্রা করেন। দ্বিতীয় মার্কিন মহাকাশচারীর নাম ভার্জিল গ্রিসম। ১৯৬১ সালের ২১ জুলাই তিনি মহাশূন্যে যাত্রা করেছিলেন।

১৯৬৬ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত রাশিয়া পাঠাল মনুষ্যবিহীন চন্দ্রতরী লুনা-৯। পৃথিবীর কন্ট্রোল-স্টেশন থেকে নিয়ন্ত্রিত করে এটাকে নামানো হল চন্দ্রপৃষ্ঠে।

১৯৬৯ সালের ১৯ মে এপোলো-১০ আটদিনের সফরে প্রেরিত হয় মহাকাশে। এই মহাকাশযানের সাথে ছিল লুনার মডিউল বা চন্দ্রযান। এর পূর্বে ১৯৬৯ সালের ৩ মার্চ এপোলো-৯ অভিযানেও একই রূপ চন্দ্রযান পাঠানো হয়েছিল। এ-সব ছিল চাঁদে নামার প্রস্তুতি-পর্ব। চাঁদের কাছাকাছি চন্দ্রযানের পরিক্রমার উপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এই পর্যায়ে ব্যাপকভাবে তারই পরীক্ষা চালানো হয়। এপোলো-১০-এর তিনজন মহাকাশচারীর দু'জন টমাস স্ট্র্যাফোর্ড ও ইউজিন সারনেল, লুনার মডিউলটি নিয়ে দু'বার চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে চলে

গিয়েছিলেন। তারপর সাফল্যজনকভাবে তাঁরা আবার মূল নভোযানের সাথে সংলগ্ন হন। মূল এপোলো-যানটিতে ছিলেন জন ইয়ং।

এপোলো-১০ ছিল মানুষের চাঁদে নামার সর্বশেষ প্রস্তুতি।

এতক্ষণ কিন্তু আসল কথাই বলা হয়নি। তা হল পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব। সবসময় এ-দূরত্ব সমান নয়। তবুও গড় হিসাবে ধরা যায়—এ-দূরত্ব প্রায় ২,৩৯,০০০ মাইল। অবশ্যই উড়োজাহাজের পক্ষে এ-দূরত্ব অতিক্রম করা সহজ নয়। তাছাড়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির আকর্ষণ এড়িয়ে তার আওতার বাইরে যাওয়ার জন্য যে-গতিবেগ প্রয়োজন, উড়োজাহাজের তা নেই। তাই মহাকাশযানগুলি চালানো হয় অত্যন্ত শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে।

চাঁদ গোলাকার। এর ব্যাস ২১৬০ মাইল। আয়তন পৃথিবীর প্রায় ১/৫০ ভাগ এবং ওজন পৃথিবীর ১/৮২ ভাগ মাত্র। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের যে-আলো পড়ে চাঁদের গায়ে, তার শতকরা সাত ভাগ মাত্র প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। তাই চন্দ্রালোক এত স্নিগ্ধ, এত মনোরম।

এপোলো চন্দ্রযান ছিল চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের কাজ রকেটের সাহায্যে চন্দ্রযান মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা। এরপর সেটি মূল চন্দ্রযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দ্বিতীয় অংশের সাহায্যে চন্দ্রযানটি চাঁদে অবতরণ করে। তৃতীয় অংশের সাহায্যে সেটি আবার চাঁদ থেকে মহাশূন্যে এসে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই পর্যায়ে চন্দ্রযানের তিনটি অংশই হারিয়ে যায়, শুধু লুনার মডিউলটিই তার যাত্রীসহ পৃথিবীতে ফিরে আসে।

হিসাব করে দেখা গেছে, এক-একটি মহাশূন্য অভিযানে ব্যয় হয় প্রচুর অর্থ। এক্সপ্লোরার-১ নির্মাণে প্রতি কিলোগ্রামে খরচ হয়েছে ২০০,০০০ ডলারেরও বেশি। এরপর নিক্ষেপকারী রকেট পুনঃব্যবহার করে খরচ পড়েছে প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় ৪০,০০০ ডলার। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশি।

অতএব বিজ্ঞানীরা চাইলেন সম্পূর্ণ চন্দ্রযানটিকেই অক্ষত অবস্থায় আবার ফিরিয়ে আনতে। এ-কাজ সম্ভব হলে উড়োজাহাজের মতোই মহাশূন্য গবেষণার খরচ কমে আসবে। তখন প্রতি কিলোগ্রামে খরচ পড়বে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ ডলার। মহাশূন্য-বিজয়ের পথে শুরু হয়েছে মানুষের বিজয়-অভিযান। আর এই অভিযানের সাথে সাথে মহাবিশ্বের পরিচয় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে মানুষের কাছে। সেদিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

লুৎফর রহমান রিটন

খিদে

আবদুল হাই
করে খাই খাই
এক্ষুনি খেয়ে বলে
কিছু খাই নাই।

লাউ খায় শিম খায়
মুরগির ডিম খায়
কাঁচা পাকা কুল খায়
খেয়ে মাথা চুলকায়
ধুলো খায়
মুলো খায়
মুড়ি সবগুলো খায়
লতা খায় পাতা খায়
বাছে না সে, যা-তা খায়
থেকে থেকে খাবি খায়
কত হাবিজাবি খায়
সেদ্ধ ও ভাজি খায়
খেয়ে ডিগবাজি খায়
কলমের কালি খায়
বকুনি ও গালি খায়
থামে না সে, খালি খায়!

গরু খায় খাসি খায়
টাটকা ও বাসি খায়

আম খায়
জাম খায়
টিভি প্রোগ্রাম খায়।
খোলা মাঠে হাওয়া খায়
পুলিশের ধাওয়া খায়
ফুটবল কিক খায়
রক মিউজিক খায়
মিষ্টির হাঁড়ি খায়
জামদানি শাড়ি খায়
ভাত তরকারি খায়
টাকা কাঁড়ি কাঁড়ি খায়!

চকোলেট টফি খায়
শরবত কফি খায়
ঘটি খায় বাটি খায়
চিমটি ও চাঁটি খায়
হাসি খায় খুশি খায়
ভুসি খায়
ঘুসি খায়।

ট্যাংরা ও তিমি খায়
সফটড্রিংকস মিমি খায়
বেঞ্চি ও টুল খায়
বিরিয়ানি ফুল খায়
স্বর্ণের দুল খায়
খেয়ে ক্যাপসুল খায়।
গাড়ি খায়
বাড়ি খায়
পুলিশের ফাঁড়ি খায়।

গুঁতো খায়
জুতো খায়
সুই আর সুতো খায়।

তরতাজা হাতি খায়
শরীফের ছাতি খায়
মাঝে মাঝে লাথি খায়!

যা দেখে সে তাই খায়
অ্যাশট্রে ও ছাই খায়
খেতে খেতে খেতে খেতে
পেট হল ঢোল,
তবু তার মুখে সেই
পুরাতন বোল—
কী যে অসুবিধে
খালি পায় খিদে!

আবদুল হাই
করে খাই খাই
এক্ষুনি খেয়ে বলে
কিছু খাই নাই!

মমতাজউদ্‌দীন আহমদ

রবিনসন ক্রুশোর গল্প

সে অনেকদিনের আগের কথা—প্রায় তিনশ পঞ্চাশ বছর আগে আজকের লন্ডন শহর তখন এরকম ছিল না। তখন ট্রেন ছিল না, ইলেকট্রিক লাইন ছিল না, উড়োজাহাজ ছিল না। রেডিও-টেলিভিশনও তখন আবিষ্কার হয়নি। লন্ডন তখন খুব ছোট একটা সামান্য শহর। সেই লন্ডন থেকে বেশকিছু দূরে একটা ছোটখাটো গ্রামে রবিনসন ক্রুশোর জন্ম। তার বাবার নাম ছিল ক্রুশো আর মার নাম ছিল রবিন। সেই দুটো নাম মিলিয়ে ছেলের নাম হল রবিনসন ক্রুশো। সুন্দর দেখতে ছেলে; বড় বড় চটপটে দুরন্ত দুষ্টু-দুষ্টু চোখ—যেন ঘর ছেড়ে রবিন পাখি পালিয়ে যাবে নীল-নীল সাগরে। নাম-না-জানা দেশে-দেশে ঘুরবে—জাহাজে জাহাজে দিনরাত কাটাবে। বাবার অবস্থা বেশ ভালো—তিনি সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকেন কখন এ ছেলেও তাদের ছেড়ে চলে যায়—। কেননা রবিনসনের বড়ভাই যুদ্ধে মারা গেছে, মেজভাই গেছে কোথায় হারিয়ে। এখন ছোটছেলেও যদি চলে যায়—বুড়ো বাপ-মার দিনরাত তাই ভয়।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে একদিন ছেলে এসে বাবাকে মাকে বলল, সে সাগর পাড়ি দেবে। বাবা উঠলেন রেগে, মা পেলেন ভয়। কিন্তু রবিনসনের মনে ভয় নেই। ঘরের মায়ায় তার মন বসে না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ করে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, ওরা যাচ্ছিল জাহাজে করে লন্ডন। ক্রুশোও তারই সঙ্গে জাহাজে করে লন্ডনের দিকে পাড়ি দিল। মাঝখানে সে কী ঝড় আর বৃষ্টি। সাগরের

ঢেউ-এ গা বমি-বমি করে। রবিনসন মনে-মনে বলল, একবার ডাঙাতে নামতে পারলে আর কক্ষনো সমুদ্রের নাম মুখে আনবে না। কিন্তু ঝড় থামল। শান্ত হল বাতাস—আবার যেইকার সেই। সেই বন্ধুর বাবা জাহাজের ক্যাপ্টেন বললেন—কী হে বাড়ি ফিরে যাবে, না আবার জাহাজে উঠবে? ভয় পেয়েছ তো। রবিনসন ক্রুশো বলল—না, বাড়ি ফিরব না, তাহলে পাড়ার লোকে বলবে ভিতু। কেননা আমি-যে কাউকে না-বলেই পালিয়ে এসেছি। ক্যাপ্টেন বললেন, তোমার কপালে কষ্ট আছে দেখছি। কিন্তু লজ্জা ছেড়ে ফিরে গেলে ভালো করতে তুমি। ক্রুশো বলল—তবু আমি বাড়ি ফিরব না, সাগর দেখব, নাবিক হব।

এর পরেই আফ্রিকার যাবার এক জাহাজে উঠল কিশোর ক্রুশো। টুকিটাকি জিনিশপত্র বিক্রি করে ফিরে এল, ব্যবসাতে লাভও হল। এখন রীতিমতো নাবিক সে। এরপর আর-একবার জাহাজে করে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল। মাঝখানে সাগরদস্যুরা তাদের জাহাজ লুট করে নিল। সবাইকে করল বন্দি।

দু'বছর কেটে গেল, রবিনসন বুদ্ধি করে একটা নৌকাতে চড়ে পালিয়ে এল। নতুন এক দেশ, একেবারে ব্রাজিলে। সেখানে এসে ক্ষেতখামার করল। শস্যশ্যামলীতে তার জমি ভরে উঠল।

ক্রুশো এখন ছোটখাটো বড়লোক। কিন্তু তার ভাগ্যে ঘরে বসে থাকা লেখা নেই। একদিন স্পেনদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ী তার খামারে শস্য কিনতে এসে কথায় কথায় বলল—যাবেন কি সাগর পাড়িতে, ঘরে বসে কী আর বাণিজ্য করবেন।

যেই সাগরের নাম শোনা তার মন নেচে উঠল। ক্রুশো রাজি হয়ে গেল। ওরা এবার আফ্রিকায় যাবে। জাহাজ চলল নীল তরঙ্গ ভেঙে। কয়েকদিন পরে এল ঝড়। সে প্রবল প্রকাণ্ড! ভয়ঙ্কর ভীষণ দৈত্যের মতো, হাতির মতো, দানবের মতো; ঢেউ-এ আর ঢেউ-এ সব একাকার করে দেবে যেন। কূল নাই, কিনারা নাই। শেষে নৌকাতে নেমে গেল নাবিকরা। কিন্তু কোথায় যে গেল কে! কী হল সব নাবিকের। অজ্ঞান অচেতন ক্রুশো কোন-এক দেশের কোন-এক ডাঙায় এল, সে নিজেও জানতে পারল না। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখে কেউ নেই কোথাও। একদিকে বিশাল সাগর আর-একদিকে ডাঙা। রবিনসন একা, এক্কেবারে একাকী। সঙ্গী নেই, আশ্রয় নেই, খাবার পানি নেই। সে একা, একেবারে একা! সাগর আর জনহীন দ্বীপে একমাত্র একা। ক্লান্ত অবসন্ন সে। রাত কাটল একটা গাছের ডালে শুয়ে। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, দেখল তীরের কিছুদূরেই তাদের জাহাজটা অর্ধেক ডুবে আছে। সাগর তখন শান্ত সুবোধ বালক। সে শান্ত সাগর সাঁতরে জাহাজে এল—দেখল কেউ বেঁচে নেই, শুধু আছে একটা কুকুর আর দুটো বিড়াল। আর আছে বিস্কুট, বন্দুক, আর কিছু কাপড়চোপড়। আর একখণ্ড বাইবেল—যিশুর বাণী। জাহাজের ড্রয়ারে পেল সোনার অনেক অনেক টাকা। হায়রে টাকা! এই অচেনা অজানা দেশে কী হবে এই টাকা দিয়ে, কে টাকা নিয়ে তাকে জিনিশ দেবে।

এক এক করে সবকিছুই নিয়ে এল ক্রুশো। কুকুরটাও এল সাঁতরে। তারপর ক্রুশো কী করল! সে কী কষ্ট তার। কথাবলার লোক নেই, সঙ্গী নেই, মানুষ নেই, জন নেই। মানুষের ভিড়ে মাঝে-মাঝে আমরা মানুষ দেখে ভয় পাই—মানুষকে মনে হয় শত্রু, কিন্তু মানুষের চেয়ে বড় বন্ধু বড় সাথী কে আছে মানুষের। কথা না বললে চলে কী করে মানুষের। ক্রুশো তো আর বোবা নয়।

ক্রুশো কী আর করবে। তাকে কতদিন এখানে থাকতে হবে, কতদিনে সে ফিরে যাবে তার জন্মভূমিতে, তার তো ঠিক নেই। সে সেই দ্বীপে একটা পাহাড় কেটে-কেটে গুহার মতো করল। বড় বড় গাছ কাটল, গুহার মুখেই থাকবার সুন্দর বাড়ি করল—কাঠ, পালের ছেঁড়া কাপড় আর ঘাসপাতা কুড়িয়ে এনে। ক্রুশো কিন্তু একটা মজার কাজ করল—কাঠের লম্বা লম্বা খুঁটি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিল—। সে করত কী, প্রত্যেকদিন ঐ কাঠে একটা করে দাগ কেটে দিত—কতদিন সে এখানে থাকবে তারই হিশাব এটা। তাছাড়া ঐ দাগ দেখে সে দিনক্ষণ তারিখ ঠিক করতে পারবে। কিন্তু

ক্রুশো কি তখন জানত, কতদিন কত দীর্ঘদিন ওকে এখানে থাকতে হবে।

এদিকে তো সে খাবারদাবার যা পেয়েছিল জাহাজে, সব ফুরিয়ে গেল। তাকে বাঁচতে হবে। সে বন্দুক দিয়ে বড় বড় জংলি ছাগল শিকার করল। মাংস খেল আর পরবার জন্য সেই ছাগলের চামড়া দিয়ে জামা বানাল, প্যান্ট করল আর টাউস এক ছাতা বানাল রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য। একদিন ক্রুশো দ্বীপের বন থেকে একটা তোতাপাখি ধরে আনল দৌড়ঝাঁপ করে। তার ইচ্ছা পাখিকে কথা বলতে শেখাবে। সে পাখি নিয়েই তার ক'দিন চলে গেল।

ক্রুশো এখন ঘুরে-ঘুরে আশেপাশে সে-দ্বীপের চারদিকে দেখছে। এখানকার মাটি যেমন নরম তেমনি উর্বর। তার কাছে তো কিছু গম ছিল—সে করল কী, গমের চাষ করল। কী সুন্দর হল্ হল্ করে সবুজ শীষে শীষে ক্ষেত ভরে গেল—অনেক গম হল। ক্রুশো এখন এত গম কী করে ভাঙবে—জাঁতা কই, কল কই। কাঠ দিয়ে লোহা দিয়ে এক আশ্চর্য কল বানাল সে। গম গুঁড়ো করে আটা করল, নিজে নিজেই কেক বিস্কিট বানাল। নিজে খেয়ে নিজেই বুঝল খুব ভালো হয়েছে কেক বিস্কিট।

এ-দ্বীপও ফুলে-ফলে বেশ মনোহর। গাছে গাছে ফুল, ডালে ডালে অসংখ্য ফল। আর পাহাড় থেকে নেমে-আসা ঝিরঝির টলটলে ঝর্নার পানি। রং-বেরঙের প্রজাপতির ডানার মতো মনোহর এই দ্বীপ। কিন্তু ক্রুশো ছাড়া কোনো মানুষ নেই, কোনো জন নেই। যেন সে একাই প্রজা, একাই রাজা, একাই এর অধীশ্বর। ক্রুশোর এখন আর আগের মতো ভয় নেই শঙ্কা নেই—কতদিন তো হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে এক বছর, দু'বছর, দশ বছর, পনেরো বছর চলে গেল। হ্যাঁ, পনেরো বছর।

তোতার সঙ্গে কথা বলে, দ্বীপের হরিণকে কেক খাইয়ে, বনের ফুলের সৌরভ নিয়ে তার সময় কাটে। তবু ভুল করেও এল না কোনো জাহাজ, এল না কোনো নাবিক। কেউ আসে না ক্রুশোকে এই ভয়ঙ্কর নির্মানব দ্বীপ থেকে উদ্ধার করতে।

তবু ক্রুশো আশায় আশায় বুক বাঁধে। আসবে, নিশ্চয় আসবে একদিন কেউ-না-কেউ। ক্রুশো সাগরপাড়ের ঘর ছেড়ে যায় না কোথাও—সে হয়তো দ্বীপের মধ্যিখানে চলে যেতে পারত, কিন্তু সাগরের কূল ছাড়লে যে-বিপদ, যদি কখনো কোনোদিন মানুষের জাহাজ এ-পথে চলে যায়। এর মধ্যেই একবার ভূমিকম্প হয়ে তার ঘরদোর সব তছনছ হয়ে গেছে, ভীষণ ঝড় করে গেছে সব ভণ্ডুল। কিন্তু আবার সে সব ঠিকঠাক করেছে, একাই ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একবার তো জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে অধীর হয়েছে। জ্বরের প্রকম্পনে মার সেবার কথা মনে পড়েছে। ক্রুশো আবার সুস্থ হয়েছে।

একদিন ক্রুশো তার নিজের হাতে তৈরি-করা নৌকা দিল সাগরে ভাসিয়ে। ইচ্ছা, দূর থেকে দেখে আসবে যদি হঠাৎ কোনো জাহাজ যায় দৃষ্টির আড়াল দিয়ে। নৌকা চলল ভাসতে ভাসতে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই বুঝতে পারল, চারিদিকে শুধু নীল নীল পানি আর পানির প্রান্তর। সাগরের দুরন্ত স্রোতের মুখে তার নৌকা যদি একবার পড়ে, তবে এই অনন্ত সীমাহীন সাগরের বুকে সে কোথায়-না-কোথায় যাবে অদৃশ্য হয়ে। ক্রুশো তখন বুঝল ঐ দ্বীপই তার জন্য ভালো—যে তাকে এতদিন আদর করে সোহাগ ভরে আশ্রয় দিয়েছে। দিয়েছে বেঁচে থাকার অন্ন আর মায়ের মতো আশ্রয়। ক্রুশো অনেক কষ্টে নৌকা নিয়ে আবার তীরে ফিরে এল। সে এল তার পাতায়-ছাওয়া কাপড়ে-ঢাকা পাহাড়-কাটা গুহাগৃহে। তীরে নেমে শুনতে পেল কে যেন বলছে : রবিনসন ক্রুশো, তুমি কোথায় গিয়েছিলে, রবিসন ক্রুশো তুমি কোথায় গিয়েছিলে। স্তম্ভিত হতবাক ক্রুশো মানুষের কণ্ঠ শুনে অধীর হয়ে উঠল—ঘরে এল। দেখে কী, তার আদরের তোতা করুণার ঝর্নার মতো অবিকল মানুষের কণ্ঠে তাকে ডাকছে। ক্রুশোর দু-চোখ দিয়ে দরদর করে পানি ঝরতে লাগল।

সে তোতাকে হাতের পরশ বুলাল। মনে মনে বলল, তাইতো আমি তো খুব নিষ্ঠুর। এদের ছেড়ে কোথায় যাব আমি। তোতাপাখিকে বলল, কোথাও যাব না আমি।

একদিন ক্রুশো দেখল, দ্বীপের নরম মাটিতে বড় বড় পায়ের ছাপ। আশ্চর্য! এতদিন এতবছর পরে এখানে হঠাৎ করে মানুষ এল কোত্থেকে! নিজের পা সেই ছাপের মাঝখানে বসিয়ে দেখল সে কত ছোট। ভয়ে শিরশির করে উঠল ক্রুশো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল, সেই বন্দুকটা হাতে তুলে নিল। আস্তে আস্তে, দিন গিয়ে রাত এল—জেগে কাটাল রাত। না, কেউ এল না তার সঙ্গে লড়াই করতে। এমন করেই ক'দিন চলে গেল—কেউ তো এল না। তবু ক্রুশো সাবধানে থাকল।

একদিন পাহাড়ের মাথায় উঠে চারদিক ঘুরে-ঘুরে তাকাল। হঠাৎ সে দেখতে পেল ভয়ঙ্কর বড় বড় কতকগুলো মানুষ একটা মানুষকে হত্যা করল। তার কাঁচা মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেল ওরা। আর-একজন মানুষকে ওরা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ক্রুশো বুঝল এ-লোকটাকেও ওরা হত্যা করে ওর কাঁচা মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। এরা ক্যানিবাল—মানুষ-খেকো। ক্রুশো তখন বন্দুক নিশানা করে দ্রুম করে গুলি ছুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নরখাদকদের একজন মারা গেল। আর বাকি ক'জন এই হঠাৎ ভৌতিক আক্রমণে গেল পালিয়ে। তারপর ক্রুশো সেই বন্দিকে মুক্ত করল, সাথে করে নিয়ে এল। অযাচিত সাহায্য ও দয়ায় সেই মানুষটি রবিনসনের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকল। সেদিন ছিল শুক্রবার, ক্রুশো তাই তার নাম রাখল ফ্রাইডে।

যাহোক এতদিনে একজনকে পাওয়া গেল। ক্রুশো মানুষ দেখতে পেল এতদিন পরে। হোক সে জংলি মানুষ, তবু মানুষ তো। ক্রুশো ওকে পোশাক পরাল, ইংরেজিভাষা শেখাল, দুনিয়ার নানান কথা বলল, বাইবেল পড়ে শোনাল। ফ্রাইডে আস্তে-আস্তে সব শিখল, জানল। তার জানার কত আগ্রহ, কত অধীর পিপাসা। ঐ-যে আকাশের ঐ দূরে, পাহাড় মিশেছে আকাশে, সে জানত ঐ পাহাড়ের মাথায় ওদের দেবতা থাকে, জন্মমৃত্যু আর ভাগ্যের মালিক সে। এখন সে জানল তা নয়। অধীশ্বরকে দেখা যায় না, কিন্তু অধীশ্বর দেখেন সব—মন্দকে শাস্তি দেন তিনি, ভালোকে দেন

ভালোবাসা। তবে পৃথিবী থেকে এই মুহূর্তে সব মন্দজনকে সৃষ্টিকর্তা নিপাত করে দেন না কেন? ফ্রাইডের এই প্রশ্নে ক্রুশো প্রথমে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। পরে বলল, অধীশ্বরের ইচ্ছা যে তা নয়। কিন্তু ক্রুশো নিজেই বুঝল তার উত্তর সদুত্তর নয়।

ফ্রাইডের সঙ্গে কথা বলতে পেরে ক্রুশো যেন বেঁচে গেল। ওর কাছেই জানল এ-দ্বীপ ক্যারেবিয়ান সাগরের মাঝখানে। জানল সে আমেরিকার কোনো-একখানে আছে তাহলে। কলম্বাসের আবিষ্কারের আমেরিকা তো পৃথিবীর বাইরে নয় কোথাও। কিন্তু সে স্বদেশে ফিরে যাবে কী করে, আর কতকাল তাকে বন্দি থাকতে হবে এই নাম-না-জানা দ্বীপে।

অবশেষে একদিন। অনেকদিন পরে, এ দ্বীপে আসার আটাশ বছর পরে—একদিন ক্রুশো দেখল, কারা যেন নৌকা করে ডাঙার দিকে আসছে। আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ক্রুশো উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু সে চট করে ছুটে গেল না। পাহাড়ের মাথায় বসে মনে-মনে বলল, দেখিই না কিজন্য আসে ওরা। ওরা কারা? ক্রুশো পাহাড়ে বসে-বসে দেখল নৌকার নাবিকরা দু-তিনজন মানুষকে হাত-পা বেঁধে ডাঙায় ফেলে চলে যাচ্ছে। দু'জন ওদের পাহারা দিচ্ছে আর কয়েকজন দ্বীপের দিকেই আসছে। নাবিক ক্রুশো বুঝল, এ হল নাবিকে-নাবিকে বিবাদ আর ঝগড়ার ফল।

ঐ মানুষদের এই দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে বাদবাকি সবাই জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যাবে। এরা তখন নির্জন দ্বীপে সহায়সম্বলহীন ধুঁকে-ধুঁকে মরবে। ক্রুশো কিন্তু এ-সুযোগ ছাড়ল না। সে গিয়ে ঐসব বন্দি মানুষদের উদ্ধার করল, ক'জন নাবিক তার গুলিতে মারা গেল। বন্দিদের মধ্যে একজন ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন। ক্রুশোর সাহায্যে সে যেন নতুন জীবন ফিরে পেল।

তারপর সে আরো অনেক ঘটনা। ক্রুশো আর ফ্রাইডে আর ক্যাপ্টেন কেমন বুদ্ধি আর কৌশলে জাহাজের ছত্রিশজন নাবিককে পরাস্ত করল—কী করে জাহাজ উদ্ধার করল—বিদ্রোহী নাবিকরা অধীনতা স্বীকার করল—সে আরো অনেক লম্বা গল্প।

সেদিন ছিল ১৯ ডিসেম্বর ১৬৮৬ সাল। রবিনসন ক্রুশো জাহাজের ক্যাপ্টেনের পোশাক পরেছে, তার কাঁধে বসেছে তোতাপাখি, সঙ্গে আছে সহচর ফ্রাইডে, হাতে বন্দুক, মাথায় ছাতা। ওর কুকুরটা ও বিড়াল দুটো তো আগেই মারা গেছে। সে এ নাম-না-জানা দ্বীপের কূলে এসে দাঁড়াল। আজ তার বুক ফেটে কান্না আসছে, নতজানু হয়ে দ্বীপকে সে সালাম করল, কৃতজ্ঞতায় ব্যাকুল হল তার অন্তর। যে রবিনসন ক্রুশো নীল নীল সাগর দেখার জন্যে কাউকে কিছু না বলে একদিন বন্ধুর সঙ্গে জাহাজে করে লন্ডনে চলে এসেছিল, একবার আফ্রিকা যাওয়ার পথে দু-বছর বন্দি হয়েছিল, ব্রাজিলে গিয়ে ক্ষেত-খামার করেছিল, তারপর স্নেহভাজন নাবিকের সঙ্গে আবার সাগরের বুকে এসেছিল—সেই ক্রুশো আটাশ বছর দুই মাস উনিশ দিন এই দ্বীপে একাই একাকীত্বের সঙ্গে কাটিয়ে আজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। সেদিনের কুড়ি বছরের কিশোর ক্রুশো এখন পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়। ১৬৫১ সালের ১ সেপ্টেম্বর সে বাবা-মাকে না-বলে বাড়ি ছেড়েছিল, আর আজ ১৯ ডিসেম্বর, সে ফিরে যাচ্ছে।

ব্রাজিল থেকে যখন সে শেষবারের মতো জাহাজে উঠেছিল সেদিনও ছিল শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৬৫১ সাল। ১ সেপ্টেম্বরের যাত্রা তার জন্য বারবার বিপদ ডেকে এনেছে, কিন্তু পহেলা সেপ্টেম্বর এক আশ্চর্য রহস্যঘন জীবনের অভিজ্ঞতাও তাকে দিয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর তার নাবিকজীবনের রহস্যস্মৃতির দুর্লভ সম্পদ।

পঁয়ত্রিশ বছর পরে ক্রুশো আবার ফিরে এল তার গ্রামে। হায়রে! তখন আর কেউ বেঁচে নেই—বাবা মা কেউ নেই, অনেক আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। নতুনরা তো তাকে চিনতেই পারে না। ক্রুশোর জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হল।

এর পরেও সে আবার সাগরে গেছে। একবার তার সেই দ্বীপে ফিরে গিয়েছিল। এসেছিল বাংলাদেশে, গিয়েছিল রাশিয়ায়, মিশরে, মধ্যপ্রাচ্যে। শেষবয়সে সত্তরের বেশি বয়সে ক্রুশো তখন শেষযাত্রার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে-যাত্রা সাগর নয়, মহাসাগর। ওপারের ডাকের অপেক্ষা করছিল শান্ত স্থির প্রফুল্ল নির্মল চিত্তে বৃদ্ধ রবিনসন ক্রুশো। সে অনেকদিন আগের কথা, প্রায় তিনশ বছর আগের কথা।

রবিনসন কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ ছিল না। ক্রুশো হল এক রোমাঞ্চকর আশ্চর্য উপন্যাসের নায়ক মাত্র। দৈত্য নয়, দানব নয়, রাজার ছেলে নয়, মায়ার জাদুতে পাগল-করা মিথ্যা রূপকথার নায়ক নয় সে। সে সাধারণ। আমাদের মতোই সাধারণ ঘরে সাধারণ জনকোলাহলেরই একজন মানুষ। অথচ তার সাহস, অদম্য আগ্রহ, সীমাহীন ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস আর রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলময় জীবন আমাদেরকে বিস্মিত করে, বিমুগ্ধ করে—করে অনন্ত বিশাল জলধি আর নীল আকাশের রহস্যকে জয় করতে ব্যাকুল। মানুষের রাজ্যে মানুষ-যে কতবড় হতে পারে, সাধারণ যে কত অসাধারণ হতে পারে, এই হল রবিনসনের জীবন।

এ কাহিনী লিখেছেন ড্যানিয়েল ডিফো। সবটাই তিনি কল্পনা করেননি। আলেকজান্ডার সেলকার্ক নামে ইংরেজ নাবিক, যিনি চারবছর ধরে এরকমই এক নির্জন দ্বীপে কাটিয়েছিলেন—সঙ্গে ছিল তার পরনের একমাত্র পোশাক, বন্দুক আর একখণ্ড বাইবেল। ইংরেজকবি কুপারের সুন্দর কবিতা আছে এ নাবিকের হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে : যদি আমার পাখির ডানা থাকত আমি আবার ফিরে যেতাম বন্ধুর কাছে—এই নাবিকেরই নির্জন দ্বীপ ড্যানিয়েল ডিফোকে রবিনসনের কাহিনী লিখতে উৎসাহিত করেছিল।

ক্রুশোর মতো ডিফোর জীবনও রোমাঞ্চকর নয়। তিনশ বছর আগে ডিফো লন্ডনের এক কসাই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে পাদরি হবে। যেমন ক্রুশোর বাবা চেয়েছিলেন ছেলে উকিল হবে। কিন্তু ডিফো হল ব্যবসায়ী আর ক্রুশো হল ব্যবসায়ী নাবিক। সে-সময়ের ইউরোপে নাবিকের মোহ ধরেছিল যুবকদের। কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ম্যাগিলান হয়েছিলেন সমুদ্রের যাত্রী, দুঃসাহসী নাবিক। সে এক সমুদ্রজয় আর ব্যবসার জন্য নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের যুগ ছিল দুশো বছর ধরে সারা ইউরোপে।

ডিফো বই লিখেছেন অনেক। আড়াইশোর মতো। কিন্তু এক রবিনসন ক্রুশো তাঁর অমরগ্রন্থ হয়ে আছে। ষাট বছর বয়সে এই বই লিখেছেন ডিফো।

ডিফো জীবনে অনেক টাকা করেছিলেন—কিন্তু মজা হচ্ছে, তিনি তেরোবার বড়লোক হয়েছিলেন আর তেরোবারই গরিব হয়ে গিয়েছিলেন। ডিফো তখন ছোট ছোট পুস্তিকা লিখতেন, মেয়েদের জন্য কলেজ খোলার কথা চিন্তা করতেন, ব্যাংকের কথা বলতেন, পাকা সড়কের কথা বলতেন, অনাথদের জন্য এতিমখানার কথা বলতেন। কেউ ধার করলেই তাকে জেলে দিতে হবে, তিনি এ-নিয়মের বিরোধিতা করতেন। এসব আশ্চর্য উদ্ভট কথা বলে ইংল্যান্ডের রাজার অশান্তি করতেন বলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁর জরিমানা হল আর তাঁকে পিলোরিতে কাটাতে হবে তিনদিন। তারপর তাঁকে জেলে পাঠানো হবে।

পিলোরি মানে সাংঘাতিক ব্যাপার। খাঁচার মধ্যে অপরাধীকে বন্দি রেখে দেওয়া হবে আর আজেবাজে লোক তাঁকে পাথর ছুড়ে মারবে। অথচ ডিফোকে যখন পিলোরিতে বন্দি করা হল, কেউ কিন্তু পাথর ছুড়ল না। ফুলের পাপড়ি ছুড়ে সবাই তাকে অভিনন্দন জানাল। কেননা ডিফো তো মানুষেরই মঙ্গলের কথা বলতেন, কাগজে লিখতেন এবং চিন্তা করতেন। আজকাল রোববারে কাগজে যে পাঁচমিশেলি সাময়িকী প্রকাশ করা হয় ডিফোই এ-নিয়ম উদ্ভাবন করেন সবার আগে।

বড় দুঃখে অর্থকষ্ট পেয়ে মারা গেছেন ড্যানিয়েল ডিফো। তাঁরই বড়ছেলে তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করেছে এবং নিজের পিতামাতাকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিয়েছে। ১৭৩১-এ মারা গেছেন একাত্তর বছর বয়সে এক ভাড়াবাড়ির জীর্ণ শয্যায় হতভাগ্য লেখক ড্যানিয়েল ডিফো।

একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো'র মতো এমন বইও সে-সময় কোনো প্রকাশক ছাপতে চায়নি। শেষে টেলর নামে একজন যুবক প্রকাশক যখন সাহস করে রবিনসন ক্রুশো ছাপল তখন সাহিত্যের বাজারে হৈচৈ পড়ে গেল। চারমাসের মধ্যে চারটে সংস্করণ বিক্রি হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বহু ভাষাতে রবিনসন ক্রুশোর অনুবাদ হয়েছে। বাংলাভাষাতেই এই বই-এর ছোট বড় স্কুলপাঠ্য, কলেজপাঠ্য বহুরকম সংস্করণ আছে। বইটার লম্বা-লম্বা বাক্যরীতি আর সহজ-সরল শব্দে বর্ণিত চমৎকার প্রকৃতি, সাগর ও মানুষের হৃদয়ের বর্ণনা তাঁর সমকালীন লেখকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। রবিনসন ক্রুশো এবং সে বই-এর লেখক চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

আমাদের খিদে পায় কেন?

অনেকক্ষণ না-খেলেই আমাদের খিদে পায়। তখন আমাদের খাদ্যের দরকার হয়ে পড়ে এমন খাদ্যের যে-খাদ্য শরীরকে জোগাবে পুষ্টি আর শক্তি। কিন্তু খিদে পায় কীভাবে ও কেন?

আমাদের শরীরের নিজস্ব খিদে আছে। এই খিদে জন্মগত। খিদের অনুভূতি বা যে-শরীরের যে-অংশ খিদের অনুভূতির জন্যে দায়ী, সেই বিশেষ অংশের নাম হাউপোথ্যালামাস (Hypothalamus)। এখানে আছে ভোজন-কেন্দ্র যা খিদের অনুভূতি জাগায়। ভোজন-কেন্দ্রকে পরিচালনা করে হাইপোথ্যালামাসের আর-একটি অংশ যার নাম পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র (Satiety Centre)। পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র ভোজন-কেন্দ্রের কাজকর্ম দেখাশুনা করে, অর্থাৎ কখন খিদে পাওয়া দরকার, কতটা খাওয়া উচিত—এইসব তার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

শরীরে খাবারের ঘাটতি দেখা দিলে রক্তে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমে যায়। রক্তে শর্করা কম থাকলে পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র, ভোজন-কেন্দ্রের ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়। ভোজন-কেন্দ্রের উত্তেজনা বাড়ে, এর ফলে আমাদেরও খিদের অনুভূতি জাগে। খাবার পরে রক্তে শর্করা বেড়ে যায়। পাকস্থলীর মধ্যে খাবারের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমায় পৌছালে পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র, ভোজন-কেন্দ্রের ওপরে বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয়। ভোজন-কেন্দ্রের উত্তেজনা তখন কমে। আমাদের খিদেও তখন চলে যায়। ভোজন-কেন্দ্র থেকে নার্ভ দিয়ে খিদের খবর পৌছোয় লালা গ্রন্থি ও পাকস্থলীতে। ফলে, পাকস্থলীর পেশির সংকোচন বাড়ে। একে বলে ক্ষুধা সংকোচন (Hunger Contraction)। এই সময় লালাগ্রন্থি ও পাকস্থলীতে পাচক-রস বেশি করে বেরোয়।

খিদে পাওয়া আমাদের জন্মগত অনুভূতি। শিশু বা বোধবুদ্ধিহীন মানুষও খিদে পেলে কষ্ট পায়, কান্না শুরু করে।

আবার শরীরের চাহিদা ছাড়াও ভালো খাবার দেখলে বা তেমন গন্ধ নাকে এলে অনেক সময়ে খিদেটা চাড়া দিয়ে ওঠে।

আবার কেউ যদি রোজ একই সময়ে খাবার খান, তবে তাঁর ঐ সময়টাতেই খিদে পাবে।

টাকার কথা

মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন—যেমন চাল, ডাল, তেল, নুন, ওষুধ—সবকিছুই টাকা দিয়ে কিনতে হয়। থাকার জন্য বাড়িভাড়া, কোথাও যাওয়ার জন্য রেলের টিকিট, বাসের ভাড়া, সবকিছুর জন্যই চাই টাকা আর টাকা। অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যাকিছু প্রয়োজন, সবকিছুরই লেনদেন হচ্ছে টাকার মাধ্যমে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল টাকা খাওয়া যায় না, পরা যায় না, টাকা গেঁথে বাড়ি বানানো চলে না, টাকায় চড়ে কোনো জায়গায় যাওয়াও যায় না। তবু টাকা ছাড়া কোনো প্রয়োজনীয় জিনিশ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখা যাচ্ছে সমাজজীবনে টাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টাকার প্রচলন কেমন করে হল, টাকা কী, টাকার কাজ কী এবং কতটুকু তার ক্ষমতা—আধুনিক অর্থনীতিকে বুঝতে হলে তা জানতে হবে।

বিনিময় প্রথা

অন্যান্য জিনিশের মতো টাকাও সমাজে হঠাৎ করে চালু হয়নি। উৎপাদন ক্রমে বেড়েছে, উৎপাদনের কায়দা-কানুন ক্রমে উন্নত হয়েছে এবং মানুষ নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বাড়তি উৎপাদন করেছে। এই বাড়তি উৎপাদন এবং এর লেনদেন থেকেই কালক্রমে টাকার সৃষ্টি হয়েছে। আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময় শুরু হয়। এক

দলের বাড়তি বা উদ্বৃত্ত এবং আর-একদলের প্রয়োজন থেকেই বিনিময়-প্রথা সমাজে চালু হয়। প্রথমে বিনিময় হত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, পরে উৎপাদনের আরও উন্নতির সাথে-সাথে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পণ্যবিনিময় প্রচলিত হয়। সে-সময় জিনিশপত্র লেনদেনের জন্য কোনোপ্রকার মাধ্যমের প্রয়োজন হত না।

বিনিময়-প্রথার অসুবিধে

ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমে বেড়ে উঠতে শুরু করল। তার সাথে বিনিময়-প্রথায় নানা অসুবিধে দেখা দিতে শুরু করল। কেননা সে-সময় একজন কাপড়হীন চাষিকে এমন একজন তাঁতি খুঁজে বের করতে হত যার খাদ্যের প্রয়োজন এবং বাড়তি কাপড় আছে। কিন্তু এরকম মিল খুঁজে বের করা ছিল খুবই কঠিন। তাছাড়া একটি জিনিশের কতটুকুর পরিবর্তে অন্য জিনিশটি কতটুকু পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

বিনিময়-মাধ্যমের প্রচলন

এসব অসুবিধের জন্যেই ক্রমে বিনিময়-মাধ্যমের প্রচলন শুরু হয়। আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে গরু এবং শীতপ্রধান দেশগুলোতে ভেড়ার লোম সর্বপ্রথম বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গরু-ব্যবহারে অসুবিধে

কিন্তু তাতেও অসুবিধা দূর হল না। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য গরুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া ছিল খুবই কঠিন কাজ। তাছাড়া এতবড় গরু দিয়ে কোনো জিনিশই কম করে কেনা সম্ভব ছিল না। কেননা তাহলে গরুকে কেটে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিতে হয়। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল গরু যে-কোনো সময়েই মরে যেতে পারে। কিন্তু যে-কোনো জিনিশকে বিনিময়-মাধ্যম হতে হলে তার মধ্যে টেকসই বা স্থায়িত্বের গুণ থাকা দরকার।

বিভিন্ন জিনিশের ব্যবহার

তাই ক্রমে বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে কিছুটা টেকসই এবং সহজে ভাগ করা যায় এমন ধরনের বিভিন্ন জিনিশ ব্যবহৃত হতে থাকল। প্রাচীন ভারতে কড়ি, আফ্রিকায় সৈন্ধব লবণ, জাপানে চাল, চীনে চা-পাতা ও লবণ, রাশিয়ায় চামড়া, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে কফি ও বোর্নিও দ্বীপে মানুষের মাথার খুলি প্রভৃতি জিনিশ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ধাতুর প্রচলন

এরপর মানুষ যখন আরও সভ্য হয় তখন আদিমকালের এসব মুদ্রাকে সরিয়ে প্রথমে সোনা, তারপর তামা, রুপা, লোহা বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত এসব ধাতুকে আংটি, ছুরি, কোদাল প্রভৃতির আকার দিয়ে বিনিময়যোগ্য করা হত।

ধাতব-মুদ্রা

কিন্তু এসব জিনিশের ওজন নির্দিষ্ট ছিল না। তাই মূল্য ঠিক করার জন্য প্রতিবারই ওজন করতে হত। এ অসুবিধা থেকেই ধাতব-মুদ্রার প্রচলন হয়।

বাংলাদেশের প্রাচীন ধাতব-মুদ্রা

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ধাতব-মুদ্রা কখন চালু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে খ্রিস্টের জন্মের আগেই ধাতব-মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে জানা গেছে। রাজশাহী ও ঢাকা শহরের কাছাকাছি ঢালাই-করা ও পাঞ্চযন্ত্রের সাহায্যে ছাপাকাটা বেশকিছু রুপার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলো খ্রিস্টপূর্ব যুগের মুদ্রা।

উড়ন্ত টাকা

তারপর ধীরে ধীরে এসেছে কাগুজে টাকা। কাগুজে টাকার সর্বপ্রথম প্রচলন হয় খ্রিস্টের জন্মের কিছুদিন আগে চীনদেশে। এগুলোকে চীনে বলা হত উড়ন্ত টাকা।

বিভিন্ন দেশে টাকার বিভিন্ন নাম

এখন সবদেশের সরকারই নিজ নিজ দেশের অর্থনীতিকে চালু রাখার জন্য ধাতব-মুদ্রা ও কাগুজে নোট বাজারে ছাড়ে। তাই ভিন্ন-ভিন্ন দেশের টাকার নামও ভিন্ন-ভিন্ন হয়। যেমন : আমাদের দেশে টাকা, আমেরিকায় ডলার, ইংল্যান্ডে পাউন্ড-স্টার্লিং, জার্মানিতে মার্ক, জাপানে ইয়েন, ভারতে রুপি, ইতালিতে লিরা, রাশিয়ায় রুবল ইত্যাদি। লেনদেনের সুবিধার জন্য এগুলোকে আবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। আমাদের দেশে এক টাকাকে একশত পয়সায় ভাগ করা হয়েছে।

টাকা কী?

এসব টাকা ও মুদ্রাই আধুনিক যুগে প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে চালু রেখেছে। তাই অর্থনীতিকে বুঝতে হলে টাকা বলতে কী বুঝায় তা জানতে হবে।

টাকা হচ্ছে এমন একটা জিনিশ যা লোকের হাতে-হাতে জিনিশপত্র আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে অবাধে ঘোরাফেরা করে, যা দিয়ে চূড়ান্তভাবে ঋণ পরিশোধ করা যায় এবং যা দিয়ে কাজ বা ভোগের দাম আদায় করা হয়। অর্থাৎ টাকা হচ্ছে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি বিনিময়-মাধ্যম। কিন্তু আধুনিক যুগে টাকা কেবল বিনিময়-মাধ্যম নয়। বর্তমানে টাকা হচ্ছে এমন একটি পণ্য যা দিয়ে অন্যসব পণ্যের মূল্যকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যখন কোনো জিনিশের মূল্য টাকার অঙ্কে বলা হয় তখন সবাই তা স্বীকার করে নেয়। যদি বলা হয়, শাড়িটার দাম পঞ্চাশ টাকা তখন সহজেই সবাই শাড়িটার মূল্য কী তা বুঝতে পারে। এভাবেই টাকা সব জিনিশের মূল্য সবার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরে এবং আধুনিক সমাজে ব্যবসাবাণিজ্য ও উৎপাদন সম্ভব করে তোলে।

টাকার কাজ

বর্তমান যুগে টাকার মূল কাজ প্রধানত চারটি—মাধ্যম, মূল্য, ধারক আর ধারের মাপকাঠি।

টাকা-যে বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে কাজ করে তা আগেই বলা হয়েছে। টাকা দিয়ে পণ্যের মূল্য মাপা হয়। কেননা বাজারে পণ্যের মূল্য টাকায় প্রকাশ করা হয় এবং টাকা দিয়েই আমরা বাজার থেকে পণ্য কিনি। মূল্য জমা করে রাখা বা ধারকের কাজ করে টাকা। অনেক পণ্যই জমা করে রাখলে তা নষ্ট হয়ে গেলে পণ্যের আর-কোনো মূল্য থাকে না। কিন্তু পণ্যকে টাকায় বদল করলে তার মূল্য আর নষ্ট হয় না। তাছাড়া টাকা ধারে বেচাকেনার সুবিধা করে দেয়। টাকা দিয়ে পণ্যের মূল্য স্থির করে রাখলে যে-কোনো সময়ই তা পরিশোধ করা যেতে পারে।

পণ্য হিসেবে টাকা

কিন্তু টাকার কাজ সবসময় একরকম ছিল না। ১৮শ শতকে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ইত্যাদি আবিষ্কারের পর থেকে কলকারখানার যুগ শুরু হয়। এর আগে টাকা নিয়ে পণ্য বিক্রি করা হত আর-একটি পণ্য কেনার জন্য। তখন টাকা ছাড়াও যে-কোনো লোক চলতে পারত। কিন্তু কলকারখানার যুগে শুরু হল টাকা দিয়ে পণ্য কেনা এবং ঐ পণ্য বিক্রি করে আরও বেশি টাকা আয় করা। সমাজ তখন টাকা ছাড়া একেবারেই অচল হয়ে পড়ল। কলকারখানার যুগে পণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যায়। বণিকশ্রেণী এই পণ্য বিক্রি করে মুনাফার জন্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসাবাণিজ্য বহুগুণ বেড়ে যায়। ফলে ক্রমেই বেশি করে টাকার প্রয়োজন হয়।

টাকার শক্তি

বলা যায়, এ-সময় থেকেই টাকা সর্বশক্তিমান হয়ে উঠল। টাকা এমন এক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হল যা সকল পণ্যের মধ্যে সেরা এবং যার মধ্যে সকল পণ্যই লুকানো আছে। মনে হতে লাগল টাকা যেন জাদু জানে।

ব্যাংক

আধুনিক অর্থনীতিতে এত বেশি পরিমাণে টাকার দরকার যে তা আর মানুষের হাতে-হাতে বহন করা সম্ভব হয় না। সেজন্যই টাকা নিয়ে কারবার করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, যার নাম ব্যাংক।

ব্যাংক লোকের হাতে-হাতে জমানো টাকাকে একত্র করে এবং ঐ জমানো টাকাকে পুঁজি হিসেবে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছে এনে দেয়। জনসাধারণ ব্যাংকে তাদের জমানো টাকা রাখে এবং তার জন্য ব্যাংক থেকে সুদ পায়। আবার ব্যাংকই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দেয়। তারা ঐ টাকা খাটিয়ে মুনাফা করে এবং ব্যাংককে সুদ দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক হল ঋণ আদানপ্রদানের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান।

এখন সব দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থাকে। ঐ ব্যাংক হল দেশের মূল ব্যাংক। ঐ ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা বা ঐ-ধরনের কোনো মূল্যবান জিনিশ জমা রেখে বা দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের ভিতর কাগজের নোট ও ধাতব-মুদ্রা ছাড়ে। তাছাড়া দেশের মূল ব্যাংক হিসেবে এই ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক কীভাবে চলবে-না-চলবে তা ঠিক করে দেয়।

ব্যাংকই ঋণ দেয় বলে ব্যাংক একটি দেশের অর্থনীতিকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব কারখানা বা প্রতিষ্ঠান ঋণ নেয় তারা ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংক-মালিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

ব্যাংক কোটি-কোটি টাকার আদানপ্রদানের সুবিধে করে দেয়। এতে বেশি পরিমাণ টাকা বহন করার অসুবিধে দূর হয়েছে। ব্যাংকের চেক, ড্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে আজকাল কোটি-কোটি টাকা মানুষ আদানপ্রদান করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টাকাটা হাতে-হাতে ঘুরছে না, ঘুরছে শুধু হিসেবটা, টাকাটা ব্যাংকেই থেকে যাচ্ছে বা ব্যাংক শুধু টাকাটা যে আছে তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

'জ্ঞানের কথা' বই থেকে

ছবির ধাঁধা

নিচের ছবিতে ১৬টি বিড়াল পরপর সাজানো রয়েছে।
কোন দুটি বিড়াল একই রকম দেখতে। খুঁজে দেখো।

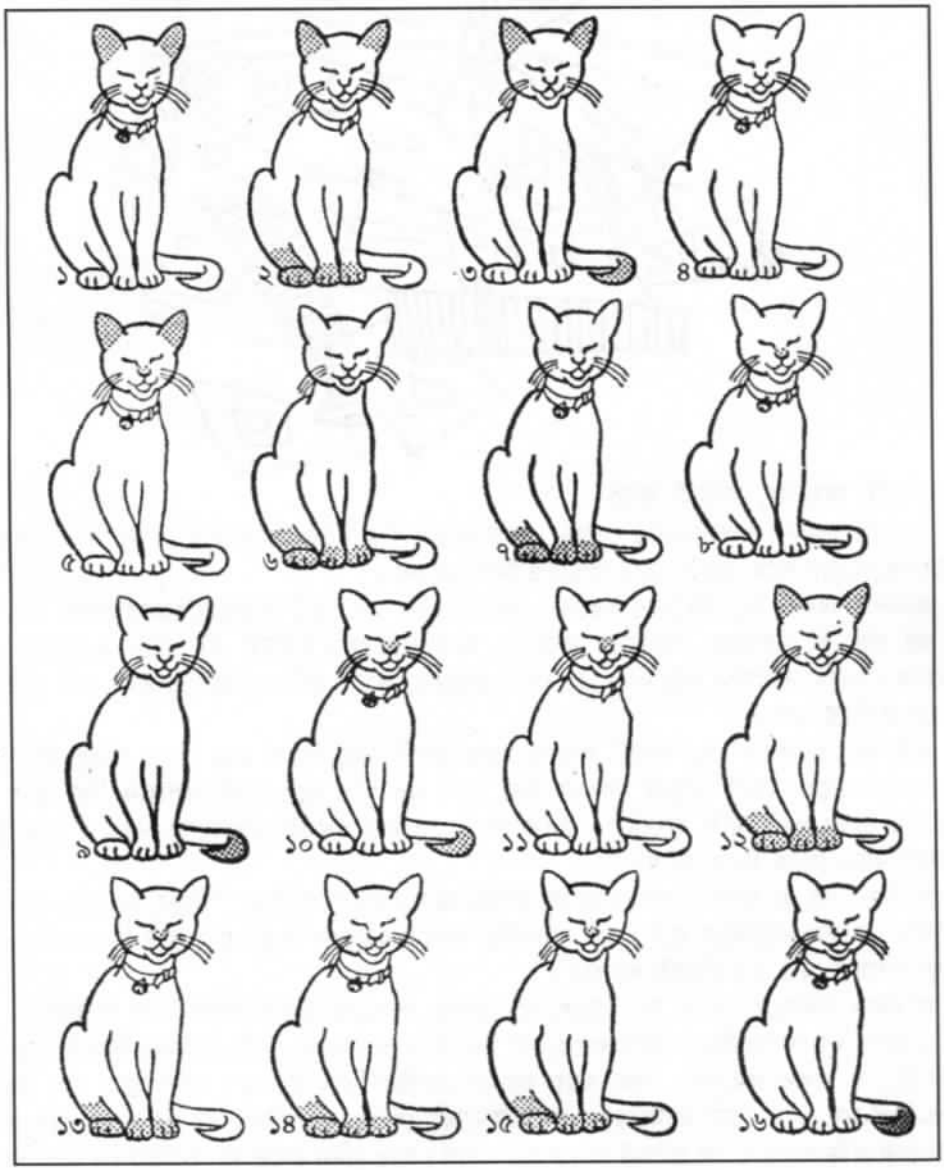

আ ফা ন থি' র গ ল্প

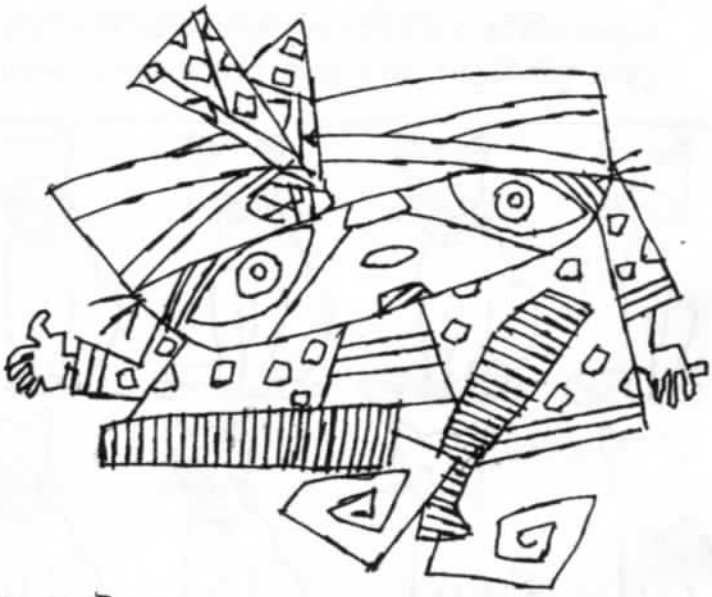

■ কড়াই জন্মায়, কড়াই মরে

আ ফান থি একদিন জমিদারবাড়ি গেলেন একটা কড়াই ধার নিতে। কাজ হয়ে গেলে ফেরত দেওয়ার সময় কড়াইটার সঙ্গে একটা ছোট কড়াইও নিয়ে এলেন।

জমিদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আ ফান থি, এই ছোট কড়াইটা কোথা থেকে এল?"

আ ফান থি বললেন, "হুজুরের কড়াইটা আমাদের বাড়ি গিয়েই এই ছোট কড়াইটার জন্ম দিয়েছে। আমি ভাবলাম বড় কড়াইটা যখন হুজুরের, তখন এটিও তাঁরই প্রাপ্য। তাই দুটিকেই একসঙ্গে নিয়ে এলাম।"

জমিদার জানতেন যে, কড়াই কখনো আর-একটি কড়াইয়ের জন্ম দিতে পারে না। কিন্তু নিখরচায় আরো একটি কড়াই পাওয়া গেল বলে খুব খুশি হয়ে তিনি বললেন "আ ফান থি, তোমার ওপর খুবই খুশি হয়েছি। এরপর থেকে তোমার যখনই কড়াইয়ের দরকার হবে, তুমি আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেয়ো।"

আটদিন পর আ ফান থি আবার জমিদারবাড়ি এসে হাজির, বললেন, "হুজুর, বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এসেছে। অনেক রান্নাবান্না হবে। তাই ভাবলাম, আবার হুজুরের কড়াই ধার করে নিয়ে যাই; এবার কিন্তু সবচেয়ে বড় কড়াইটারই দরকার।"

জমিদার গতবারের ঘটনা মনে রেখে, প্রসন্নচিত্তে, সবচেয়ে বড় কড়াইটা দিয়ে দিলেন।

তারপর দিনের পর দিন কাটতে থাকে, আ ফান থি'র আর দেখা নেই। জমিদার সবে ভাবছেন আ ফান থি-কে তলব করবেন, এমন সময় হঠাৎই একদিন তিনি হাজির। খালি হাত, চুল উস্কখুস্ক, দুঃখ-দুঃখ মুখ করে তিনি জমিদারকে বললেন, "কী যে দুঃখের ঘটনা, কী বলব! হুজুরের কড়াই আমাদের বাড়ি যাওয়ার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর দুদিন যেতে-না- যেতেই সে মরে গেল।"

"কী বললে?" জমিদার রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন। "লোহার কড়াই মরে গেল?"

তখন মুচকি হেসে আ ফান থি বললেন, "হুজুর, লোহার কড়াই যদি অন্য কড়াই জন্ম দিতে পারে, তাহলে মরতে পারবে নাই-বা কেন?"

■ উপদেশ

একদিন আ ফান থি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে কয়েকজন লোক ডেকে বলল, "আ ফান থি তুমি তো খুব জ্ঞানী। বলো তো, কোন বিষয়টি আমরা মনে রাখব, আর কোন বিষয়টি ভুলে যাব?"

আ ফান থি অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, "দ্যাখো, তোমরা যদি কোনো লোকের উপকার পাও তা মনে রাখবে, আর যদি কারো উপকার করো তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যাবে।"

■ পকেটের খিদে-তেষ্টা

আ ফান থি-কে এক বন্ধু দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। ভোজের দিন আ ফান থি হাজির হয়ে দেখেন, বাড়িভর্তি অতিথি আর টেবিলভর্তি সুস্বাদু সব খাবার। খাওয়াদাওয়া শুরু হওয়ার পর আ ফান থি দেখলেন, পাশের অতিথিটি নিজে তো খাচ্ছেনই, আবার সকলের অলক্ষ্যে কিছু খাবার পকেটেও ভরছেন। আ ফান থি কোনো কথা না বলে পুরো ব্যাপারটা দেখে গেলেন। পরে যখন খাওয়ার শেষে চায়ের সরঞ্জাম এল তখন তিনি তাড়াতাড়ি এক পট চা নিয়ে অতিথিটির পকেটে ঢেলে দিলেন।

অতিথিটি রেগে গিয়ে ভয়ানক চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। হইহট্টগোল শুনে সকলে অবাক হয়ে ওঁদের দেখতে লাগলেন। তখন আ ফান থি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললেন, "আপনার পকেটটা তো অনেক খেয়েছে, তাই ভাবলাম, এত খাওয়াদাওয়ার পর বেচারার নিশ্চয়ই তেষ্টাও খুব পেয়েছে। তাই একটু চা পান করতে দিলাম আর কী।"

■ ঐশ্বর্য, না ন্যায়

একদিন জমিদার আ ফান থি-কে বললেন, "আ ফান থি, তোমাকে যদি ঐশ্বর্য এবং ন্যায়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয়, তুমি কোনটি নেবে?"

আ ফান থি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "টাকাপয়সা নেব হুজুর।"

"সে কী আ ফান থি! আমি তো ন্যায় নেব। ঐশ্বর্য তো চাইলেই পাওয়া যায়, কিন্তু ন্যায় তো সহজে মেলে না", জমিদার বললেন।

"সেইজন্যই টাকাপয়সা বেছেছি হুজুর। মানুষ যা কম পায় তার প্রতি লোভ করে সে।"

মূল চীনা ভাষা থেকে অনুবাদ

সর্দি কাশি হয়েছে কি?

আচ্ছা, তোমার কি রোজ-রোজ সর্দি হয় আর মাঝে-মাঝে মাথাব্যথা করে? সর্দিতে কি পচা-পচা গন্ধ পাও? সেইসঙ্গে নাকটাও বন্ধ হয়ে গিয়ে নিশ্বাস নিতে কষ্ট থাকলে ভাবা যেতে পারে 'সাইনোসাইটিস' হয়েছে। 'সাইনোসাইটিস' মানে সাইনাসের প্রদাহ বা ইনফেকশন।

কিন্তু 'সাইনাস' কাকে বলে জানো কি? সাইনাসের বাংলা মানে হল গহ্বর। নাকের চারদিকে যে-হাড়গুলো আছে, যেমন কপাল,চোয়াল, এরা সবাই ফাঁপা। আর ওই ফাঁপা গহ্বরগুলোকেই বলা হয় 'সাইনাস'। সাইনাসগুলোর অবস্থান অনুসারে ওদের নানা রকম নামও আছে। যেমন কপালের হাড়ের মধ্যে যে-গহ্বর আছে তার নাম 'ফ্রনটাল সাইনাস'। চোয়ালের মধ্যে গহ্বরটির নাম 'ম্যাক্সিলারি সাইনাস'। এই প্রধান দুটি 'সাইনাস' ছাড়াও নাককে ঘিরে আরও কয়েকটি ছোট ছোট 'সাইনাস' থাকে—'এথময়েড সাইনাস' ও 'স্ফিনয়েড সাইনাস'।

নামগুলো কী কঠিন, তাই না! আসলে এইসব নাম তোমরা এর আগে কখনও শোনোনি তো, তাই এত কঠিন লাগছে। তোমাদের মধ্যে যারা বড় হয়ে ডাক্তারি পড়বে তাদেরও প্রথম-প্রথম এইরকম অনেক নাম উচ্চারণ করতে, কি মনে রাখতে দারুণ কষ্ট হবে। এক-এক সময় মনে হবে : দূর আর পড়ে দরকার নেই। ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু কদিন বাদেই দেখবে ওই বিদঘুটে নামগুলো কেমন যেন মুখস্থ হয়ে গেছে। তখন চেষ্টা করলেও আর তাদের ভুলতে পারবে না।

এথময়েড সাইনাসগুলো থাকে নাকের পাশের দেওয়াল আর চোখের মাঝের দিকে দেওয়ালের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গার মধ্যে। আর স্ফিনয়েড সাইনাস থাকে নাকের পিছনে, স্ফিনয়েড-অস্থির ভিতরে।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই সাইনাসগুলো হাওয়ায় ভর্তি থাকে। নিশ্চয় ভাবছ, হাড়ের মধ্যে আবার হাওয়া ঢুকবে কী করে। নাকের মধ্যে দিয়ে সর্বদাই হাওয়া চলাচল করছে। সেই হাওয়াই সাইনাসের মধ্যে ঢুকে ওদের হাওয়ায় পূর্ণ করেছে। হ্যাঁ, নাকের পাশের দেওয়ালে বেশ কয়েকটা ছোট-ছোট ছিদ্র থাকে। ওরা সবই ওই সাইনাসদেরই ছিদ্রপথ। আবার ওইসব ছিদ্রপথ দিয়ে যাতে সাইনাস-এর মধ্যে যখন-তখন যা-তা কিছু না-ঢুকে যেতে পারে তার জন্যে ওদের মুখের ওপরে ঢাকনারও ব্যবস্থা আছে, যাদের বলা হয় 'টারবিনেট' বা 'নাসা-উপাস্থি'। বড় হয়ে যারা 'এনাটমি' পড়বে তারা সবাই এইসব নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

নাক আর সাইনাসদের মধ্যে যাতায়াতের পথ থাকায়, নাক থেকে সাইনাসের মধ্যে যেমন হাওয়া প্রবেশ করতে পারে, তেমনি অনেক সময়েই আবার নাকের নানা রোগও সাইনাসদের আক্রমণ করতে পারে।

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তোমাদের বেশি ঠাণ্ডা লাগাতে দেখলে, পানি ঘাঁটতে দেখলে, কি ধুলোবালি ঘাঁটতে দেখলে, বড়রা কেন বকাঝকা করেন? তোমরা ছোট, তাই জানো না এইসব অসাবধানতা থেকে কত কি ঘটে যেতে পারে। ভাবো, মাথায় একটু ঠাণ্ডা লাগালে অথবা গায়ে গরম জামা না-রাখলে কী আর এমন হয়। একটু বেশিক্ষণ ধরে পুকুরে সাঁতার কাটলেই বা ক্ষতি কী।

এইসব অন্যায় করলেই প্রথমে নাকে সর্দি হবে, তারপর চিকিৎসা হতে একটু দেরি হইলেই 'সাইনোসাইটিস' হবে। অর্থাৎ নাকের ইনফেকশন তখন সাইনাসকেও আক্রমণ করবে। ফলে সাইনাসেও সর্দি জমবে। তোমরা তো জানোই, সর্দি হলে নাক কীরকম বন্ধ হয়ে যায়। নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই সাইনাসের ছিদ্রপথগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ একবার সাইনাসের মধ্যে সর্দির সৃষ্টি হলে তারা আর বাইরে আসতে পারবে না। আর তখন মাথা ভারী হবে, যন্ত্রণা করবে। ঠিক বুঝতে পারবে যে এবার মাথায় সর্দি বসেছে। মাথায় সর্দি বসা মানে কী বুঝতে পেরেছ তো? অর্থাৎ 'সাইনোসাইটিস' হয়েছে। সাইনাসে সর্দি জমা খুবই কষ্টের। কারণ তখন মাথাব্যথা করবে, চোখে ব্যথা হবে, লেখাপড়া করতে কষ্ট হবে, জ্বর হবে, গা-হাত-পা ব্যথা হবে।

মাথা তো অনেক কারণেই যন্ত্রণা করতে পারে। কথায় বলে : মাথা থাকলেই ব্যথা থাকবে। কিন্তু সাইনাসে সর্দি জমার জন্যে যে-ধরনের মাথাব্যথা হয় তা কিন্তু একদম অন্য রকমের। তার ধরন-ধারণ এমনই সঠিক যে একবার শুনলেই বুঝে ফেলা যায় এ-ব্যথা নিশ্চয় সাইনোসাইটিসের জন্যে। সাইনোসাইটিস আবার দু-রকমের হয়। এক, 'একিউট সাইনোসাইটিস' আর দুই, 'ক্রনিক সাইনোসাইটিস'। একিউট সাইনোসাইটিস মানে হঠাৎ সর্দি জমে যাওয়া আর ক্রনিক সাইনোসাইটিস মানে যাদের অনেকদিন ধরে জমে আছে। এখানেই জেনে রাখা ভালো যে, কোনো আকস্মিক বা হঠাৎ অসুখ করলেই তাকে 'একিউট' বলা হয়। আর 'ক্রনিক' মানে হচ্ছে পুরনো বা মেয়াদি রোগ।

নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে যে, কোন রকমের সাইনোসাইটিসে কী জাতীয় মাথা-যন্ত্রণা করে? একিউট সাইনোসাইটিস হলে ভোরের দিকে রোগীর মাথায় কোনো যন্ত্রণাই থাকবে না। কিন্তু সূর্য ওঠার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। ক্রনিক সাইনোসাইটিস হলে ঠিক এর উল্টো ঘটে। রোগী ঘুম থেকে উঠেই বলবে, 'ওরে বাপরে কী মাথাব্যথা করছে রে।' কিন্তু যেই বেলা বাড়তে শুরু করবে অমনি তার মাথা-যন্ত্রণাও কমে যাবে, বিকালের দিকে মনেই থাকবে না যে সকালে তার অত কষ্ট ছিল।

আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন মাথা-যন্ত্রণা হওয়া মানেই বুঝি সাইনোসাইটিস হওয়া-এ কিন্তু খুবই ভুল ধারণা। মাথা-যন্ত্রণা অনেক কারণেই হতে পারে। সাইনোসাইটিস তারই একটা কারণ মাত্র।

ভাবতে নিশ্চয় খুব মজা লাগছে যে, কারও মাথা-যন্ত্রণা হলেই এখন ঠিক বলে দিতে পারবে যে সেটা সাইনোসাইটিস-এর ব্যথা কিনা। কিন্তু না। অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো ও-রকমের যন্ত্রণা নাও হতে পারে। কারও-কারও আবার মাথা-যন্ত্রণার সঙ্গে অথবা শুধু চোখ, কান বা দাঁতের ব্যথা হতে পারে। কারণ নাককে ঘিরে যেমন সাইনাসেরা থাকে তেমনি সাইনাসদের ঘিরে আছে চোখ, কান আর দাঁত। তাই একের কষ্টে আর-একজনের কষ্ট হতেই পারে। শুধু যন্ত্রণাই-বা কেন সাইনাসের জন্যে, তাদের জন্যে অনেক রকমেরই অসুবিধে হতে পারে। যেমন ধরো চোখের দৃষ্টি কমে আসতে পারে, কানে পুঁজ হতে পারে, কমও শুনতে পারে, অকালে দাঁত নড়ে যেতে পারে। যারা আরও দীর্ঘদিন ধরে ভোগে তাদের ক্ষেত্রে সাইনাসের ইনফেকশন গলায় এবং ফুসফুসে পৌঁছে গিয়ে গলা-খুশখুশ, গলাধরা বা কাশিরও সৃষ্টি করতে পারে।

এখন বুঝতে পারছ তো সাইনোসাইটিস কী পাজি রোগ।

সাইনোসাইটিসের জন্যে কারও-কারও নাক থেকে রক্তও পড়ে। এমনকি ইনফেকশন মাথায় পৌঁছে গিয়ে 'মেনিনজাইটিস' কি 'ব্রেন অ্যাবসেসে'র মতো সব মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। দেখেছ তো, একটু ঠাণ্ডা-যন্ত্রণার কথা শুনলেই ডাক্তাররা কেন এক্সরে করে দেখে নেন সাইনোসাইটিস হল কিনা।

জানো তো, গ্রামের চেয়ে শহরেই বেশি সাইনোসাইটিস হয়। কারণ শহরের আবহাওয়া ধুলো-ধোঁয়া আর মানুষজনে ভর্তি। তার ওপর শহরে না আছে ফাঁকা মাঠ-ময়দান, না তেমন গাছপালা। গ্রামে যে সাইনোসাইটিস হয় তার কারণ সেখানে শহরের চেয়ে ঠাণ্ডা অনেক বেশি। আর সেখানকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরই গোসল করতে হয় পচা পুকুরে কি নদীতে। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করছ যে আজকাল সবাই কেমন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। সকলেই পথে-পথে গাছপালা রোপণ করে, আবহাওয়াকে ধুলো, ধোঁয়া, গ্যাস মুক্ত করে সুস্থভাবে বাঁচার চেষ্টা করছেন। এইভাবে সবাই মিলে চেষ্টা করে আমরা যদি সত্যিই কোনোদিন আমাদের পরিবেশকে শুদ্ধ করে তুলতে পারি তাহলে শুধু সাইনোসাইটিস কেন, আরও কত রকম রোগ কমে যেতে পারে।

অনেকেই ভাবে সাইনাস হলে বুঝি আর সারে না। এ কিন্তু একদমই ভুল ধারণা। একিউট সাইনোসাইটিস একটু চিকিৎসা করলেই সেরে যায়। ক্রনিক সাইনোসাইটিস হলে ডাক্তাররা যন্ত্রের সাহায্যে সাইনাস ধুয়ে সর্দি বার করে, তাকে ভালো করে তোলেন। কারও-কারও ক্ষেত্রে অপারেশনেরও প্রয়োজন হয়।

এবার জেনে গেলে তো, কী কী সাবধানতা নিলে সাইনোসাইটিসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর নিশ্চয় ভুল হবে না।

এতসব জানার পর নিশ্চয় মনে হচ্ছে, সাইনাসগুলো না-থাকলেই ভালো ছিল। তাহলে আর কোনোদিনই আমাদের কারও সাইনাস হত না। কিন্তু না, সাইনাস না-থাকলে আমাদের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। মাথার খুলিটা ফাঁপা না হয়ে যদি নিরেট হত তাহলে মাথাটা নিশ্চয় বেজায় ভারী হয়ে যেত। তখন সারাদিনই মাথা হেঁট করে বসে থাকত হত। মাথা তুলে ঘুরেফিরে বেড়ানো, খেলাধুলো করা, কিছুই সম্ভব হত না। এমনকি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' কি 'না' বলার জন্যেই একটা লোকের প্রয়োজন হত।

খুলিটা নিরেট হলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হত ব্রেনের। কারণ মাথায় তখন কোনো আঘাত লাগলেই সেটা সোজা ব্রেনে পৌঁছে যেত। আর ব্রেনই তো আমাদের শরীরের প্রধান পরিচালক। তাই ব্রেন আহত হলে কি আর আমরা কেউ বাঁচতে পারতাম?

ব্রেনকে ঘিরে থাকে একটা পানির আস্তরণ। আবার খুলিটা ঘিরে আছে হাওয়া-ভর্তি ফাঁকা গহ্বরেরা। ফলে বাইরের কোনো আঘাতকে ব্রেন স্পর্শ করতে হলে ফাঁকা গহ্বর, হাওয়া, জলের স্তর পেরিয়ে তবে তাকে স্পর্শ করতে হবে। দেখছ তো, ব্রেন যেহেতু শরীরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু তাই তাকে কত সাবধানে দেহের মধ্যে রাখা হয়েছে।

আ-এর বাড়াবাড়ি
আজব আমন্ত্রণ-লিপি

আমার আত্মার আত্মীয় আনন্দদা,

আরম্ভেই আমার আন্তরিক আশ্রদ্ধা-আদর আপনাতে আরোপিত। আজ আচমকা আপনার আগমনবার্তায় আমি আশান্বিত আর আনন্দে আপ্লুত। আশা, আমাদের আসরের আমন্ত্রণ-লিপি আপনার আয়ত্তে আসিয়াছে।

আসন্ন আনন্দময়ীর আগমনে আগামী আশ্বিনের আটাশে আমাদের আহূত আনুষ্ঠানিক আনন্দমেলার আকর্ষণীয় আসরে আত্মপর, আপামর আপনজনে আপনারা আমাদের আকুতি-সহ আমন্ত্রিত। আপনাদের আতিথ্য আর আপ্যায়নে আমাদের আসর আন্তরিক আগ্রহী।

আমি আজই আপনার আগমনবার্তা আমাদের আসরের আলোচনাসভায় আনিব। আপনি আটাশে আশ্বিনের আগেই আজিমগঞ্জ আপট্রেনে আসানসোলে আমাদের আসরের আপিসে আসিবেন। আমার আব্দার, আপনি আসার আগে আমার আকাঙ্ক্ষিত আলোকচিত্রটি আনিবেন।

আজ আর আগ-বাড়িব না। আগামীতে আপনি আমি আর আর আলোচনায় আসিব। আচ্ছা, আজ আপাতত আসিতেছি।

আপনার আশীর্বাদধন্য আর আদরণীয় 'আশিস'।

লাইব্রেরি গড়ে উঠল কেমন করে?

লাতিন শব্দ 'লিবের' (Liber) মানে হল বই, আর এই লিবের থেকে তৈরি হয়েছে 'লাইব্রেরি' শব্দ। আর জানোই তো, লাইব্রেরি হল এমন এক জায়গা যেখানে বইপত্র পাঠকের সুবিধার জন্য বিষয়-অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়।

আজ থেকে প্রায় চারহাজার বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে আসিরিয়া রাজ্যে লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিল। ঐসব অঞ্চলের লোক কাদামাটির ফলকে ধাতুর শিক দিয়ে লিখে সেগুলো পুড়িয়ে নিত। পোড়ামাটির এই বই তাদের মন্দির বা প্রাসাদ-সংলগ্ন লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হত।

এই সময়ের আরেক প্রসিদ্ধ লাইব্রেরি ছিল মিশরের নীলনদের মোহনায় অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। এখানে একশো কুড়িটি বিভাগে প্রায় সাতলক্ষ বই ছিল। সে বই হত মজার। যেরকম আমাদের তালপাতার পুঁথি বা ভুর্জপত্র, সেরকম এক পাতার নাম প্যাপিরাস (papyrus) যা এককালে লেখার জন্য ব্যবহার করা হত।

জনসাধারণের জন্য পাবলিক লাইব্রেরি সর্বপ্রথম দেখা দেয় রোম-নগরে। সে-সময়ে সেখানে ছিল আটাশটি সুবৃহৎ লাইব্রেরি, গড়ে উঠেছিল লোকদের সহযোগিতায়। তারপর খৃষ্টধর্মের প্রসারের সাথে-সাথে গির্জার প্রয়োজনে লাইব্রেরি তৈরি হতে থাকে। প্রায় একইসঙ্গে ক্রমশ উদ্ভূত ইউনিভার্সিটিগুলোর প্রয়োজনে লাইব্রেরির প্রসারলাভ ঘটতে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে বইপত্র শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। ভারতবর্ষে নালন্দা ও তক্ষশীলা নামে যে-দুটি বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাদেরও ছিল দুটি সুবৃহৎ লাইব্রেরি। সার টমাস বডলির (Sir Thomas Bodley, ১৫৪৫-১৬১৩) অর্থানুকূল্যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে গড়ে উঠল বিখ্যাত বডলেইয়ান লাইব্রেরি।

লাইব্রেরি আজকের দুনিয়ায় একনাগাড়ে গড়ে উঠছে—নানা ধরনের লাইব্রেরি, সাধারণ বা বিশেষজ্ঞদের জন্য। বড় বড় শহরে জনসাধারণের জন্য লাইব্রেরি গড়ে উঠছে। আর আছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও নানা সংস্থার লাইব্রেরি। ব্যক্তিগত সংগ্রহের লাইব্রেরি তো চিরকালীন।

পৃথিবীর অন্যতম সুবৃহৎ লাইব্রেরি হল লন্ডনে বৃটিশ মিউজিয়াম, ওয়াশিংটনে লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, রোমে ভ্যাটিকান লাইব্রেরি। এদের প্রত্যেকটিতে বহু লক্ষ বইয়ের সমাবেশ। বিশ্বের হেন বিষয় নেই যার বই এখানে পাওয়া যায় না।

প্যারোডি কী?

গুরুগম্ভীর কবিতার অনুকরণে রচিত ব্যঙ্গ-কবিতাকে বলে প্যারোডি কবিতা। ধরা যাক আমাদের ভাষার কোনো কবির একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। কবিতাটির ভাব খুব গভীর। এখন কোনো ব্যক্তি যদি সেই বিখ্যাত গভীর ভাববিশিষ্ট কবিতাটির ছন্দ ভাষাকে অনুকরণ করে হালকা বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক একটি কবিতা লিখে ফেলেন, তবে সেই কবিতাটিকে বলা হবে প্যারোডি কবিতা। প্যারোডি কবিতা কী তা বোঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ তুলে ধরলাম। তোমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত কবিতা ও গান 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' সবাই পড়েছ। কবিতাটির মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতাটিকেই প্যারোডি করে আর-একটি কবিতা লিখেছেন সতীশচন্দ্র ঘটক। এতে ছন্দ প্রায় মূল কবিতার মতোই, ভাষাতেও রয়েছে মূল কবিতারই অনুকরণ। কিন্তু মূল কবিতার গভীর ভাব এতে নেই। পরিবর্তে আছে হালকা ব্যঙ্গাত্মক বিষয়— কলকাতার এক অফিসের পিয়নের দুর্দশাপূর্ণ জীবনের কৌতুকপ্রদ চিত্র। এ-ধরনের কবিতা পড়তে খুবই মজা। তোমরাও পাশাপাশি কবিতাগুলি পড়লে এই মজা কমবেশি পাবে। প্যারোডি কবিতাটি পড়ার পর সেটিকে মূল কবিতার গানের সুরে গাওয়ার চেষ্টা করেই দ্যাখো না, কেমন লাগে!

মূল কবিতা—

আমার জন্মভূমি : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কোরাস—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্রসূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালোমেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে।

কোরাস—

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!

কোরাস—

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

কোরাস—

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওমা তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার, এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।

মূল কবিতার প্যারোডি

আমার কর্মভূমি : সতীশচন্দ্র ঘটক

ধনমান্য যশে গাঁথা আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক অফিস আছে, সব আপিসের সেরা
ও যে, ইটপাথরের তৈরি সেটি, রেলিং দিয়ে ঘেরা।

কোরাস—

এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল বুদ্ধি হানি করা আমার কর্মভূমি।

কেরানি দপ্তরি তারা, কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিষাদ জাগে এমন মলিন মুখে?
ও তার বেলের ডাকে আঁতকে উঠি গভীর মনের দুখে।

কোরাস—

এত রুক্ষ সাহেব কাহার, কোথায় এমন ভর্ৎসনাহার
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কটমটিয়ে থাকে?
এমন কানের উপর হাত খেলে যায় মৃদু মধু পাকে।

কোরাস—

ঘরে ঘরে এত বাবু, কলম পিষে দেহ কাবু,
এপেন্ট্রিস পড়ে তবু পালে পালে গিয়ে,
তারা টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে টেবিল মাথায় দিয়ে।

কোরাস—

কেরানিদের শীর্ণদেহ কোথায় এমন পাবে কেহ?
চাকরি মা তোর চরণদুটি নিত্য পূজা করি;
আমার এই আপিসের কর্ম যেন বজায় রেখে মরি।

আরব্য-রজনীর গল্প

আমি এক বাদশাহ—নাম কালান্দর ফকির। আমার বাবাও ছিলেন বাদশাহ। আমার বাবা কাসিব যখন মারা গেলেন আমি তখন সিংহাসনে বসি। আমার ন্যায়বিচারে প্রজারা খুব খুশি ছিল আমার ওপর।

ছোটবেলা থেকেই সমুদ্রযাত্রা আমার বড় প্রিয়। তার একটা কারণ বোধহয় আমার সলতানিয়তের প্রধান শহরটা ছিল সমুদ্রোপকূলবর্তী। বহুদূরব্যাপী সমুদ্রের মধ্যেকার দ্বীপগুলো ছিল আমার দখলে। দশখানা রণতরী সাজিয়ে মাসাধিককাল ধরে যাত্রা করতাম আমি। আমার অধিকৃত দ্বীপগুলো পরিদর্শনে যেতাম।

এইরকম একবার যাত্রাপথে দারুণ ঝড়ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাকে—সারাদিন সারারাত্রিব্যাপী।

রাত্রি অবসান হল। ঝড়ও থামল। আবার হাসি ঝলমল দিন উপচে পড়ল। কিন্তু আমি দেখলাম, একটি ছোট্ট দ্বীপের চড়ায় এসে আটকে গেছে আমার জাহাজগুলো।

সমুদ্র তখন শান্ত অবোধ শিশুর মতো। তার ঘন নীল জলে কাব্যের গন্ধ। কে বলবে গত রাত্রে সংহার-মূর্তি ধারণ করেছিল সে!

দিন-দুই সেই দ্বীপে একটু জিরিয়ে নিলাম। তারপর পাল তুলে পাড়ি দিতে থাকলাম। আবার কুড়িদিন কেটে গেল। তবু হারানো পথের নিশানা খুঁজে পেলাম না। তখন আমরা ভাসছি এক অজানা সমুদ্রে। দিশাহারা পাখির মতো। নীড়ের সন্ধান চাই।

কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম : আর কত দূর? কোথায় এলাম আমরা?

উত্তর পেলাম : জানি না, বলতে পারব না।

এ সমুদ্রপথ তার অচেনা। কখনও সে কোনোদিন আসেনি এই পথে।

উপায়ন্তর না-দেখে একজন ডুবুরিকে নামিয়ে দিলাম পানিতে। কিছুক্ষণ বাদে সে ফিরে এল। বলল, সমুদ্রের ওধারে বড় বড় মাছ দেখলাম অনেক। আরও দূরে দেখতে পেলাম একটা পাহাড়। তার খানিকটা অংশ শাদা আর খানিকটা কালো।

ডুবুরির কথায় ডুকরে কেঁদে উঠল কাপ্তেন : আর রক্ষা নাই। মৃত্যু অবধারিত। ডুবুরি যা দেখে এসেছে ওটা একটা মরণফাঁদ—চুম্বক-পাহাড়। পাহাড়টায় গায়ে গাঁথা আছে হাজার হাজার চুম্বক লোহার বর্শা। আমাদের জাহাজ যতই তার কাছে যেতে থাকবে সেই চুম্বকের প্রচণ্ড আকর্ষণ হিড়হিড় করে টেনে নেবে। আর পাহাড়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবে জাহাজগুলো। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে আমাদের। এখন আল্লাহর নাম জপ করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই, জাঁহাপনা। আগামীকালই আমরা পাহাড়ের দুর্বার আকর্ষণে প্রাণ হারাব। সবাইকেই মরতে হবে। কেউ বাঁচতে পারবে না। এ-পর্যন্ত যত নাবিক পথ হারিয়ে এই পাহাড়ের আকর্ষণ-আওতায় গিয়ে পড়েছিল তারা কেউই ফেরেনি। আমাদেরও আর ফেরা হবে না।

কাপ্তেনের দু'গাল বেয়ে বয়ে চলেছে পানির ধারা। অসহায় শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে। কাঁদতে কাঁদতেই আবার বলে : ঐ পাহাড়ের চূড়ায় একটা গম্বুজ আছে। দশটা পিতলের খুঁটির ওপরে সেই গম্বুজ। আর গম্বুজের ওপরে রয়েছে এক ঘোড়সওয়ার। ব্রোঞ্জের তৈরি। এক-হাতে ঢাল অন্য-হাতে তলোয়ার। দেহে বর্ম, মাথায় শিরস্ত্রাণ—রণসাজে সজ্জিত এক যোদ্ধা। সিসার ফলকে উৎকীর্ণ-করা এক দৈববাণী—আঁটা আছে তার বুকে। শুনুন শাহজাদা, লোকে বলে, ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যতদিন ঐ ঘোড়সওয়ার ঐভাবে অবস্থান করবে ততদিন কোনো জাহাজের নিস্তার নাই। আর আকর্ষণ-আওতার মধ্যে পড়েই প্রচণ্ড বেগে টেনে নিয়ে খানখান করে দেবে। এইভাবে কত-যে জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কত শতসহস্র নাবিক প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। ঐ ঘোড়সওয়ারকে ওখান থেকে ফেলে দিতে না-পারলে এমনি ধ্বংসের তাণ্ডব চলতেই থাকবে।

মৃত্যুর আশঙ্কায় কাপ্তেনের দেহে কাঁপুনি ধরে যায়। আমরাও সকলে ভয়ে আঁতকে হিম হয়ে যাই। মউত অনিবার্য। তার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া ভিন্ন পথ নাই। হায় আল্লাহ, কী এমন পাপ করেছিলাম, যার জন্যে বিদেশ-বিভূঁই-এ এইভাবে বেঘোরে জান কবুল করতে হচ্ছে।

পরদিন-প্রত্যুষে কাপ্তেন জানাল, সেই কোষ্ঠী-কালো চুম্বক-পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি আমরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জাহাজগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র নাম নাও সবাই।

প্রচণ্ড শব্দে জাহাজগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। উত্তাল ঢেউ-এর প্রলয়-নাচনের মধ্যে পড়ে কে যে কোথায় হারিয়ে গেলাম কিছুই ঠাওর করতে পারলাম না। কে মরল, আর কে বেঁচে থেকেও মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে লাগল তার কোনো হদিসই করতে পারলাম না।

সারাটা দিন অশান্ত ঢেউ-এর মুখে-মুখে ওঠানামা করতে-করতে নাম-না-জানা ঠিকানার উদ্দেশে ভেসে চলেছি—যারা বেঁচে আছি তখনও। সে কী দুর্যোগ সে কী নিদারুণ ঝড়ঝঞ্ঝা! এলোপাতাড়ি হাওয়ার দাপটে উত্তাল-তরঙ্গমালা ভেঙেচুরে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস-এ পরিণত হতে লাগল। আর কিছু মনে নাই। অজ্ঞান হয়ে গেছি।

রাখে আল্লাহ্ মারে কে? আল্লাহ্‌ই বাঁচালেন সে-যাত্রা। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি, সেই পাহাড়টার নিচের এক বালির চড়ায় আটকে আছি আমি। জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে মরিনি, হাঙর কুমিরেও খায়নি, আশ্চর্য! সবই আল্লাহ্‌র দোয়ায়।

উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, সামনেই একটা পথ সোজা ওঠে গেছে পাহাড়ের মাথায়। খোদা ভরসা করে ওপরে উঠতে লাগলাম।

আল্লাহর কী অপার মহিমা, আমি যখন সেই খাড়াই পথ বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে চলেছি তখন হঠাৎ হাওয়ার দিক পরিবর্তন হয়ে গেল এবং এই হাওয়ার আনুকূল্যে তরতর করে উঠে যেতে পারলাম ওপরে। বিপরীতমুখী হাওয়ার বেগ অগ্রাহ্য করে এ-পথ বেয়ে এক পাও এগুনো সম্ভব নয় কোনো মানুষের।

যাই হোক, উপরঅলার কৃপায় উপরে উঠে এসে সেই গম্বুজের নিচে এসে দাঁড়ালাম। আনন্দে আমার শরীর তখন কাঁপছে।

সারাদিনের শ্রান্তিতে অবশ অবসন্ন হয়ে এল শরীর। গম্বুজের নিচে—যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই—শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম, এক দূরাগত কণ্ঠের বাণী : শোনো কাসিবের পুত্র, ঘুম থেকে জেগে উঠে তোমার পায়ের ঠিক তলায় গর্ত খুঁড়ে দেখো, একখানা তীর আর ধনুক পাবে। এই তীরধনুকটা দৈবশক্তিসম্পন্ন। তারপর ঐ ধনুকে তীরটা জুড়ে গম্বুজের মাথার ওপরে ঐ ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দাও। তাহলে ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারটা সমুদ্রে পড়ে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দুনিয়ার মানুষ পরম উপকৃত হবে চিরকালের মতো। সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত থেকেও খসে পড়ে যাবে ধনুকটা। যে-গর্ত খুঁড়ে তুলেছিলে সেই গর্তে ধনুকটা রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিও। এর পর সামনে তাকালে দেখতে পাবে, সমুদ্রের পানি ফুলে উঠেছে। ফুলতে ফুলতে একসময় দেখবে, তোমার পায়ের তলার পাহাড়ের চূড়া-সমান হয়ে গেছে। এই সময় দেখবে, একটা ছোট্ট ডিঙিনৌকা বেয়ে আসছে একটা লোক তোমারই দিকে। কাছে এলে পরিষ্কার মনে হবে, সেই ঘোড়সওয়ার—অবিকল তার চেহারার সঙ্গে মিল আছে এই ডিঙির লোকটার। আসলে কিন্তু তা ঠিক না। নৌকোটা আরও কাছে এলে দেখবে, মরার মাথার খুলিতে ভর্তি নৌকোর পাটাতন। ভয় পেয়ো না। তোমাকে নিরাপদে সাগর পার করে দেবার জন্যেই সে আসবে। সেইরূপই নির্দেশ দেওয়া আছে তাকে। কিন্তু সাবধান, তার নৌকোয় উঠে ভুলেও কখনও আল্লাহর নাম মুখে এনো না। নৌকোয় উঠলে সে একটানা দশদিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তোমার দেশের চেনা শান্ত নিরাপদ সমুদ্র-এলাকায় পৌঁছে যাবে। সেখানে দেখবে সওদাগরের এক নৌকা। তারা তোমাকে তুলে নিয়ে তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আবারও বলছি, ভুলেও কখনও তাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে না।

ঘুম ভেঙে গেল। খোয়াব কেটে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের তলার মাটি খুঁড়ে পেলাম সেই ধনুক আর তীর। ধনুকে তীর জুড়ে ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে ছুড়লাম। প্রচণ্ড এক শব্দে নিচের সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেল মূর্তিটা। আর তৎক্ষণাৎ দেখলাম, সমুদ্র এক ভীষণ রূপ ধারণ করছে। টগবগ করে ফুটতে লাগল সমুদ্রের পানি। ফুঁসতে ফুঁসতে ফুলতে ফুলতে ক্রমশ পাহাড় সমান উঁচু হয়ে গেল। দেখলাম দূরে একখানা ছোট নৌকা বেয়ে নিয়ে আসছে একটি লোক। হুবহু যেমনটি দেখেছিলাম স্বপ্নে, সেইরকম সব ঘটে যেতে লাগল। নৌকোটা কাছে আসতে লোকটাকে দেখলাম, ঠিক ঐ ঘোড়সওয়ারের মতো। কিন্তু স্বপ্নে জেনেছিলাম, দেখতে একরকম হলেও ওরা এক না। আমার হাত থেকে ধনুকটা খসে পড়ে গেছে মাটিতে। ঐ গর্তটায় রেখে মাটি চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নৌকোটা ততক্ষণে আরও কাছে—একেবারে আমার সামনে এসে থেমে গেছে। দেখলাম, লোকটার এক-হাতে অনেকগুলো মড়ার মাথার খুলি। আর কী আশ্চর্য, যদিও নৌকো বাইরে, লোকটা কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ নয়। পিতলের তৈরি এক মানুষের মূর্তি। তার বুকে আঁটা এক সিসার ফলক। তাতে উৎকীর্ণ করে লেখা আছে এক দৈববাণী।

আমি কোনো কথা না বলে নৌকোয় উঠে বসলাম। সেই পিতলের মানুষটা বেয়ে চলল নৌকোটা। এক-দুই-তিন এইভাবে দশটা দিন কেটে গেল। অবশেষে দেখলাম, আমাদের দেশের চেনাজানা সমুদ্রে এসে পড়েছি। আনন্দে উল্লাসে আমি তখন আত্মহারা। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম : আল্লাহ তোমার মহিমা অপার। তোমার দোয়াতেই আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি, আজ আমার নিজের দেশের মুখ দেখতে পেয়েছি। তুমি সর্বশক্তিমান একমাত্র প্রভু। তোমাকে ছাড়া অন্যকোনো অলৌকিক শক্তিতে আমার আস্থা নাই। তুমিই একমাত্র পথ।

আমার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। দেখলাম, সেই পিতলের মূর্তিটা বাঁ-হাত দিয়ে তুলে সমুদ্রের জলে ছুড়ে দিল আমাকে। তারপর নৌকোটো নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল কোথায়!

আমি খুব ভালো সাঁতারু। সমুদ্রের নীল জলে গা ভাসিয়ে দিলাম। এইভাবে সারাটা দিল কেটে গেল। আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসতে লাগল। ভয় হল, এবার মৃত্যু অনিবার্য। আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে লাগলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় মসজিদ-চূড়ার মতো উঁচু উত্তাল ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে চলল আমাকে সমুদ্র-কূলের দিকে। তারপর একসময় অনুভব করলাম, আমাকে তীরে ছুড়ে দিয়ে ঢেউটা আবার সমুদ্রে ফিরে গেছে। বুঝলাম এও তাঁরই এক মহিমা।

সমুদ্রসৈকতে উঠে এসে জামাকাপড় খুলে শুকাতে দিয়ে বালির ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে শুকনো জামাকাপড়গুলো পরে সামনে চেয়ে দেখি, এক সবুজ শস্যক্ষেত্র। আনন্দে নেচে উঠল মন। এপাশ ওপাশ চক্কর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলাম। যেদিকে তাকাই শুধু পানি আর পানি। সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

একটা জায়গায় বসে পড়লাম। আমার অধম অদৃষ্টের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। নিজেকে এক হতভাগা বলে মনে হতে লাগল। একটা ভুলের জন্যে এত কষ্ট সহ্য করতে হল আমাকে। ঠিক

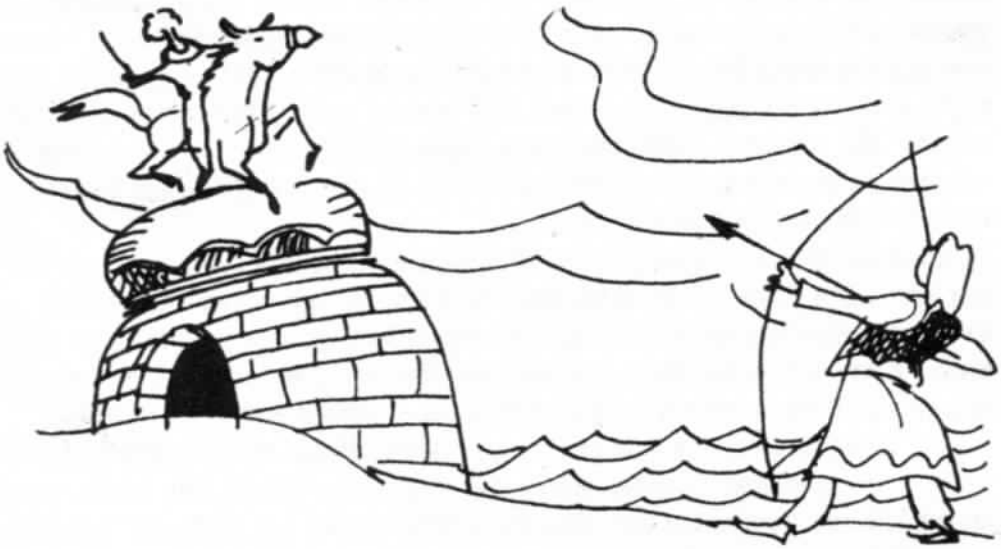

করলাম, এবার থেকে দেখেশুনে সাবধান চলতে হবে। অদৃষ্ট যখন সায় দিচ্ছে না-তখন যখন-তখন বিপদ-আপদ আসতে পারে।

এমন সময় নজরে এল, একখানা জাহাজ এই দিকেই আসছে। না-জানি আবার কোনো বিপদ হয়, এই ভেবে একটা গাছের উপর উঠে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিলাম পাতায় ঢেকে। জাহাজটা এসে নোঙর করল। জনাদশেক নফর নামল। সবার হাতে একখানা করে মাটিকাটা কোদাল। ওরা ঐ শস্যক্ষেত্রের একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। কী যেন একটা খুঁজতে লাগল। তারপর একটা জায়গায় মাটি কেটে গর্ত করতে থাকল। আমি গাছের ডালে বসে দেখলাম, খানিকটা গর্ত করার পর একটা গুপ্ত-দরজার সন্ধান পেল তারা। দরজার পাল্লা খুলে ফেলল। এরপর আবার তারা ফিরে গেল জাহাজে। নানারকম দামি দামি খাবারদাবার মাথায় নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল। গুপ্ত-দরজা দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে সামানগুলো রেখে আবার ফিরে গেল জাহাজে। আবার নিয়ে এল সাজপোশাক ইত্যাদি। এইভাবে নানারকম জিনিশপত্তর নামিয়ে রেখে এল মাটির নিচের সেই ঘরে। মোট কথা, একটা খানদানি পরিবারে যা-যা দরকার তার সবকিছুই ছিল তার মধ্যে। তারপর জাহাজ থেকে নেমে এল জরাবার্ধক্যে জীর্ণ এক থুরথুরে বৃদ্ধ—একটা ফুটফুটে কিশোরের হাত ধরে। পিছনে পিছনে নফরগুলো। তাদের হাতে মণিমুক্তাখচিত সূক্ষ্মকারুকার্য-করা বাদশাহি শাল। ওরা সবাই সেই গুপ্ত-দরজা দিয়ে নিচে নেমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে সেই ছোট্ট কিশোরবালকটি ছাড়া আর সবাই উঠে এসে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

জাহাজটা যখন অনেক দূরে চলে গেছে, গাছ থেকে নামলাম আমি। ঐ জায়গাটায় গিয়ে মাটিগুলো সরিয়ে গুপ্ত- দরজাটা খুলে ফেললাম। পাথরের তৈরি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম নিচে। এক সুরম্য অট্টালিকা। একটু এগুতেই চোখে পড়ল, দামি মখমলের পর্দা-দেওয়া একটা দরজা। পর্দা সরিয়ে ভিতরে পা রাখতে সাহস হল না। ঝকঝকে তকতকে আনকোরা বহু মূল্যবান পারস্য-গালিচায় প্রকাণ্ড ঘরটার পুরো মেঝেটা মোড়া। সুন্দর সুন্দর সোফা কোচ, টেবিল আলমারিতে চমৎকার সাজানো-গোছানো ঘরটা। মাথার উপরে কারুকার্যখচিত ঝাড়বাতি। টেবিলের উপর সাজানো সুন্দর কাজ-করা এক ফলের ঝাঁপি আর মিঠাই মণ্ডার রেকাবি। তার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক ফুলদানি, ওপাশে সোনার পালঙ্কে বসে সেই কিশোরবালক সোনার পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। আমাকে দেখা মাত্র ভয়ে আঁৎকে উঠল সে। আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম : কোনো ভয় নেই, বন্ধু। আমিও মানুষ—এক বাদশাহর ছেলে। এবং নিজেও আমি বাদশাহ, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। বরং তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করতেই এসেছি। ওরা তোমাকে এই পাতালপুরীতে রুদ্ধ করে হাওয়া হয়ে গেল। এখান থেকে কোনোভাবেই তুমি বেরিয়ে বাঁচতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে বাঁচাতে এলাম।

আমার কথা শুনে কিশোর একটু হাসল। কী সুন্দর তার ঠোঁটের হাসি। যেন মুক্তো ঝরে পড়ল। তার আয়ত চোখ, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট দেখে মনে হয়, এক খানদানি বংশের ছেলে সে। ইশারায় তার পাশে গিয়ে বসতে ডাকল আমাকে : শুনুন মালিক, ওরা আমাকে এখানে ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। আমার মৃত্যু তাদের আদৌ কাম্য নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই ওরা আমাকে লোকচক্ষুর আগোচর এই পাতালপুরীতে লুকিয়ে রেখে গেল।

তুমি হয়তো আমার বাবার নাম শুনে থাকবে। তামাম দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সেরা জহুরি আমার বাবা। তার মতো ধনীলোক বোধহয় খুব কমই আছে। দুনিয়ার এমন কোনো সুলতান বাদশাহ নাই যার কাছে আমার বাবা হীরে-জহরৎ বিক্রি করেনি। তার খ্যাতি নাম জগৎজোড়া। বাবার বৃদ্ধবয়সের সন্তান আমি।

আমার জন্মের সময় এক সিদ্ধবাক গণৎকার বলেছিলো, এই শিশু তার পিতামাতার জীবদ্দশাতেই মারা যাবে। এর বয়স যখন পনেরো হবে সেই সময় বাদশাহ কাসিবের পুত্রের হাতে এর মৃত্যু ঘটবে।

গণৎকার আরও বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। একসময় বাদশাহ কাসিবের পুত্র সমুদ্রযাত্রায় জাহাজডুবি হয়ে এক কষ্টিপাথর পাহাড়ে গিয়ে উঠবে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় এক পিতলের ঘোড়সওয়ারকে সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিয়ে চিরকালের মতো হাজার হাজার নাবিকের প্রাণ বাঁচবে।

আমরা বাবা এই পনেরো বছর ধরে আমাকে খুব সাবধানে চোখে-চোখে রেখে মানুষ করেছে। কয়েকদিন হল খবর ছড়িয়ে পড়েছে কাসিবের পুত্র সেই পাহাড়ে উঠে পিতলের ঘোড়সওয়ারটাকে পানিতে ফেলে দিয়েছে। এই খবর শোনার পর থেকে আমার মা-বাবার চোখে ঘুম নাই। এই কটা দিনের মধ্যে আমার বাবার শরীর বার্ধক্যে একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে চেনা যায় না, এমন। আমার মা কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণী শোনার পর থেকেই বাবার চিন্তা, কী করে আমাকে কাসিবের পুত্রের হাত থেকে রক্ষা করবে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে এই নির্জন দ্বীপে মাটির তলায় এই প্রাসাদপুরী বানিয়ে রেখেছে সে—পনেরো বছর বয়সের সময় যাতে সে লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে এনে আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারে। কাসিবের পুত্র সেই পিতলের ঘোড়সওয়ারকে পানিতে ফেলে দিয়েছে। তাই আজ আমাকে সে এখানে লুকিয়ে রেখে গেল। গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণীতে বলা হয়েছিল, ঘোড়সওয়ারকে পানিতে ফেলে দেবার চল্লিশ দিনের মধ্যে এই ঘটনা ঘটবে। তাই বাবা আমাকে চল্লিশদিনের জন্য এখানে লুকিয়ে রেখে গেল। বাবার এবং আমার নিজেরও বিশ্বাস, এই দুরধিগম্য পাতালপুরীর সন্ধান কিছুতেই পাবে না সে।

রাগে কাঁপতে লাগল আমার শরীর। কী মিথ্যেবাদী, ভণ্ড এইসব গণৎকারগুলো। নিরীহ মানুষের মনে এরা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। ওই ব্যাটাদেরই খুন করা দরকার। এমন সুন্দর ফুলের মতো এক কিশোর—নিষ্পাপ নির্মল—তাকে কিনা আমি হত্যা করব। গাঁজাখুরি বানানো একটা গপ্পো শুনিয়ে ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে এদের মনে। এই বালকের জীবন রক্ষার জন্যে, যদি প্রয়োজন হয়, আমার জীবনও তুচ্ছ করে দিতে পারি। শয়তান গণৎকারটাকে পেলে একবার শুনিয়ে দিতাম সে-কথা। গলা চড়িয়ে বেশ জোরেই বললাম : শোনো বাছা, উপরে আল্লাহ আছেন। তোমার মতো একটা ফুলের কুঁড়িকে ছিঁড়ে ফেলবে কেউ, তা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, সে যেই হোক, তোমাকে যে হত্যা করতে আসবে তাকে আমি হত্যা করব আগে। আমাকে না-মেরে তোমাকে ছুঁতে পারবে না কেউ। আমি তোমার পাহারায়, তোমার সঙ্গে বাস করব এই চল্লিশদিন। দেখি, কে তোমাকে মারে। তারপর চল্লিশদিন কেটে গেলে, তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে আমার দেশে যাব আমি। তুমি হবে আমার প্রাণের বন্ধু। তোমাকেই আমি বসিয়ে যাব আমার সিংহাসনে।

জহুরির ছেলে খুশি হল খুব। বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানাল আমাকে। আমার ওপর তার গভীর আস্থা লক্ষ্য করে আনন্দ হল মনে।

অনেক গল্প কাহিনী শোনালাম তাকে। সেও শোনাল। খুশিতে ভরে গেল আমাদের মন। নানারকম খানাপিনা করলাম। এত খাবারদাবারে ঘর ভর্তি যে, শ-খানেক লোক সারাবছর ধরে খেয়েও তা ফুরাতে পারবে না।

আমার ব্যবহারে মুগ্ধ হল কিশোর। তাকে-যে আমি গভীর ভালোবাসার চোখে দেখছি সে-কথা বুঝতে বেশি দেরি হল না তার।

সারারাত বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুল সে। আমিও সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে দু'জনে নাশতা করলাম। তারপর নানারকম মজার মজার কিসসা শোনালাম তাকে। খেলাধুলা করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপর সুগন্ধী আতর-দেওয়া পানির চৌবাচ্চায় অবগাহন করে গোসল করলাম আমরা। দুপুরের খানাপিনা সেরে একটু বিশ্রাম করে আবার শুরু হল আমাদের গল্প, খেলা।

রাত্রিবেলায় পরিপাটি করে বিছানা পেতে দিলাম তাকে। দু'জনে একসঙ্গে বসে মাংস রুটি, মাখন, ফল, দুধ, মধু, মিঠাইমণ্ডা দিয়ে রাতের আহার শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিনের পর দিন এইভাবে খেলাধুলা, হাসি-হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে যেতে লাগল। তার মা-বাবার অদর্শন, তার মরণভীতি, সব ভুলিয়ে দিলাম আমার বন্ধুসুলভ ব্যবহার দিয়ে, আমার আন্তরিকতা দিয়ে। এইভাবে কী করে-যে চল্লিশটা দিন কেটে গেল আমিও টের পাইনি, সেও বুঝতে পারেনি।

সেদিন সে ফিরে যাবে তার দেশে। তার বাবা আসবে তাকে নিয়ে যেতে। সকালে উঠেই এক হাঁড়ি গরম পানি বসালাম। গরম পানিতে ঠাণ্ডা পানি মিশিয়ে খুব আচ্ছা করে ঘসেমেজে গোসল করালাম তাকে নিজের হাতে। খুব ভালো করে দামি সাজপোশাকে সাজালাম। আতরের খুশবু ছড়িয়ে দিলাম তার গায়।

পালঙ্কের ওপর শুয়ে-শুয়ে সে ভাবছে, বাবা আসবে। সে চলে যাবে। আর আমি ভাবছি এ-কদিনের দোস্ত, আবার কোথায় হারিয়ে যাবে। মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়।

তন্ময় হয়ে কী ভাবছে দেখে আমি কথা বললাম : কিগো সাহেব, কী খাবে বলো?

ছেলেটা বলল, তরমুজ খাব।

একটা বড়সড় পাকা তরমুজ নিয়ে এলাম। পালঙ্কের ওপাশের দেওয়ালে টাঙানো ছিল একখানা ছুরি। তরমুজটা কাটব বলে ছুরিটা নামিয়ে আনার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম পালঙ্কের ওপর। কাঁটায় ঝোলানো ছুরিটা খুলে হাতে নিয়েছি এমন সময় ঘটল সেই কাণ্ডটা। ছেলেমানুষের খেয়াল-দুষ্টুমিতে ভরা মন। আমি যখন হাতের নাগালের খানিকটা ওপরে ঝুলানো সেই ছুরিটা হাতের মুঠোয় খুলে নেবার জন্য করসৎ করছি তখন তা দেখে হয়তো-বা শিশুসুলভ সারল্যে মজা অনুভব করেছিল ছেলেটা। আমার উঁচু-হয়ে-যাওয়া পায়ের গোড়ালিতে সুড়সুড়ি দিলে ঐ অবস্থায় আমার কী দশা হয় তাই দেখার মজায় পেয়ে বসেছিল তাকে। অতর্কিতে তার কাতুকুতুর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না আমি। চমকে উঠে পা-টা সরিয়ে নিতে গিয়েই শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না-পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম ছেলেটার ওপর। চিৎ হয়ে শুয়েছিল সে। আমার হাতে শাণিত ছোরা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল তার বুকে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়ে গেল আমারই হাতের উপর।

আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি। নিজের জামাকাপড় নিজেই ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে লাগলাম। কেঁদে গড়াগড়ি দিচ্ছি, হাত-পা ছুড়ছি, চোখের জলে বন্যা বয়ে চলেছে। হায় আল্লাহ এ কী হল। এ কী করলাম আমি। কী এমন পাপ আমি করেছিলাম, যার জন্যে এই শোক অনুতাপে পুড়তে হল আমাকে! না, একেই বলে নিয়তি! একটা দিন পরে হলেও গণৎকারের ভবিষ্যৎবাণীই তো সত্যি হল। আল্লাহ তুমি আমাকে শাস্তি দাও। আমি মাথা পেতে নেব। এ জীবন আমি আর রাখতে চাই না। আমাকে মৃত্যু দাও। আমি মরতে চাই।

ছেলেটার বাবা বৃদ্ধ জহুরি আসবে সন্ধ্যাবেলা। কী করে তার সামনে দাঁড়াব আমি। কী ভাষায় সান্ত্বনা দেব তাকে। না—না, আমি পারব না। পুত্রশোকের সেই নিদারুণ দৃশ্য আমি নিজের চোখে কিছুতেই দেখতে পারব না। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। গুপ্ত-দরজা বন্ধ করে মাটিচাপা দিয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিলাম।

মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, এখন কী করা যায়। কোনো জায়গায় লুকিয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে হবে। তা না হলে, ঐ নফরগুলো আমাকে দেখতে পেলেই খুন করে ফেলবে।

সেই গাছটায় উঠে গেলাম। একটা ডালে পাতার আড়াল করে বসে রইলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে সেই জাহাজটা এসে ভিড়ল। নেমে এল সেই দশজন নফর আর সেই বৃদ্ধ জহুরি। হনহন করে এগিয়ে এল আমার গাছের নিচে। গুপ্ত-দরজার জায়গাটায় চোখ পড়তে ভয়ে শিউরে উঠল তারা। এ কী, গর্তের মাটি তো মনে হচ্ছে সদ্য সরানো হয়েছিল! তবে? তবে কি বাছা আমার বেঁচে নাই! জহুরি চিৎকার করে ওঠে : তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছ? চটপট মাটি সরাও। দরজা খুলে নিচে যাও। নিয়ে এসো আমার জানের কলিজাকে।

নফরগুলো অনায়াসেই সদ্য-বুজানো মাটিগুলো সরিয়ে ফেলে নিচে নেমে গেল। গাছের উপরে বসে সব দেখতে লাগলাম আমি। ছেলের নাম ধরে তারস্বরে ডাকতে লাগল বৃদ্ধ। কিন্তু কে উত্তর দেবে? সে তো বেঁচে নাই। আমার হাতের ছুরি তার বুকে বিদ্ধ হয়ে গেছে। সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে সে। সে-ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না তার।

নফররা এসে বৃদ্ধকে নিচে নিয়ে গেল। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তার যে কী অবস্থা আমি গাছের ডালে বসেই তা অনুমান করতে পারলাম।

একটু পরে নফরগুলো ধরাধরি করে বৃদ্ধের অচৈতন্য দেহটা উপরে নিয়ে এসে গাছের তলায় শুইয়ে দিল। চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে দিতে জ্ঞান ফিরে এল তার। ছোটশিশুর মতো চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল। সে-দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি নিচে পড়ে যাব। এরপর নফরগুলো নিচে নেমে গিয়ে ছুরিবিদ্ধ কিশোরকে উপরে নিয়ে এল। পাশেই একটা জায়গায় কবর খোঁড়া হল। কবরের তলায় তার মৃতদেহটা শুইয়ে দিয়ে মাটিচাপা দিল তারা। তারপর পাতালপুরীর সামানপত্তর সব জাহাজে তুলে নিয়ে চলে গেল।

আমি গাছ থেকে নিচে নামলাম। সেই ছোট্ট দ্বীপটার চারদিকে চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে অনন্ত জলরাশি। যতদূর চোখ যায়, তীরের সন্ধান নাই। অথচ তীরের সন্ধান চাই। কেঁদে কেঁদে দিন কাটে। গাছের ফল খাই, গাছের তলায় শুই।

দেশে ফেরার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, এমন সময় একদিন দেখলাম সমুদ্র শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অবাক কাণ্ড! এমনও আবার হয় নাকি! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম, পানি সরে গিয়ে বালির চড়া পড়ে গেছে। যতদূর তাকাই শুধু ধু-ধু-করা বালি। হাঁটতে হাঁটতে দিন শেষ হয়ে এল। দেখলাম, শক্ত মাটির আসল তীরে পৌঁছে গেছি আমি। কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে এল তাঁর উদ্দেশে।

হাস্যকৌতুক

জবাব!

: দাদা, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে?

: বৃষ্টি তো বাইরেই হয়। আপনাদের পাড়ায় বৃষ্টি ঘরে হয় নাকি?

একটাই তো ডিম

বেয়ারা টেবিলে এসে জিগ্যেস করে, 'স্যার, আপনি যে একটা সিদ্ধ ডিমের অর্ডার দিয়েছেন, ওটা কেটে দু-টুকরো করব, না চার টুকরো?'

'দু-টুকরো খেলে বেশি খাওয়া হয়ে যাবে।'

আইফেল টাওয়ার

যদি প্রশ্ন করা হয় : পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার কোনটি? তাহলে সবাই একবাক্যে বলবে আইফেল টাওয়ার। বর্তমানে পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছে যারা আইফেল টাওয়ার-এর নাম জানে না। নিজের চোখে দেখে, ছবি দেখে-দেখে অনেকেই একে চিনেও ফেলেছে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এই টাওয়ারটি গত একশো বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন পর্যটকদের আকর্ষণ করে আসছে। শুধু বিরাটত্বের দিক থেকেই নয়, এর স্থাপত্যকৌশল ও সৌন্দর্যের জন্যও আইফেল টাওয়ার এত বিখ্যাত। টাওয়ারটির নির্মাতা গুস্তাভ আইফেল। তাঁর নামানুসারে এটির নামকরণ হয়েছে।

গুস্তাভ আইফেল পেশায় একজন প্রকৌশলী ছিলেন। ১৮৩২ সালে এক ধনী-পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর অন্যান্য কীর্তি—কম সময়ে কম খরচে রেলসেতু নির্মাণ, গগনচুম্বী দালান তৈরির ফলে বায়ুবেগের সাথে দালান-কোঠা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাধান তাকে প্রচুর খ্যাতি এনে দেয়। কিন্তু আইফেল টাওয়ারই তাঁকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে অধিষ্ঠিত করেছে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে প্যারিসে একটি বাণিজ্যমেলার প্রস্তাব করা হলে আইফেল জানালেন সেই মেলা উপলক্ষে তিনি একটি টাওয়ার তৈরি করবেন। টাওয়ারের পরিকল্পনাও তিনি তৈরি করে ফেললেন। তাঁর পরিকল্পনা দেখে অন্যরা ঘাবড়ে গেল। এত বিশাল টাওয়ার কি সত্যি সত্যি নির্মাণ সম্ভব হবে? আর যদি সম্ভব হয়ই এত টাকা আসবে কোত্থেকে? আইফেল সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, টাওয়ার নির্মাণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না।

কিন্তু সরকার পুরো খরচের মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ বহন করতে রাজি হলেন। বাকি টাকা পাওয়া যাবে কোত্থেকে? আইফেল ঝুঁকি নিলেন—তাঁর সমস্ত সহায়-সম্পদ বন্ধক দিয়ে বাকি টাকা

যোগাড় করলেন তিনি। সেই সময়ের হিশেবে আইফেল টাওয়ার তৈরির খরচ ধরা হয়েছিল ৫ লাখ পাউন্ড স্টার্লিং।

১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে টাওয়ার তৈরির কাজ শুরু হয়। আইফেলের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ৪০ জন প্রকৌশলী দু-বছর কাজ করে টাওয়ার তৈরি শেষ করেন। আড়াই একর জমি জুড়ে টাওয়ারটির ভিত্তি তৈরি হয়েছে। এর উচ্চতা ৯৪৮ ফুট (১০০ মিটার)। এতে ১৫,০০০ লৌহখণ্ডাংশ ব্যবহার করা হয়েছে যা বাঁধতে ২৫ লাখ রিভেট ব্যবহৃত হয়েছিল। অত্যন্ত আশ্চর্য হলেও সত্যি যে টাওয়ারটি তৈরির সময় সমস্ত ফ্রান্সে এ-ধরনের দৈত্যাকৃতি টাওয়ার তৈরির বিরোধিতা করা হয়েছিল। ৩০০ জন শিল্পী টাওয়ার-তৈরি বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে এক যুক্তিবিবৃতিতে স্বাক্ষরও করেছিলেন। আইফেল সেসব বিরোধিতার মুখে হতাশ বা উত্তেজিত না হয়ে শুধু বলতেন : 'শেষ হলে এরা টাওয়ারটিকে ঠিকই পছন্দ করে নেবে'।

১৮৮৯ সালের মার্চে টাওয়ারটির নির্মাণকাজ শেষ হয়। সে-বছর মে মাসে সর্বসাধারণের জন্য টাওয়ারটি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। প্রথম ৮ মাসে প্রায় ২০ লাখ লোক টাওয়ারটি পরিদর্শন করে। আজ এত সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ লোক টাওয়ারটি দেখতে আসে।

আইফেল টাওয়ারকে নিয়ে অনেক প্রবন্ধ, গল্প ও বই লেখা হয়েছে। এর অসংখ্য ছবিও বেরিয়েছে বাজারে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এর নাম। স্থাপত্যশিল্পের অসামান্য কীর্তি আইফেল টাওয়ারের নির্মাতা গুস্তাভ আইফেল ১৯২৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

'কীর্তি-মানের মৃত্যু নাই'—

প্যারিসের আইফেল টাওয়ারই তাঁকে চিরঞ্জীব করে রেখেছে।

সংগ্রহ : জহিরুল ইসলাম

মানুষের গরম সহ্য করার ক্ষমতা

খালিগায়ে বা পোশাক-পরা অবস্থায় একজন মানুষ কত গরম সহ্য করতে পারে তার রেকর্ডও রয়েছে। যেমন, মার্কিন দেশে ইউ. এস. এয়ারফোর্সের ব্যবস্থাপনায় ১৯৬০ সালে একজন নগ্নদেহে কতবেশি শুষ্ক বায়ুর তাপ (Dry-air temperature) সহ্য করতে পারে তার পরীক্ষা হয়েছিল; তাতে একজন ৪০০ ফারেনহাইট (২০৪.৪ সে.) পর্যন্ত সইতে পেরেছিল। তাছাড়া ভারী পোশাক পরে ৫০০ ফা. (২৬০ সে.) পর্যন্ত সহ্য করা যায়। গরম জলের 'সনা' (Sanna) চৌবাচ্চায় অনেকে ২৮৪ ফা. (১৪০ সে.) তাপেও দিব্যি আরামে স্নান করেন—এমন দেখা গেছে।

প্রবাদ আছে, জলচর স্যালাম্যান্ডারের আগুনে গা পোড়ে না। উত্তাপ সহ্য করতে পারা মানুষদের বলা যায় 'মানুষ স্যালাম্যান্ডার' (Salamander)!

আলী-ইমাম

পাখি দেখা

পাখি মানুষের কাছে পোষ মেনেছে আজ থেকে হাজার বছর আগে। জঙ্গি মোরগ কিংবা হাঁসকে মানুষ পোষ মানাতে শিখিয়েছে প্রথম। এদের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছে ডিম, মাংস।

আমরা জানি গাছ না-থাকলে পৃথিবীর সর্বনাশ হবে। পাখিরা পোকা না-খেয়ে ফেললে পোকারাই গাছ শেষ করে ফেলত। তখন গাছশূন্য পৃথিবীটা হয়ে যেত মানুষ বাসের অযোগ্য। তাই পাখিরা মানুষের অশেষ উপকার করছে এভাবে পোকা খেয়ে। হাজার রকমের পাখি গান গেয়ে মন খুশি রাখছে মানুষের।

পাখিরা প্রকৃতিতে পোকার ভারসাম্য ঠিক রাখছে। পোকার ডিম থেকে পূর্ণবয়স্ক পোকা পাখির খাদ্যতালিকার প্রধান উপাদান। জন্মের পর প্রথম কদিন পাখির ছানারা শুধু পোকা খেয়ে থাকে। নিজের ওজনেরও বেশি খাবার একদিনে তারা খেয়ে নেয়। বর্ষাকালে আমরা দেখি পানিতে বা ডাঙাতে যেমন পোকা, তেমনি পাখিরাও অগুনতি পোকা ধরে নিয়ে খাচ্ছে আর খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদের।

কিন্তু বর্তমানে যে-হারে পোকার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে পাখিরা নিঃসন্দেহে তার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। এ-কারণে এখন পোকা-মারার ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবু পাখিরাই-যে প্রকৃতিতে পোকার সংখ্যা কিছু কমিয়ে রাখে এ-কথা মানতেই হবে।

পাখি ফসল কিংবা ফল নষ্ট করে সত্যি কিন্তু তুলনামূলকভাবে ইঁদুর এবং পোকা ফসলের যতটা ক্ষতিসাধন করে, সেদিক থেকে বিচার করলে পাখির দিকের পাল্লা কম ভারী হবে। ইঁদুর ও পেঁচা বাজের প্রিয় খাবার। সে হিসেবে ইঁদুর খেয়ে ফসলকে রক্ষা করে একজাতের পাখি।

কোনো-কোনো পাখি ফুলের মধু খেতে গিয়ে রেণু মিলিয়ে দেয়। আবার একজাতের পাখি ফল খেয়ে তার বীজ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দেয়। উদ্ভিদের বংশবিস্তারে সাহায্য করে পাখি।

সেই আদিকাল থেকেই মানুষের পাশাপাশি বাস করে আসছে পাখি। সকাল বিকেল সন্ধ্যে সবসময় ডেকে মুখরিত করছে চারপাশ। বনে-বাদাড়ে, পাহাড়-পর্বতে, জলাশয়ে, নির্জনে-লোকালয়ে সব জায়গাতেই আছে পাখি—বিভিন্ন আকারের, বিচিত্র বর্ণের। তাদের রং আর ডাক মানুষের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। আর এই কৌতূহল থেকেই মানুষের পাখি-দেখার ইচ্ছে হয়। পাখিকে পর্যবেক্ষণ করে মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এই পাখি-দেখার ইচ্ছে বা শখ মানুষের মনে কবে জন্মেছে তার সঠিক ইতিহাস নেই। তবে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই পাখির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তার বহু প্রমাণ আছে।

সংস্কৃতকাব্যের জন্মলগ্ন থেকে পাখি-পর্যবেক্ষণের একটি ধারা এদেশে দেখা যায়। কবি বাল্মীকির মুখ থেকে যে আদি শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছিল তার মূলে ছিল একটি চকাচকি হাঁসের বিরহ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীকালে কালিদাস ও বাণভট্টও যে কৌতূহলী পাখি-প্রেমিক এবং পর্যবেক্ষক ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের বিভিন্ন রচনাতে।

কালিদাস তাঁর রচনায় নিখুঁতভাবে পাখির আকার, আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। 'মেঘদূত,' 'ঋতু সংহার' প্রভৃতি কাব্যের শ্লোকে-শ্লোকে ছড়িয়ে আছে দেশান্তরী চাতক, বলাকা, ময়ূর, শালিক, কাক, পায়রা, নীলকণ্ঠ, বালিহাঁস, সারস, কোকিলের কথা। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পাখির আচার-আচরণ তিনি সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং নিখুঁতভাবে লিখেছেন। ময়ূরের চোখের রং বাদামি। চোখের চারপাশে থাকে একটি শাদা রঙের বৃত্ত। এটির উল্লেখ কালিদাসের সযত্ন পাখি-পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি।

কালিদাসের পরেই উল্লেখযোগ্য হলেন বাণভট্ট। তাঁর 'কাদম্বরী'তে পম্পা-সরোবরের পাশের একটি বনের বর্ণনা আছে। ঐ বনে বাস করত বিভিন্ন ধরনের পাখি। একদিন এক শিকারি আসে। তার অত্যাচারে পাখিরা অতিষ্ঠ হয়। গৃহহারা হয় পাখিরা।

এগুলোর বর্ণনায় যে-চিত্রময় রূপ ফুটে উঠেছে বাণভট্টের ভাষায়, তা অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি না-থাকলে সম্ভব হত না। প্রতিটি পাখির আকৃতি ও প্রকৃতি তিনি যত্নের সাথে লক্ষ্য করেছেন। মন দিয়ে দেখেছেন পাখিদের বাসার বৈশিষ্ট্য।

শুধু সংস্কৃতকাব্যেই নয়, বুদ্ধ জাতকের গল্পে এবং হিতোপদেশে ও পঞ্চতন্ত্রে প্রাচীন বাংলার পাখিরা আছে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে। টিয়ে, কাক, ঘুঘু, পেঁচা, রাজশকুন, তিতির প্রভৃতি অসংখ্য পাখির উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি একজায়গায় উল্লেখ করেছেন, সেকালে এ-দেশের টিয়ে এবং ময়ূরের বিশেষ চাহিদা ছিল রোমের অভিজাত পরিবারগুলোতে। সম্রাট ক্লডিয়াস একবার এ-দেশ থেকে বহু টাকা খরচ করে একটি পাখি নিয়ে যান। পাখিটি ছিল বিচিত্র বর্ণের।

পাখি-দেখার কৌতূহল মেটাতে হলে বেরিয়ে পড়তে হবে ঘর থেকে। পাখি-দেখার সময় হিসেবে শরৎ, শীত, বসন্ত ঋতুই উপযুক্ত সময়। বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে, খাল-বিলে, নদী-নালাতে অসংখ্য পাখি দেখতে পাওয়া যায় এ-সময়। দেশান্তরী পাখিরা এসে ভিড় জমায়। এমনকি শহরের ভেতরেও এই সময় অনেক পাখিকে আসতে দেখা যায়। অনেক পরিব্রাজনকারী পাখিরা তাদের বৈচিত্র্য মেলে ধরে।

যারা পাখি পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী তাদের কাছে এ-সময়টা বেশ উপযোগী। আর এই পর্যবেক্ষণে প্রাথমিকভাবে কিছু শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে। পাখি চেনার ব্যাপারে ঠিকমতো লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, কী কী বৈশিষ্ট্য আছে পাখিটির। যেমন, হয়তো একটি পাখি দেখা গেল। প্রথমেই নজর রাখতে হবে পাখিটির রং কেমন। লেজের ও পায়ের গঠন কী। পায়ের ও চোখের রং কেমন। ঝুঁটি আছে কিনা মাথায়, সবই খেয়াল রাখতে হবে।

অবশ্য এমন অনেক চঞ্চল পাখি আছে যাদেরকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব নয়। কাজেই প্রথমেই একসঙ্গে সবকিছু না-দেখে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দরকার। একটি পাখি দেখার সময় অন্য একটি তুলনামূলক পাখির সাথে মিলিয়ে মনে রাখলে সুবিধে হবে। আর অনেক সময় স্মরণশক্তি হয়তো কাজ না-ও করতে পারে। তাই দেখার সাথে সাথে খাতায় লিখে রাখা ভালো।

পাখির ডাক শুনে পাখি পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে তার ডাকটি লিখে রাখা একটু কষ্টকর। পাখি দেখার সময় আরো লক্ষ্য রাখতে হবে পাখিটি কোথায় কখন কীভাবে দেখা গেল। কীভাবে বসেছিল এবং কোথায়। চলার সময় হেঁটে না লাফিয়ে চলে। কীভাবে আহার করে। উড়ে চলে কীভাবে। এমন ধরনের বহু বিষয় দেখে পাখিদের চিনে নিতে হয়। প্রথম প্রথম হয়তো অসুবিধে দেখা দিতে পারে একজন নতুন বার্ড-ওয়াচারের। কিন্তু কিছুদিন অভ্যেস হয়ে গেলে দেখা যাবে পাখি চিনে নিতে আর কোনো কষ্টই হচ্ছে না। বিভিন্ন গোত্র বা প্রজাতির পাখিদের বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ছে চোখের সামনে।

পাখি পর্যবেক্ষণের জন্যে আর-একটি সহায়ক বিষয় হল পাখিদের বাসা। পাখিদের বাসার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। বাসা দেখে পাখিদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কে কীভাবে বাসা বানায়। কোথায় তাদের বাসাটি বানায়। কখন ডিম পাড়ে। ডিমের সংখ্যা এবং রং কী। বাচ্চাদের লালন-পালন অর্থাৎ পাখিদের দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রতি নজর রাখা। তার পাশাপাশি তাদের খাদ্যের তালিকাও তৈরি করা। আর এভাবে পাখিদের পরিচয় বের করা সম্ভব।

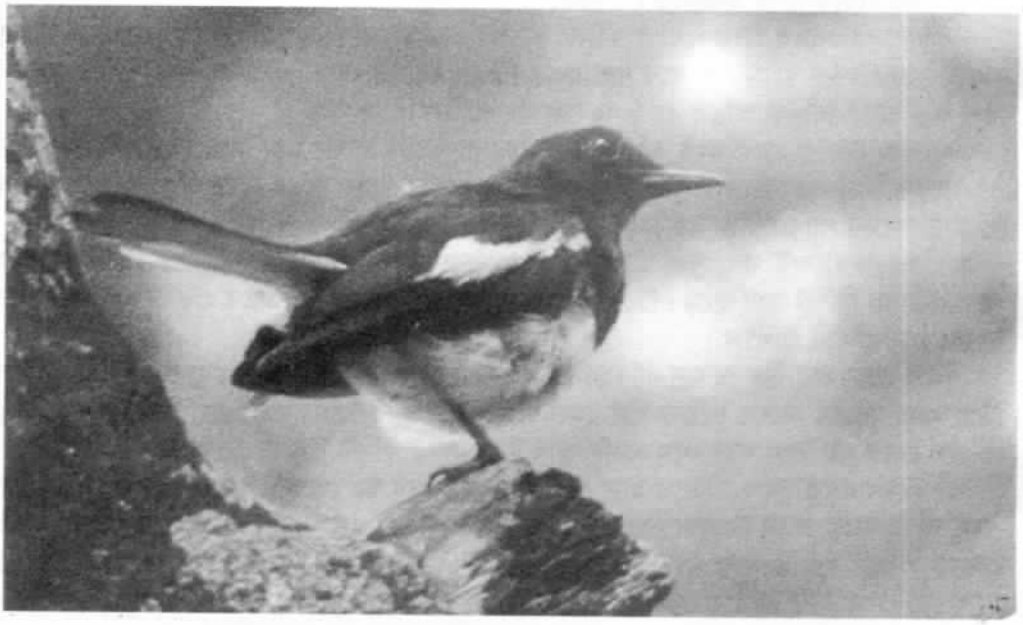

পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদ-নদী-হাওর-বিল ঘুরে আর বনে-বাদাড়ে মিশে গিয়ে পাখি-দেখা এক দারুণ মজা। প্রকৃতির মাঝে মিশে গিয়ে এ যেন পাখিদের সাথে মিতালি। নতুন দেশ আবিষ্কারের মতোই লাগে পাখিদের পরিচয় জানতে। আর সত্যি, দীর্ঘদিন পাখি দেখতে-দেখতে তাদের সাথে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ মমত্ববোধ। আর তখনই এদের জন্যে আমরা সচেতন হয়ে উঠি। শুধু কি তাই। পাখি দেখা যেমন একটি শখের বিষয় তেমনি এতে আনন্দও আছে প্রচুর।

পাখি পর্যবেক্ষণের ব্যাপার অতীতে বহু হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় 'পাখি পর্যবেক্ষণ' বা 'পাখি দেখা' বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই ধরনের পর্যবেক্ষণ প্রাচীনকালের মানুষদের মধ্যে ছিল না। সেই অর্থে বলা যায় ইংরেজদের রাজত্বের পূর্বে আমাদের দেশে আধুনিকভাবে পাখি-চর্চা হত না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মরত কিছু ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী তৎকালীন ভারতবর্ষের পাখিদের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। সেটা ছিল উনিশ শতকের প্রথমদিকের কথা। ১৮৬৪ সালে এদেশের পাখিদের ওপর প্রথম একটি বই প্রকাশিত হয়। লেখক ছিলেন টি.সি. জার্ডন। বইটির নাম 'দি বার্ডস অব ইন্ডিয়া'। তখন এ-ব্যাপারে অনেকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বহু পাখিরই নাম তখন অজানা ছিল। পাখি-পর্যবেক্ষকেরা পাখিদের এ-সময় নাম, শ্রেণী ও জাতি-গোত্র বিচারে মনোযোগী হলেন।

টি. সি. জার্ডনের বইটিতে প্রত্যেকটি পাখির প্রজাতি, আকার-আকৃতি, গায়ের রং, পালক, ডানা ছাড়াও আচার-আচরণ, খাদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। বইটি পড়ে অনেকে উৎসাহী হয়ে পাখি দেখতে গিয়ে সৌখিন পাখি-পর্যবেক্ষক হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে আরো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বেশ ক'টি বই এবং পত্রিকা প্রকাশিত হল। পথে-ঘাটে, মাঠে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বিভিন্ন পাখির তথ্য সংগ্রহ করে এ-সমস্ত পুস্তিকায় লেখা হত। এগুলোর মধ্যে স্ট্রে পেদার্স, দি ফওনা, নিউ ফওনা উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে সিন্ধু, আসাম, বাংলাদেশ, বার্মা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, কাশ্মির প্রভৃতি স্থানের পাখিদের নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা লেখা হত।

বিশ্বে পাখি-বিজ্ঞান বেশ এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে পাখিদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে অভয়ারণ্য। পাখি দেখার ক্লাব যেমন হয়েছে তেমনি বেড়েছে পর্যবেক্ষকের দল, পাখিবিজ্ঞানীর সংখ্যা। অনেকরকম বইপত্তর বেরিয়েছে পাখিদের সচিত্র বিষয়-আশয় নিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এই বাংলাদেশে পাখি-চর্চার প্রসার ততটা হয়নি। কিছু উৎসাহী আছেন যারা সৌখিন 'বার্ড ওয়াচার'—তবে তার সংখ্যা খুবই কম। নগণ্য। পাখি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা খুব কম হচ্ছে। ফলে আমাদের অবহেলায় এবং অত্যাচারে অনেক প্রজাতির পাখি এদেশ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আরো অনেক প্রজাতি লুপ্ত হবার পথে।

বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগে পর্যবেক্ষণের অনেক সুবিধে হয়েছে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে যাতে খুব সহজেই গবেষণার কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। ফটোলেন্স ক্যামেরা টেলিস্কোপসহ তৈরি হয়েছে নানা জাতের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। পাখিদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন্ত আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা প্রণালী সব এখন সহজেই জানা সম্ভব।

দেশে-বিদেশে অসংখ্য পাখি-প্রেমিক প্রতিদিন পাখি দেখে চলেছে। পাখি-পর্যবেক্ষক বা বার্ড-ওয়াচাররা সাধারণত দুই শ্রেণীর—পেশাদার ও অপেশাদার। আমেরিকাতে বার্ড-ওয়াচারদের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। পাখি-পর্যবেক্ষণ একটি মজার বিষয়। অনেকেই কৌতূহল মেটাতে শখ করে পাখি-দেখার দলে ভিড়ে পড়ে।

পাখি-পর্যবেক্ষণের সময় চারটি জিনিশ সাথে থাকা প্রয়োজন। তা হল—একটি দূরবীন, পাখিদের পরিচিতমূলক বই, একটি খাতা ও লেখার জন্যে কলম। নইলে পাখি-দেখার মজা পুরোপুরি পাওয়া যায় না। কারণ, অনেক সময় অচেনা একটি পাখি সামনে পড়ে গেলে তার গড়ন, আকার-আকৃতি পর্যবেক্ষণ

করে লিখে রাখতে হয়। আর পাখিদের পরিচিতিমূলক বইটি সাহায্য করে গাইড-বুক হিসেবে। পরিচিত পাখিদের চেনা যায় এ থেকে।

এই উপমহাদেশের মানুষের অতি প্রাচীনকাল থেকেই-যে পাখিদের পর্যবেক্ষণ করে আসছে তার আর-একটি প্রমাণ মহেঞ্জোদারো ও হরোপ্পা। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এই দুটি স্থান থেকে বহু প্রাচীন চিত্রফলক পাওয়া গেছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো এই মাটির চিত্রফলকগুলোতে রয়েছে অসংখ্য পাখির ছবি। ময়ূর ও হাঁসের ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া পঞ্চম শতকে আঁকা অজন্তার ভিত্তিচিত্রে নানা প্রজাতির হাঁস এবং পাখির ছবি দেখা যায়। বাস্তবধর্মী এই ছবিগুলো শিল্পীদের পাখিপ্রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বা পদ্ধতিগতভাবে এদেশের প্রথম পাখি-পর্যবেক্ষক হিসেবে অনেকেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা উল্লেখ করেন। বাবরও পাখি-প্রেমিক ছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শুধু পাখি-পর্যবেক্ষণ করেই চুপচাপ বসে থাকেননি, বিশিষ্ট চিত্রকর ওস্তাদ মনসুরকে দিয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য এবং বিচিত্র পাখির ছবি অঙ্কন করিয়েছিলেন। চিত্রকর মনসুরও ছিলেন গুণী শিল্পী এবং পাখি-পর্যবেক্ষক। নিপুণভাবে তিনি পাখির ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন চিত্রকর্মে। তাঁর এই চিত্রকর্মগুলো এখনো অতীতের মানুষদের পাখিপ্রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রাচীন মিশর, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশেও পাখিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সেই অতীত থেকেই। মিশরে 'ইতেরে' কবরস্থান থেকে পাওয়া গেছে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের আঁকা একটি মুরাল ছবি, নীল নদের অববাহিকায় বছরের একটি বিশেষ সময়ে যেসব বুনোহাঁস আসত তার ছবি। প্যাপিরাস আর শরবনে বাসা বাঁধত তারা। তাদেরই ছবি এঁকেছেন শিল্পী। নিপুণ হাতে হাঁসের আকৃতি, ঠোঁট, চোখ, পালকের রং সবই আঁকা হয়েছে। আর-একটি চিত্র পাওয়া গেছে নাখতের সমাধিমন্দিরে। এই ছবিটিতে আঁকা হয়েছে—একজন শিকারির জালে আটকা পড়েছে মিশরীয় হাঁস, দিগ হাঁস, সারস এবং বেশকিছু জলচর পাখি। এই ছবিটিতেও পাখিগুলো বেশ জীবন্ত।

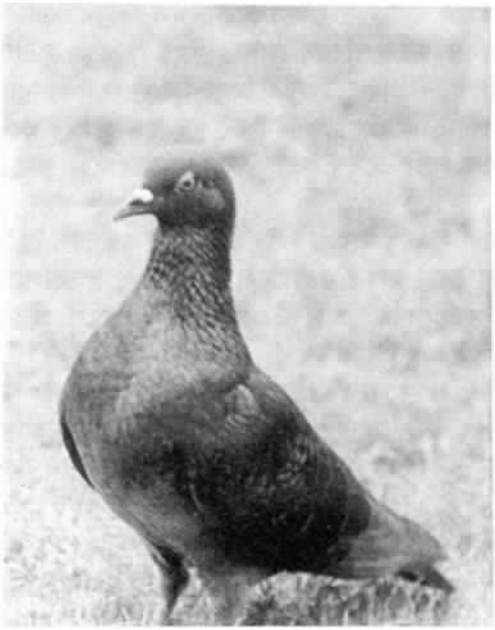

তাহলে দেখা যাচ্ছে খ্রিস্টের জন্মের দেড়হাজার বছর আগেও মিশরের মানুষ পাখিদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। এছাড়াও মিশরীয় সব দেবদেবীই পাখির মূর্তিধারী। সূর্যদেব হোরাসের মুখ বহেরি বাজের মতো, মৃত্যুদেব সেকের মুখ শিকারি বাজের মতো। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে পবিত্র পাখি ছিল শকুন। অনেক দেবদেবীর মুখও শকুনের মতো। অসংখ্য পাখি আর পাখিমুখো দেবদেবীর প্রাপ্ত পুরাকীর্তি থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন মিশরের অধিকাংশ লোকই ছিল পাখি-প্রেমিক।

চীনদেশেও পাখি-দেখার আগ্রহ বহুকাল থেকে লক্ষ্য করা যায়। ১১ শতকে সম্রাট হুইইৎসোঙ নিজেই ছিলেন পাখি-প্রেমিক এবং শিল্পী। আর এই কারণে তিনি পাখির ছবি এঁকে গেছেন নিপুণ হাতে। তাঁর আঁকা ফুল ও বটের ছবিটি বিখ্যাত। জাপানের জাদুঘরে ছবিটি সংরক্ষিত আছে। ছবিটি দেখলে বোঝা যায় শিল্পী কত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন পাখিটিকে এবং কত যত্নের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। এভাবে নাম-জানা না-জানা বহু চীনা-শিল্পীদের আঁকা ছবিতে পাখিরা স্থান পেয়েছে।

পাখিদের প্রতি মানুষের চিরন্তন ভালোবাসা এবং পর্যবেক্ষণশীলতা ধরে রেখেছে জাপানি শিল্পীরা। আর তাঁদের ছবিগুলো পাখি-দেখার আনন্দ ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করছে। পঞ্চাশ শতাব্দীর কৃতী শিল্পী সেশু অনেকগুলো পাখির ছবি এঁকেছেন। তার একটি বিখ্যাত ছবি হল সোনালি ঈগলের ছবি। এছাড়াও পরবর্তী শিল্পী কানো সানসেতসু, কানো ইতোকু, হকুসাই, কোরিউসাই প্রমুখেরা এঁকেছেন পাখিদের চমকপ্রদ জীবন্ত ছবি। জাপানের চিত্রকলায় মানুষের পরেই স্থান পেয়েছে পাখি।

আমাদেরও পাখিপ্রেমিক হওয়া প্রয়োজন।

এক মিনিটে ৩২৭ শব্দ উচ্চারণ

এক মিনিটে ৩০০ শব্দ খুব কম জনেই উচ্চারণ করতে পারেন। ক্যানডার আইসহকি খেলার বেতার-ভাষ্যকার জেরি উইলমট ২য় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সবচেয়ে দ্রুত ধারাভাষ্য দিতে পারতেন। গ্রে হাউন্ড কুকুরের রেমন্ড বেতার-ভাষ্য দিতে গিয়ে বি.বি.সি.-এর ঘোড়দৌড় ভাষ্যকার রেমন্ড গ্লেনভিনিং (১৯০৭-৭৪) একবার ৩০ সেকেন্ডে ১৭৬টি শব্দ বলেছিলেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি (১৯৭১-৬৩) একটি বক্তৃতায় মিনিটে ৩২৭টি শব্দ বলে ফেলেছিলেন। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ৬২ বছর বয়সী পিটার স্পিয়েগেল (p. Spiegal) (পশ্চিম জার্মানি) শর্টহ্যান্ড লেখকদের এক প্রতিযোগিতায় এক মিনিটে ৯০৮টি অক্ষর (সিলেবল) লিখে ফেলেছিলেন।

অবিশ্বাস্য মিল

এ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইতালির রাজা ছিলেন প্রথম আম্বার্তো (১৮৪৪-১৯০৮)। মৃত্যুর মাত্র একদিন আগে তাঁর জীবনে ঘটেছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা।

রাজা আম্বার্তো এমন একটি মানুষের সন্ধান পেয়েছিলেন, যার সাথে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ছিল অনেকগুলো মিল।

আম্বার্তো ছিলেন ভ্রমণবিলাসী ও আমুদে প্রকৃতির লোক। রাজ্য চালনার অবসরে সময় পেলেই তিনি সেনাপতিকে নিয়ে চলে যেতেন দূরদূরান্তে। সেখানে গিয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতেন আর পরিচিত হতেন নানারকম মানুষের সাথে।

১৯০৮ সালের ২৮ জুলাইয়ের এক সকালে রাজা আম্বার্তো ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সেনাপতি এমিলিও পোনাজিওর সাথে। যেতে যেতে তাঁরা গিয়ে উঠেছিলেন মোনাজো নামের একটি শহরে।

দীর্ঘভ্রমণে স্বভাবতই রাজা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর একটু খিদে পেয়েছিল। রাজা আম্বার্তো তাই কিছু খাবার জন্যে গেলেন মোনাজোর সবচে অভিজাত রেস্টুরেন্টটিতে। খেতে খেতে হঠাৎ রাজার চোখ পড়ল কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের ওপর। তিনি নিজের অজান্তেই চমকে উঠলেন তাকে দেখে। ভদ্রলোকের চেহারা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা লক্ষ্য করে রাজার মনে হল, সে লোকটিকে যেন তিনি কোথায় দেখেছেন। যেন বহুকালের পরিচিত তিনি!

রাজা আম্বার্তো একসময় সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, পোনাজিও! তুমি কি এ ভদ্রলোককে চেনো?

সেনাপতি বলল, হ্যাঁ মহারাজ। ইনিই এ হোটেলের মালিক।

রাজা বললেন, ভদ্রলোককে একটু এদিকে ডাকো তো। মনে হচ্ছে ওকে যেন কোথাও দেখেছি আমি!

সেনাপতি হোটেল মালিককে ডেকে আনলে রাজা বললেন, আপনাকে খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে। এর কারণ কী বলুন তো?

হোটেল মালিক বললেন, মহারাজ যদি অভয় দেন তো বলি। আপনি আয়নায় প্রতিদিন নিজেকে দেখেন নিশ্চয়ই। তাই আমাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কারণ সবাই বলে, আমি নাকি দেখতে একেবারেই আপনার মতো।

রাজা আম্বার্তো দেখলেন হোটেল মালিক মিথ্যে বলেননি। সত্যিই তার চেহারা, গোঁফ, উচ্চতা, গায়ের রং—এমনকি চুল আঁচড়ানোর স্টাইলটা পর্যন্ত একেবারে রাজার মতো।

রাজা বললেন, সত্যিই আপনি দেখতে অবিকল আমার মতো। তা জনাব, আপনার নামটা বলবেন কী?

হোটেলওয়ালা মৃদু হেসে বললেন, আমার নাম আম্বার্তো। জন্ম ১৮৪৪ সালের ১৪ মার্চ।

: কী? কী বলছেন আপনি? ঠিক ওই দিনটিতেই তো জন্মগ্রহণ করেছিলাম আমি! তা, কোথায় জন্মেছিলেন আপনি?

হোটেলওয়ালা বলল, টোরিনোতে, ছেলেবেলাটা আমার কেটেছেও সেখানে।

: টোরিনো? সেখানে তো জন্মেছিলাম আমিও। আমার ছেলেবেলাও কেটেছে টোরিনোতে। আচ্ছা আম্বার্তো, আপনি বিয়ে করেছেন কবে?

: বিয়ে করেছি ১৮৬৬ সালের ২ এপ্রিল বাইশ বছর বয়সে। আমার স্ত্রীর নাম মার্গারিটা।

: মার্গারিটা? কী আশ্চর্য! এটা তো আমারও স্ত্রীর নাম। আমিও বিয়ে করেছিলাম ১৮৬৬ সালের ২ এপ্রিল। সেদিন আমিও ছিলাম বাইশ বছর বয়স্ক যুবক। এ যে দেখছি অবিশ্বাস্য মিল ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের জীবনে!

উত্তেজনায় রাজা আম্বার্তো উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। হোটেলওয়ালার পিঠে একটি হাত রেখে বললেন, ভাই আম্বার্তো, আপনার ছেলেমেয়ে আছে তো?

: আছে মহারাজ। শুধুমাত্র একটি ছেলে আছে আমার। আমার স্ত্রী ওর নাম রেখেছে ভিট্টোরিও। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের যুবরাজেরও তাই নাম।

: শুধু যুবরাজের নামেই মিল নেই আম্বার্তো—সন্তানের সংখ্যার দিকটিতেও রয়েছে অদ্ভুত মিল! ভিট্টোরিও আমার একমাত্র সন্তান। তা ভাই, কদিন ধরে চালাচ্ছেন এ ব্যবসা?

: তা প্রায় ত্রিশ বছর তো হবেই। ১৮৭৮ সালের ৯ জানুয়ারি এ হোটেলটির সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছি আমি। তার আগে হোটেলটি চালাতেন আমার বাবা।

: কী বলছেন এসব! আরে, ওই দিনটিতে তো আমিও ইতালির সিংহাসনে বসেছিলাম। তার আগে রাজ্য চালাতেন আমার বাবা।

হোটেলওয়ালা আম্বার্তো বললেন, ১৮৬৬ আর ১৮৭০ সালে দু'বার আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে দুটো মেডেল নেবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। সে-সময় বীরত্বের জন্যে আপনাকেও একই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে আমি ছিলাম একজন সাধারণ নাগরিক আর আপনি ছিলেন সেনাবাহিনীর কর্নেল। ১৮৭০ সালে আমি ছিলাম সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট আর আপনি ছিলেন একটি বাহিনীর অধিনায়ক।

রাজা খুব আনন্দিত হলেন আম্বার্তোর কথা শুনে। তিনি বললেন, আপনার সাথে এতোগুলো মিল দেখে সত্যিই আমি বিস্মিত হয়েছি। আগামীকাল রোমে একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান হবে।

আমি চাই বিশেষ অতিথি হিসেবে আপনিও উপস্থিত থাকবেন সেখানে। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

: এ তো আমার সৌভাগ্য মহারাজ।

সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন হোটেলওয়ালা আম্বার্তো। রাজা বললেন, তাহলে কাল সকালে আমি আপনার জন্যে রাজকীয় গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আশা করি সময়মতো ক্রীড়ানুষ্ঠানে পৌঁছে যাবেন আপনি।

পরদিন ছিল ১৯০৮ সালের ২৯ জুলাই। রাজা ক্রীড়ানুষ্ঠানে বসে বারবার ঘড়ি দেখছিলেন অস্থির হয়ে। তাঁর বন্ধু আম্বার্তোর এসে পৌঁছোনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে প্রায়। অথচ তিনি আসছেন না কেন?

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সেনাপতি পোনাজিও। রাজাকে কুর্নিশ করে তিনি বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে মহারাজ। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আপনার বন্ধু মারা গেছেন। দুটি গুলি লেগেছে তার বুকে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে বিপ্লবী সন্ত্রাসীরা মহারাজা বলে ভুল করেই হত্যা করেছে তাকে।

: কী বলছ তুমি এসব? এ কী কথা শোনালে পোনাজিও? আমার বন্ধু নিহত ...

রাজা আম্বার্তো তাঁর মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই পরপর দুটো গুলি এসে লাগল তাঁর বুকে। রাজা আম্বার্তো মুহূর্তের মধ্যে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার মতো সুযোগও পেল না কেউ।

দু'জন লোকের চেহারা একরকম হতে পারে। কিন্তু জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অবিশ্বাস্য মিল আর তৃতীয় কোনো মানুষের জীবনে ঘটেছিল কি না জানা যায়নি।

'বিলিভ ইট অর নট' বই থেকে

হাস্যকৌতুক

শুধু শিশুরাই

: তোমাদের বাড়িতে এযাবৎ কোনো বড় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন?

: না ভাই, আমাদের বাড়িতে এযাবৎ শুধু শিশুরাই জন্মেছে।

গোয়েন্দার কাজ

লেখক : আমি একটা রগরগে গোয়েন্দা উপন্যাস লিখছি। তাই বেজায় ব্যস্ত।

বন্ধু : তোমার ঐ বইয়ের প্রকাশক কে?

লেখক : সেই প্রকাশককে খুঁজে বের করার ভার আমার গোয়েন্দার।

রাহাত খান

স্ট্যান্ডোফবিয়া

[দিলু, প্রদীপ, গজা, আকবর, সুনির্মল, জুয়েল—এরা সবাই চৌধুরীপাড়ার ছেলে, প্রায় সমবয়েসী। স্কুলের ছাত্র। সাজাহান ভাই রাজশাহীর লোক, বয়স একুশ-বাইশের ওপর, শুকনো কাঠির মতো চেহারা, মুখ একজোড়া বেমানান গোঁফ...সর্বদা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলেন। তাঁর ধারণা এটাই তাঁর অরিজিনিলিটি। চৌধুরীপাড়ার ছেলেদের নিয়ে সাজাহান ভাই একবার বনভোজনে গেলেন]

বেলা এগারোটায় আমরা মধুপুর গড়ে গিয়ে পৌছলাম। বাস রেখে দেয়া হল সরকারি ডাকবাংলোর দারোয়ান জুম্মা মিঞার কাছে। সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েই আমরা এখানে এসেছি। আমরা তিনদিন অন্তত অরণ্য-জীবনযাপন করতে চাই, বাড়ি ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই এ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ।

বাস রেখে দেওয়াতে মালপত্রের মোট নিজেদেরই বইতে হল। সঙ্গের মালপত্র নেহাত কম বলা চলে না। খাবার, পানির বড় ব্যাগ, হাঁড়িকুড়ি, চায়ের সরঞ্জাম, তাঁবু, বাজার-সওদা, একটা কেরোসিনের চুল্লি, গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বাক্স, টুকিটাকি আরো অনেক কিছু! মালপত্র নিয়ে আমরা অরণ্যের গভীরে ঢুকলাম।

শেষপর্যন্ত চমৎকার একটা জায়গা পাওয়া গেল। বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকে ঘন গাছপালা। সারি-সারি শাল, গজারি, শিশু, মহুয়া আর বাঁশঝাড়। এখানে-ওখানে উঁচু-নিচু লাল

মাটির টিলা। লাল মাটি ধুয়ে একটা ছোট্ট নদী এঁকেবেঁকে চলে গেছে দক্ষিণে। জঙ্গলের ভেতর খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানে তাঁবু খাটানো ঠিক হল। আমাদের সঙ্গে ছিল ড্রাইভার আলী মিঞা। সে তাঁবু খাটানোর ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করল।

খিদেয় আমাদের পেট চোঁ-চোঁ করছিল। সাজাহান ভাই গম্ভীরমুখে সকলের মধ্যে সিদ্ধ ডিম, কেক আর কলা ভাগ করে দিলেন। আলী মিঞার ভাগে ডিম আর কলা বেশি পড়ল। সে নাশতা সেরে চলে গেল ডাকবাংলোর দিকে। সেখান থেকে বাস নিয়ে চলে যাবে শহরে। তিনদিন পর বাস নিয়ে আবার সে আসবে। আমরা আলী মিঞাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলাম।

আমাদের মনে হল শহরের সঙ্গে সর্বশেষ সম্পর্কটুকুও যেন চলে গেল ড্রাইভার আলী মিঞার সঙ্গে। আমাদের চুপচাপ ভাবভঙ্গি দেখে সাজাহান ভাই রীতিমতো খেপে গেলেন। গম্ভীরমুখে বললেন : একেই বলে ঘরকুনো বাঙালি। 'থ্রি ডেইজে'র জন্য 'ফরেস্টে' এসেছি, এসেই গলা শুকিয়ে 'উড'। ইলিম্পো ডিলিম্পো য়েসকট টসকট কাঁহেকা! বুঝলি না বুঝি গালিটা? তা বুঝবি কেন? প্রত্যেক 'ওয়ার্ড' থেকে প্রথম অক্ষরটা নে। কী হল? ইডিয়েট? হ্যাঁ তাই। তোরা সব ইডিয়েট!

জুয়েল বলল : ভয় পেয়েছি? কখ্খনো না। একটু কী বলে মন খারাপ হয়েছে। তবে ভয় পাইনি। পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। কী বলিস গজা?

: নিশ্চয়ই।

গজা এ-বিষয়ে জুয়েলের সঙ্গে একাত্মা। সবাই সাহসের পরীক্ষা দিতে রাজি হয়ে গেল জুয়েলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

আকবর বলল : বলো না কী করতে হবে সাজাহান ভাই, আমরা চৌধুরীপাড়ার ছেলে, আমাদের অসাধ্য যে কিছু নেই তা দেখিয়ে দিই।

: হ্যাঁ, বলেন।

সুনির্মল সায় দেয়, সাজাহান ভাইয়ের গলার স্বর নকল করে বলল : সিম্পলি অর্ডার দিয়ে দেখেন ভগবানের আশীর্বাদে...

সাজাহান ভাই খুশি হয়ে বললেন : বেশ, বেশ, এই তো চাই। না রে, কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না। তোদের চোখ-মুখ দেখেই আমি সব 'আন্ডারস্ট্যান্ড' করতে পারছি। আর কিছু না, তোরা আমাকে ১৯৫৭ সালের একটা অর্ডিনারি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিস। তখন আমার বয়েস ছিল এই প্রদীপের মতো—বারো-তেরো বছরের মতো। আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে 'টাইগার'টা খুব লম্ফঝম্প করছিল। শেষপর্যন্ত কী আর করি, রেগে-মেগে...

দিলু বলল : তার মানে ১৯৫৭ সালে আপনি একটা বাঘ মেরেছিলেন সাজাহান ভাই...

সাতিশয় লজ্জিত হয়ে সাজাহান ভাই বললেন : সেই কলঙ্কের কথা আর তুলিস না দিলু। ভেবেছিলাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার বুঝি 'কিল' করলাম, পরে দেখি একটা 'অর্ডিনারি টাইপের টাইগার'। মেজাজই খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। 'ক্লিয়ার' মনে আছে, সেদিন রাগ করে বিকেলের চা খাইনি। বন্দুক নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুন্দরবনে 'স্ট্রল' করে বেড়িয়েছিলাম।

সাজাহান ভাই তাহলে বাঘ মেরেছিলেন!

আমরা বিস্ময়ে, গর্বে, আনন্দে সাজাহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। সাজাহান ভাই বললেন : এসব অর্ডিনারি ঘটনা 'গো' করতে দে। আসল কথা হল সাহস। হ্যাঁ, তোরা কেউ সাহস 'লুজ' করবি না কখনো। তাহলে আমি অত্যন্ত 'সরি' হব। নে, এইবার 'লাঞ্চের' ব্যবস্থা কর্। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোদের 'সে' করতে চাই।

সাজাহান ভাই নিস্তব্ধ হলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন : কথাটা হল তোদের 'লিডার' কে?

কথাটা শুনে কেউ কিছু বলার আগে জুয়েলই বলল : কেন, আপনি আমাদের লিডার সাজাহান ভাই।

: নো, নো, আমি তোদের লিডার নই। আমি হলাম গিয়ে তোদের 'বিগ ব্রাদার', বেঙ্গলিতে তোরা যাকে বলিস বড়ভাই। লিডার আমরা একজন দল থেকে 'ব্রিং আউট' করতে চাই।

আমরা সবাই চুপ করে আছি দেখে সাজাহান ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন : ধ্যাৎ! লিডার সম্পর্কে তোদের কোনো আইডিয়াই নেই। শোন্, আমি একটা প্রস্তাব দিই। সারাদিনের মধ্যে যে সবচে উদ্ভট আর মজার গল্প 'টেল' করবে, সেই হবে পরের দিনের জন্য লিডার। এইভাবে 'ডেইলি' আমরা লিডার ঠিক করব বুঝলি?

আমরা সবাই তক্ষুনি রাজি। বেশ মজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সাজাহান ভাই বললেন : আমিও তোদের সঙ্গে 'সিরিয়াসলি কমপিট' করব। মনে করিস না বিনা-যোগ্যতায় 'লিডারশিপ' মেরে দিতে পারবি!

আমাদের অরণ্য-জীবন শুরু হয়ে গেল। আপাতত আমাদের লিডার নেই, সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই নিজের-নিজের লিডার। আমাদের কাজ আমরা ভাগ করে নিলাম। দুপুরের খাওয়া সেরে উঠতে-উঠতে বেলা সাড়ে তিনটা বেজে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা ক'জন নদীর তীর ধরে বেড়াতে গেলাম। আমরা মানে আমি, দিলু, গজা আর সুনির্মল। চারদিক নিবিড় ছায়ায় ঢাকা! এখানে-সেখানে সোনার পাতের মতো রোদের টুকরো। আমাদের সাড়া পেয়ে কয়েকটা ধূসর রঙের তিতির ঝোপঝাড় ঝাপ্টে দূরে পালিয়ে গেল। গাছের পাতায়-পাতায় ফাল্গুন মাসের প্রথম হাওয়া হু-হু করছে।

বাইরে থেকে বেড়িয়ে যখন তাঁবুতে ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। পশ্চিমদিক রক্তবর্ণ। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। পাগলা হাওয়া বইছে চারদিকে।

জুয়েল নতুন দুটি ছেলেকে নিয়ে রাত্রিবেলাকার রান্নার উদ্যোগ করছে। জুয়েল বেশ ভালো রাঁধতে পারে। তার এই গুণটা খুব কাজে লাগছে। দুপুরবেলা জুয়েলের হাতের রান্না খেয়ে সাজাহান ভাই তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকল রাত ন'টার দিকে। তাঁবুর বাইরে মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হল। আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম। এখন গল্পবলার আসর। গল্প হওয়া চাই উদ্ভট। কিন্তু সাজাহান ভাই সাবধান করে দিলেন, শুধু উদ্ভট হলেই চলবে না, সত্যি গল্প হওয়া চাই।

গল্প বলার তালিকায় মোট তিনজন নাম লেখাল। সুনির্মল, গজা আর প্রদীপ। দিলুকে গল্প বলার জন্য সবাই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু দিলু কিছুতেই রাজি হল না। সে বলল : আমি ডেপুটি লিডার হতে চাই। লিডার হব না।

সাজাহান ভাই বললেন : ডেপুটি লিডার আমরা ভোটে ঠিক করব। কী বলিস জুয়েল?

জুয়েল বলল : সেই ভালো। নিয়ম করে দাও ভোট নেয়া হবে গোপনে।

: বহুত আচ্ছা।

আকবর বলল : এইবার গল্প শুরু হোক।

সাজাহান ভাই বললেন : সুনির্মল স্টার্ট কর্।

সুনির্মল শুরু করল: একেবারে খাঁটি সত্য কথা বলছি, দু-একটা ছোটখাটো ত্রুটি অবশ্য থাকতে পারে। সে যাকগে...ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছর। পরীক্ষা শেষে মামা চিঠি লিখলেন

যেতে। মামা-বাড়ি যেতে আমারও খুব ইচ্ছে করছিল। একদিন মামা-বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম রওনা হলাম এরোপ্লেনে। প্লেনের ড্রাইভার রবিদাস খুব মজার লোক। সে প্লেন চালাতে লাগল আর গান গাইতে লাগল। মাঝপথে প্লেন থামিয়ে গঞ্জ থেকে একসের গরম জিলাপি, আধসের কদমা কিনে নিলাম। মামা-বাড়ি গিয়ে পৌছলাম সন্ধ্যার দিকে। পৌছে যেতাম বিকালবেলায়। কিন্তু একটা বলদ আবার খোঁড়া ছিল। বলদটা কেনা হয়েছিল তেলিদের কাছ থেকে। তেলিরা আবার ঘোড়ার বদলে সময়-সময় বলদ দিয়েই ঘানি টানে কিনা...

গল্প শুনে সাজাহান ভাই তো মহা খেপে গেলেন! এক ধমকে সুনির্মলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : পট্টি মারার আর 'প্লেস' পাস না হতভাগা? এরোপ্লেন দিয়ে তুই মামা-বাড়ি 'ওয়েন্ট' করেছিলি আর তাই আমরা 'বিলিভ' করব? পুরনো ক্যালেন্ডার কোথাকার!

: বাহ, গুলপট্টি মারলাম কিসে? আমি তো ঠিকই বলছি।

সুনির্মল একেবারে সত্যের অবতার!

: চুপ কর্, ভেজাল 'পাউডার মিল্ক' কোথাকার।

সাজাহান ভাই একেবারে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠেন।

: ওহ হো—

সুনির্মল এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পায়। বলে : একটা কথা তোমাদের খুলে বলা হয় নি। ওটা আমার ভুল হয়েছে বলতে পারো। আসলে গাড়োয়ান রবিদাসের গরুর গাড়িটাকে মজা করে আমরা এরোপ্লেন বলে থাকি। তাহলে কথাটা দাঁড়াল গতবছর গরুর গাড়িতে করে আমি মামা-বাড়ি গিয়েছিলাম।

এবার গজার পালা। সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে সে বলল,

: মামা-বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই খুব করে মজার মজার খাবার খেয়েছিলি?

: সে আর বলতে...

সুনির্মল বলল : দুইবেলা ঘি-দুধ, রাবড়ি, সন্দেশ...

: কিন্তু আমি যা খেয়েছিলাম তা পৃথিবীতে কেউ খেয়েছে কিনা সন্দেহ।

গজা নড়েচড়ে বসে গল্প বলতে শুরু করল : আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল একটা বাজি থেকে। আমার মামাত ভাই সোহেলের সঙ্গে সবসময়ই এটা-ওটা নিয়ে জেদাজেদি হয়। একদিন কোত্থেকে যেন উড়ে এসে সোহেল বলল, তুই দশ সের রসগোল্লা খেতে পারবি গজা? আমি বললাম? দশ সের? ওরে বাবা, অত পারব না। পাঁচ সের নাগাদ পারব। মিটিমিটি হেসে সোহেল বলল : না তুই কোনো কম্মের নস, তা আমি জানি। গজা, তোর জন্য আমার খুব দুঃখ হয়।

সোহেলের বিদ্রূপ শুনে মেজাজ গরম হয়ে গেল। বললাম : বেশ খাব দশ সের রসগোল্লা। দশ সের না, এক মণ খাব; না, এক মণ কম হল, আমি দশ মণ রসগোল্লা খাব। খেয়ে তোকে দেখিয়ে দেব। আন্ দেখি দশ মণ রসগোল্লা।

সোহেল তেমনি শয়তানি হাসি হেসে বলল : তোর একটা গুণ আছে গজা। গুণটা হল, তুই কথায় একেবারে দুনিয়া উল্টে ফেলিস। কিন্তু কাজের বেলায় নিজেই উল্টে যাস।

আমি বললাম : বেশ তাহলে কাজ দিয়েই আমার কথা প্রমাণ করছি। চল্ মিষ্টির দোকানে যাই।

সোহেল রাজি হয়ে আমার সঙ্গে মিষ্টির দোকানে গেল। আমি একটুও কথা না বলে রসগোল্লা খেতে শুরু করলাম। প্রথম খেলাম দশ মণ। চারদিকে ভিড় জমে উঠল। মিষ্টিঅলা তাজ্জব বনে গেল। ব্যাপার দেখে সোহেলও ঘাবড়ে গেছে। সে বলল : আর খাশনে গজা। অসুখ করে মরবি। আমি বললাম, তা হয় না। দশ মণ খেয়েছি, এবার আরো কিছু খেয়ে একটা রেকর্ড করতে চাই।

সবাই হা করে গল্প শুনছে। দিলু বলল : তা, তুই রেকর্ড করেছিলি?

: করেছিলাম বৈকি। সেবার দশ মণ রসগোল্লার ওপর আরো পঞ্চাশ মণ রসগোল্লা খেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ওটাই খাওয়ার পরিমাণের দিক দিয়ে ওয়ার্ল্ড-রেকর্ড।

: আমাদের বিশ্বাস—

আকবর নিশ্বাস ছেড়ে বলে : তোর মাথার সব ক'টা বল্টু খুলে কোথাও পড়ে গেছে। তা নইলে ষাট মণ রসগোল্লা খেয়েছিলি তুই এটা আমাদের বিশ্বাস করতে বলিস?

গজা দুঃখিত হয়ে বলে : বিশ্বাস করা না-করা তোদের ইচ্ছে। আমি কিন্তু একেবারে সত্যি কথা বলছি।

: তোকে 'ম্যাড ডগে' কামড়ায় নি তো গজু?

সাজাহান ভাই সতর্কভাবে তাকান গজার দিকে : পাগল অনেক রকম 'সি' করেছি, কিন্তু ব্রাদার, তোর মতো এমন জাতপাগল কোথাও দেখিনি। তোকে আমরা আর কী বলি! আজ মোহাম্মাদ তোগলক বেঁচে থাকলে তিনি তোর 'ভ্যালিয়ো' বুঝতে পারতেন।

গজা বলে : আমি আবার বলছি, এটা সত্যি ঘটনা।

: সত্যি ঘটনা?

: আলবৎ সত্যি ঘটনা। স্বপ্ন দেখা কি মিথ্যে ব্যাপার বলতে চাও? আমি একদিন স্বপ্নে ষাট মণ রসগোল্লা খেয়েছিলাম। কি, হল এখন?

প্রদীপ কেন যেন হাসতে লাগল গজার কথা শুনে। হাসি কিছুতেই থামে না। দিলু বলল : অমন করে হাসছিস কেন প্রদীপ? কী হয়েছে?

: খাওয়ার কথা শুনে হাসছি। ভুল করে আমিও একদিন খেয়ে বসেছিলাম কিনা। তবে গজার মতো অতটা নয়, সামান্য।

: স্বপ্নে খেয়েছিলি?

: না, না, স্বপ্নে খাব কেন?

প্রদীপ আপত্তি করে, তাকায় সাজাহান ভাই'র দিকে। বলে : গল্পটা তাহলে বলি সাজাহান ভাই। অপরাধ নেবেন না কিন্তু। আমি তো ইচ্ছে করে খাইনি, ভুল করে খেয়েছিলাম।

: 'সে' করতে শুরু কর বাপু। দেখি কোথাকার 'ওয়াটার' কোথায় গিয়ে 'স্ট্যান্ড' করে...

সাজাহান ভাই তাড়া দেন।

প্রদীপ বলে : কদিন আগের ব্যাপার। রাত্রিবেলা দাদুর ঘরে শুতে হয়েছিল। দাদু কবিরাজি করেন, বুড়ো মানুষ। আমি যখন শুতে গেলাম তখন দাদু পাশের ঘরে মা আর ছোটো পিসির সঙ্গে গল্প করছেন। খুব ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু শুতে গিয়ে দেখলাম বিছানাটা জানালা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার তখন খুব রাগ হল। আমি দরজা খুলে বিছানাটার পিছু নিলাম। বেরিয়ে বাগানে এসে দেখলাম তাজ্জব কাণ্ড।। হাজী মুহম্মদ মহসিন আর অঙ্কের পণ্ডিত যাদব চক্রবর্তী বসে আছেন বাগানের বেঞ্চে। আমাকে দেখে হাজী মুহম্মদ মহসিন বললেন, তুমি একটা অঙ্ক করতে পারবে প্রদীপ? আমি বললাম, কী অঙ্ক? যাদব চক্রবর্তী উত্তর দিলেন। বললেন, অঙ্কটা খুব সহজ। কিউবের ফর্মুলা দিয়ে এশিয়া মহাদেশ ভাগ করতে হবে। আমি অঙ্ক করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় ব্যাবিলনের রাজা সলোমান এসে হাজির হলেন। বললেন—প্রদীপ, রাস্তায় আমার রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। তোমার কাছে এক টাকার ভাংতি হবে? আমি বললাম, না, আমার কাছে হবে না। দাদুর কাছে হতে পারে। দাঁড়ান দাদুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আসি।

রাজা সলোমান বললেন, থাক লাগবে না। এসো আমরা ক্রিকেট খেলা দেখি।

চোখ ফিরিয়ে দেখি তাজ্জব ব্যাপার! আমাদের বাগানে ক্রিকেট খেলা চলছে। দক্ষিণদিক থেকে বল করছেন ফজল মাহমুদ। ব্যাট করছেন শিল্পী জয়নুল আবেদীন। উইকেট কিপারের দিকে তাকিয়ে আমি আরো অবাক। উইকেট কিপিং করছেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক! ফিল্ডিং দিচ্ছেন হানিফ মোহাম্মদ, হাটন, কবি উইলিয়ম শেক্সপিয়র আর ম্যাক্সিম গোর্কি। অন্য পাশে ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি স্বয়ং আমি। খুব খেলা হচ্ছিল। আমি পিটিয়ে খেলছিলাম, প্রায় ওভারেই চারটা-পাঁচটা চারের মার। হঠাৎ মাঠে এসে হাজির হলেন যাদব চক্রবর্তী। গম্ভীরমুখে বললেন : হোম-টাস্কের অঙ্ক কটা করেছ? আমি বললাম, অঙ্ক করতে চাই না। আমি ক্রিকেট খেলব আর ছবি আঁকব। শিল্পী জয়নুল বললেন, হাতটা কখনো নষ্ট কোরো না প্রদীপ।

গোর্কি বললেন, আমি এখন একটা ক্যাচ করব। একজন আম্পায়ার গান করতে-করতে বলল, খেলা শেষ হয়েছে, এখন শুতে যাও প্রদীপ। আম্পায়ারের গান শুনে আমার বিছানাটার কথা মনে পড়ল। বিছানাটা পালিয়ে গেছে, আমি শোব কোথায়? গোর্কি বললেন, বিছানা পালিয়ে গেছে তাতে কী হয়েছে? হাজী মুহম্মদ মহসিন বললেন, হ্যাঁ তাতে কী হয়েছে? তোমাকে আমি বিছানাটার কাছে নিয়ে যাব। আমি বললাম, তাহলে খুব ভালো হয়।

আমার ঘুম পাচ্ছে। বিছানা নেই বলে শুতে পারছি না। আমার সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। হাই উঠছিল আমার। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন দাদু। তাঁর টেঁকো মাথাটা বিকট রকম বড় দেখাচ্ছিল। দাদু আমার হাত ধরতে চাইলেন। আমি দিলাম না। বললাম, দাদু, আমি কাল সকালবেলা হোম-টাস্ক করব। দোহাই আপনার, দয়া করে রাগ করবেন না। দাদু যেন কাঁদতে লাগলেন। বললেন, তাতে কী হয়েছে প্রদীপ, আমিও তো তোমার সাথে এক ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, হোম-টাস্কের অঙ্ক নাহয় কাল সকালবেলাই করব। দাদুর কথা শুনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আর উইলিয়াম শেক্সপিয়র খুব হাসতে লাগলেন।

: আমার কিন্তু 'ক্রাই' করতে ইচ্ছে করছে...

সাজাহান ভাই গোল হয়ে বসলেন। বিগলিত গলায় বললেন : তোর 'ব্রাঞ্চমিল' দেখে আমার 'সিম্পলি' ক্রাই করতে ইচ্ছে করছে রে...

জুয়েল বলল : 'ব্রাঞ্চমিল' শব্দটার মানে কী সাজাহান ভাই?

: মানে তোর 'হেড'—মুণ্ডু... ...

সাজাহান ভাই রাগ করেন : ইংরেজি কি তোরা কিছুতেই 'লার্ন' করবি না জুয়েল? 'ব্রাঞ্চ' মানে কাণ্ড আর 'মিল' মানে কারখানা—সব মিলে হল কাণ্ডকারখানা, এটুকু বুঝতে পারছিস না পাজির পা-ঝাড়া কোথাকার?

প্রদীপ বলে : আমি কিন্তু শব্দটার অর্থ বুঝেছিলাম সাজাহান ভাই।

: সে কথা থাক। পরে কী হল তাই শুনি...

দিলু রায় দেয়। সাজাহান ভাই বলেন : না না... শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আর উইলিয়ম শেক্সপিয়র লাফিং করতে লাগলেন ঐ পর্যন্ত থাক্। পরে কী হল শোনার চেয়ে আগে কী হয়েছিল তা-ই বরং 'হিয়ার' করা যাক।

প্রদীপ বলল : দাদুর টেবিল থেকে একগ্লাস পানি খেয়েছিলাম। খেয়েছিলাম সামান্যই, তবে...

: একগ্লাস পানি খেয়েই এই অবস্থা!

: পানিতে ছিল দাদুর কবিরাজি বড়ির গুঁড়ো। প্রদীপ রহস্যভেদ করে। বলে : সে রাতে বাগান থেকে আমাকে দাদুরা ধরে এনেছিলেন। এখন তিনি লজ্জায় কবিরাজি করাই ছেড়ে দিয়েছেন, রোজ রাতে সিদ্ধিও খান না...

: তার মানে তুই সিদ্ধি 'ইট' করেছিলি?

সাজাহান ভাই প্রায় আর্তনাদ করেন।

: হ্যাঁ করেছিলাম। ভুল হয়ে গিয়েছিল বলতে পারো।

প্রদীপ উৎসাহের সঙ্গে জানায়।

দারুণ গম্ভীর হয়ে যান সাজাহান ভাই। দিলুর দিকে তাকিয়ে বলেন : প্রদীপকে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তিটা হল বাঁ-হাতের 'ওল্ড' আঙুল ছাড়া বাকি চারটে আঙুলে এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট তাকে ঝুলে থাকতে হবে সামনের ঐ জামগাছের ডালে। নিয়ে যা প্রদীপকে।

প্রদীপ হাউমাউ করে বলে : বাহ, বললাম তো ভুল হয়েছিল। তার জন্য আবার শাস্তি কিসের?

: ভুল হয়েছিল বলেই তো 'ফোর ফিঙ্গারে' 'হ্যাঙিং'-এর শাস্তি দেয়া হল। 'নলেজ' থাকতে অর্থাৎ বেঙ্গলিতে তোরা যাকে বলিস জ্ঞান-থাকা-অবস্থা, সেই অবস্থায় সিদ্ধি ইট করলে তো মাথায় ইট 'ব্রেক' করতাম।

প্রদীপ নিরুপায় হয়ে বলে : ধরো যদি বলি আমি সিদ্ধি খাইনি। গল্পটা বানিয়ে বলেছি, তাহলে?

: তাহলে 'পানিশমেন্ট' একটু অন্যরকম হবে। সে-অবস্থায় তুই দু-হাত দিয়েই গাছের ডালে 'হ্যাং' করতে পারবি। তবে নিচে থেকে তোর পায়ের পাতায় লম্বা ঘাসের ডগা দিয়ে কাতুকুতু দেয়া হবে। কোনটা চাস তুই?

প্রদীপ রাগ করে গিয়ে জামগাছে উঠল। ঝুলে পড়ল বাঁ-হাতে। সবাই আমরা নিচে দাঁড়িয়ে প্রদীপের শাস্তি দেখছি!

সময় উত্তীর্ণ হলে দিলু বলল : নেমে আয় প্রদীপ।

প্রদীপ বলল : আমি নামব না। তিনদিন তিনরাত আমি এইভাবে ঝুলতে থাকব।

: কিন্তু তার তো উপায় নেই, তুই হলি গিয়ে লিডার। তোর গল্পটাই আমরা সবাই উদ্ভট আর মজার বলে রায় দিয়েছি।

: বলো কী দিলু ভাই! সাজাহান ভাইও রায় দিয়েছে?

: হ্যাঁ, সাজাহান ভাইও রায় দিয়েছেন।

প্রদীপ লাফ দিয়ে গাছ থেকে নামল, মুহুর্মুহু স্লোগান উঠল : প্রদীপ কুমার শর্মা—জিন্দাবাদ! লিডার প্রদীপ জিন্দাবাদ!

রাতে আমরা সবাই ঘুমাতে গেলাম তাঁবুর ভেতরে। চারপাশে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে দেয়া হল। পালা করে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করল প্রদীপ। ভোররাতের দিকে পড়ল আমার আর দিলুর পালা। আমরা পাহারা দিচ্ছি, ঝিঁঝি পোকার ঐকতান শুনছি আর আকাশের তারা দেখছি। মিষ্টি বাতাস বইছে চারদিকে, বনেলা ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি। চমৎকার লাগছে আমাদের। এই সময়েই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল দিলু—

: হু কামস দেয়ার, হল্ট!

দিলুর হাতে গুলি-ভরা বন্দুক উদ্যত হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি সামনে এক আবছায়া মূর্তি। বন্দুক দেখে মূর্তিটা থমকে দাঁড়াল। দু-হাত ওপরে তুলে বলল : ফ্রেন্ড!

কাছে আসতে দেখি লোকটা ন্যাশনাল পার্কের কেরানি খোদাদাদ ভূঁইয়া, ডাকবাংলোয় আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। খোদাদাদ ভূঁইয়া বললেন : তোমরা বুঝি এখানে তাঁবু ফেলেছ...বেশ, বেশ...

তিনি বার্মা চুরট ধরালেন : আজ সারারাত আমাদের কারো ঘুম নেই। সারা জঙ্গল চষে ফেলেছি। একেই বলে ভাগ্যের ফের। নাইজিরিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি মি. রঙ্গন কুফুয়া ঘণ্টাদুই বাদে 'লাভলী'কে নিতে আসছেন। অথচ লাভলীর কোনো পাত্তা নাই। কখন যেন সুযোগ পেয়েছিল, সটকে পড়েছে বিকালবেলা। এখন লাভলীকে মি. কুফুয়ার হাতে ফিরিয়ে দিতে না-পারলে কী গতি হবে আল্লাই জানেন।

আমি বললাম : লাভলী কী হয় আপনার?

এক মুখ ফ্যাঁসফ্যাঁসে পাতলা ধোঁয়া ছেড়ে খোদাদাদ ভূঁইয়া বললেন : লাভলীকে চেনো না বুঝি? লাভলী হচ্ছে বিন্ধ্যাচল এলাকার একটা পোষা হনুমান। মি. রঙ্গন কুফুয়ার পোষা হনুমান। মি. কুফুয়া বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কাজে আসার পর হনুমানটাকে আমাদের হেফাজতে রেখেছিলেন। মি. কুফুয়ার এখানকার কার্যকাল শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আজ ভোর সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি মোটরে করে এখানে আসছেন লাভলীকে নিতে। কিন্তু কোথায় লাভলী!

হতাশায় মাথা নাড়েন ভূঁইয়া সাহেব।

: মি. কুফুয়াকে আমরা ডিনার পর্যন্ত আটকে রাখতে পারব। দেখ তো তোমরা এর মধ্যে লাভলীর দেখা পাও কি না। আর হ্যাঁ, সাবধান, গুলিটুলি ছুড়ো না যেন। মি. রঙ্গন কুফুয়া বলেন, লাভলী নাকি খুব সেন্টিমেন্টাল।

দিলু বলল : একটা হনুমানের জন্য মি. কুফুয়ার অত দরদ কেন বুঝতে পারছি না...।

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা পড়ল ভূঁইয়া সাহেবের। বললেন : আসল কথা বললে খোদা ব্যাজার হবেন। তাই বলি না।

রাগ করে ভূঁইয়া সাহেব আবার বললেন : বুঝলে না। মি. রঙ্গন কুফুয়ার সাথে চেহারার আশ্চর্য মিল আছে লাভলীর। প্রায় হুবহু একরকমের চেহারা। যাকগে, মানুষের নিন্দা করতে নেই, তওবা তওবা...

ভূঁইয়া সাহেব দুই গালে মৃদু চাপড় মারতে-মারতে চলে গেলেন নদীর দিকে। তখনো আকাশে দু-একটা তারা আছে। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে। পাখপাখালির গানে ভরে গেছে গড়। পুব আকাশের মেঘগুলো ক্রমে সিঁদুরের রং ধরছে।

দলের সবাইকে হনুমানটার কথা জানানো হল। ইতিমধ্যে আমাদের নাশতা হয়ে গেছে। গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছি সবাই। হনুমানের কথা শুনে সাজাহান ভাইয়ের চোখমুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন : বড় ডেঞ্জারাস জিনিশ এই হনুমান। ১৯৫৭ সালে সুন্দরবন গিয়ে আমি অবশ্য গোটা-তিনেক হনুমান 'ক্যাচ' করেছিলাম। কিন্তু সেই থেকে ঠিক করেছি, 'হ্যান্টিং' করি আর যা-ই করি, হনুমান বাদ দিয়ে করব।

প্রদীপ বলল : ১৯৫৭ সালে আপনি তাহলে তিনটা হনুমান মেরেছিলেন সাজাহান ভাই?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাজাহান ভাই বললেন : হনুমান আবার 'কিল' করতে যাব কোন দুঃখে শুনি? 'কিল' করার বস্তু নাকি ওগুলো? ১৯৫৭ সালে 'ওপেন হ্যান্ডে' তিনটা ধাড়ি হনুমান 'ক্যাচ' করেছিলাম।

দিনটা বেশ ভালোই কাটল আমাদের। আকবর আর সাজাহান ভাইয়ের ওপর খাবার তৈরির ভার দিয়ে দুপুরে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম অরণ্যে। নদীর ওপর বাঁকানো বাঁশের কঞ্চির পর বসে-থাকা একঝাঁক মাছরাঙা পাখির একটা ছবি তোলা হল। একটা কাঠবিড়ালী আমাদের দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তাকেও তাড়াতাড়ি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হল ক্যামেরায়। দিলু কতকগুলো রঙ-বেরঙের ফুল সংগ্রহ করল। তার ওপর পথে গান-নাচ তো ছিলই। হৈ-হুল্লোড় করে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। তাঁবুতে ফিরে এলাম সন্ধ্যার লাগ লাগ।

ফিরে এসে দেখি তাঁবু নিস্তব্ধ। কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে ঢুকে দেখি সাজাহান ভাই মলিন-মুখে বসে আছেন। আকবরের হাতে বন্দুক। সাজাহান ভাই আমাদের সকলকে দেখে বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, বোঝা গেল না।

প্রদীপ বলল, 'কী ব্যাপার আকবর ভাই?'

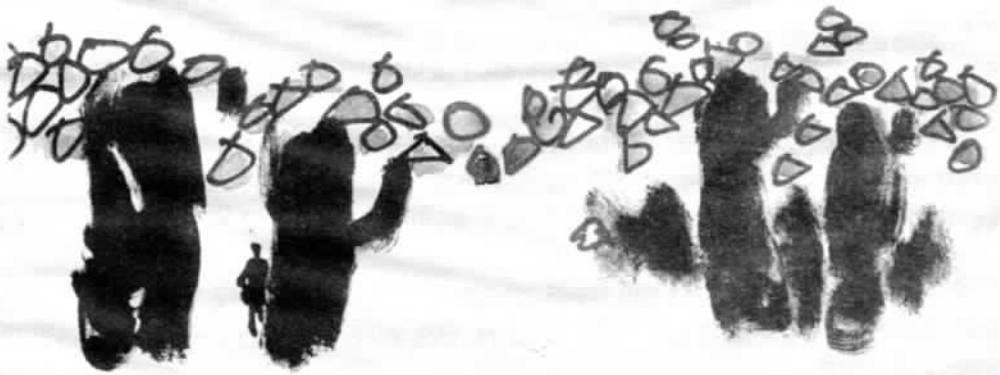

আকবর একবার সাজাহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে উঠে আসে; প্রদীপের কানে-কানে বলে : মি. রঙ্গন কুফুয়ার হনুমানটা অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডালে। বললে বিশ্বেস করবি না, হনুমানটার নজর শুধু সাজাহান ভাইয়ের দিকে। সাজাহান ভাই একবার তাঁবু থেকে সামান্য বেরিয়েছিলেন, অমনি হনুমানটার কী লম্ফঝম্ফ! সাজাহান ভাই দুই লাফে সেই-যে তাঁবুতে এসে ঢুকেছেন, নিজেও বেরোন না, আমাকেও বেরোতে দেন না।

ভাঙা-গলায় সাজাহান ভাই বললেন : সব কথা আন্ডারস্ট্যান্ড করিয়ে 'সে'...করতে পা... পারছি না দিলু। আমি ব্রাদার কিছুক্ষণ আ...আ...গে তোতলা হয়ে গেছি। তো...তোতলা হয়ে গেছি...

সাজাহান ভাইয়ের অবস্থা দেখে ও হনুমানটার কথা শুনে আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। সেই সন্ধ্যায় মিটিং বসল। প্রদীপ বলল : ঘটনা যাই হোক, সাহস 'লুজ' করলে চলবে না। এখন দেখতে হবে আমাদের মধ্যে কে এমন সাহসী আছে যে হনুমানটাকে ধরতে পারে। নিদেনপক্ষে এই জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে জানোয়ারটাকে।

কেউ টুঁ শব্দ করল না। ফলে চৌদ্দটি ভাঁজ-করা কাগজের টুকরোর একটায় 'হনুমান' কথাটা লিখে টুকরোগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া হল। প্রত্যেকেই খুশিমতো একটা করে টুকরো উঠিয়ে নিল। দেখা গেল সাজাহান ভাইয়ের কাগজেই 'হনুমান' কথাটা লেখা। অর্থাৎ শর্তমাফিক সাজাহান ভাইকেই এখন হনুমানের মোকাবেলা করতে যেতে হবে।

দলপতি প্রদীপ বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল: আসল কথা হল সাহস। সাহসের কাছে হনুমান কিছু না। আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো অবস্থায়ই...

সাজাহান ভাই বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে জামার হাতা গুটাচ্ছিলেন। আর থাকতে না-পেরে চেঁচিয়ে বললেন : চুপ! আর-একটা কথা বলবি তো 'লংজাম্প' দিয়ে এসে পড়ব। 'ক্লিন মার্ডার' করে ফেলব কিন্তু, হ্যাঁ।

সবাই চুপ। সাজাহান ভাইয়ের চোখমুখ ভয়ে, আশঙ্কায় চুপসানো। হাত গুটানো শেষ হলে সাজাহান ভাই প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে জুতার ফিতা বাঁধলেন। একবার বাঁধা পছন্দ না-হওয়ায় ফিতা সম্পূর্ণ খুলে আবার বাঁধলেন। বিড়বিড় করে বললেন : ভারি একটা হনুমান, তাকে বুঝি ভয় করি আমি, 'হু! একবার পেয়ে নিই হনুমানের বাচ্চা হনুমানকে, সমানে লাথি চালাব। এই সাজাহানের একটা লাথি আগে খাক জানোয়ারটা। তখন বুঝবে ভদ্রলোকদের খামাখা উৎপাত করার মজাটা কী।

কিছুক্ষণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিলেন সাজাহান ভাই। বাইরে যাওয়ার সব প্রস্তুতি তার শেষ। জুয়েল কোনোরকমে একটা বড় মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে বাইরে গিয়ে। সে এসে জানাল হনুমানটা আগের জায়গা ছেড়ে তাঁবুর আরো কাছে একটা বদ্দিরাজ গাছের নিচু ডালে বসে আছে।

: ওয়াটার দে...

সাজাহান ভাই আদেশ দেন। প্রায় মিনিট-পনেরো সময় ধরে একটু-একটু পানি খেল সাজাহান ভাই। তারপর মুখ মুছে হঠাৎ ভাঙা-গলায় প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বললেন : আমি বরং না গেলাম প্রদীপ। কী বলিস...

: কিন্তু...

সাজাহান ভাই সবই বুঝলেন। প্রায় সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে এলেন। আমরাও পেছনে-পেছনে এলাম। এসে দেখলাম, সত্যি-সত্যি একটা বিপুলকায় হনুমান কোলে হাত রেখে বদ্দিরাজ গাছের ডালে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। সাজাহান ভাইকে দেখে হনুমানটা কিচির-মিচির শব্দ করে লম্ফঝম্ফ দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল।

: দেখলি, জানোয়ারটার ব্যবহার 'সি' করলি?

সাজাহান ভাই মর্মাহত হয়ে কাঁপা গলায় অভিযোগ করলেন। বললেন : বল্ দেখি দিলু, তোরা যে এরকম একটা অসভ্য 'বিস্টের' কাছে আমাকে পাঠালি—আমি এখন কী করি! ইডিয়েটটা একবিন্দু ইংলিশ জানে না...বকাবকি করেও তো লাভ নেই। এই দ্যাখ, দ্যাখ কীরকম ভ্যাঙাচ্ছে...উহ, এ অপমান অসহ্য!

: এগিয়ে যান সাজাহান ভাই।

প্রদীপ ভয়ে-ভয়ে উপদেশ দিল : তাড়া করে এগিয়ে গেলে দেখবেন হনুমানটা ভয়ে পালিয়ে গেছে...

: এগিয়ে যাব... ... 'ইউ মিন প্রসিড' করব? 'নো, নো, ইম্পসিবল!'

: ইমপসিবল? কেন সাজাহান ভাই...?

: স্ট্যান্ডোফবিয়া!

: স্ট্যান্ডোফবিয়া, সে আবার কী সাজাহান ভাই?

প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে সাজাহান ভাই বললেন : স্ট্যান্ডোফবিয়া কী তা কি আমিই জানি ব্রাদার। হাইড্রোফবিয়া আছে, সাইকোফবিয়া আছে...মনে হল স্ট্যান্ডোফবিয়াও থাকতে পারে! স্ট্যান্ড থেকে স্ট্যান্ডো...স্ট্যান্ড হল দাঁড়ানো। তা হলে স্ট্যান্ডোফবিয়া হল গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার রোগ। আমার পা বসে গেছে দিলু। বলছি বটে এগিয়ে যাও, কিন্তু আমি 'প্রসিড' করতে পারছি না.. ... ..

এই সময় হনুমানটা দু-তিনটা গাছ টপকে একদম মাথার উপরকার একটা গাছের ডালে এসে বসল। সাজাহান ভাই-এর দিকে তাকিয়ে কয়েকটা ভেংচি কাটল। তারপর ডালে দাঁড়িয়ে উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগল।

সাজাহান ভাই-এর গলার স্বর একেবারে ভেঙে গেছে। দিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন : নাচছে তো, দেখবে এক মিনিটের মধ্যেই কেমন একটা 'লো-জাম্প' দেয়। উহ, জানোয়ারটার মধ্যে একটু যদি ভদ্রতাবোধ থাকত!

সাজাহান ভাই দাঁড়িয়ে থেকে ঝিমোতে লাগলেন। বললেন : দিলু, মনে কোরো না আমি ভয় পেয়েছি। ভয় আমি পাইনি ব্রাদার। হনুমানজির অভদ্র ব্যবহারে আমি আসলে 'ইনসাল্টেড ফিল' করছি। আর শোন্, এইরকম দাঁড়ানো অবস্থা থেকে আমি যদি সটান ঝপ করে পড়ে যাই, তাহলে ফিট হয়ে গেছি তা যেন 'থিঙ্ক' কোরো না।'স্ট্যান্ডোফবিয়া'র কথা বললাম না? এটা হল 'স্ট্যান্ডোফবিয়া'।

দিলুর উদ্দেশে কথাগুলো বলছিলেন সাজাহান ভাই। কিন্তু কোথায় দিলু! কখন সে দল থেকে চুপিচুপি সরে পড়েছে, তা কেউ টের পায়নি। হঠাৎ একপাশে তাকিয়ে আমরা ভীষণ আঁতকে উঠলাম। হনুমানটা যে-ডালে বসে আছে, সেই ডালের কাছাকাছি আর-একটা গাছে বসে দিলু। হাতে এক-কাঁদি পাকা সাগরকলা।

: কাম, কাম... ...

হনুমানটাকে দিলু ডাকল। হনুমানটা সেদিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ দেখল দিলুকে। তারপর সে কী উদ্দাম নৃত্য, সে কী কিচির-মিচির গান! এ-ডালে সে-ডালে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল হনুমানজি। তারপর একসময় লাফ দিয়ে পড়ল দিলুর ওপর। আমি আশঙ্কায় চোখ বুজলাম।

চোখ খুলে তাকিয়ে আমরা সবাই তাজ্জব। হনুমানটা দিলুর কোলে আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় মাথা ঘষছে। আর দিলু একটা-একটা করে কলা তুলে দিচ্ছে হনুমানজির মুখে।

এই সময় একদল মশালধারী লোক এসে পৌছল সেখানে; খোদাদাদ ভূঁইয়া একজন কৃষ্ণকায় আফ্রিকানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনিই মি. রঙ্গন কুফুয়া। দিলু ততক্ষণে লাভলীকে নিয়ে নেমে এসেছে নিচে। মি. রঙ্গন কুফুয়া লাভলীকে পেয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

ওরা চলে যাওয়ার পর আলো জ্বালিয়ে আমরা বাইরে বসলাম। আকবর আর গজা রান্নার জোগাড়ে লাগল। কেরোসিনের চুল্লি জ্বালিয়ে চা করতে বসল জুয়েল। সাজাহান ভাই বললেন : যাক, হনুমানটা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের একটা উপকার করে গেল।

: কী রকম?—প্রশ্ন করে সুনির্মল।

: এটা বুঝতে পারছিস না তেতো ওষুধ কোথাকার! বলি, হনুমানজি না এলে 'স্ট্যান্ডোফবিয়ার' কথা জানতে পারত আজকের এই 'টুয়েন্টিনথ সেঞ্চুরি'? দাঁড়া না, এবার ফিরে গিয়ে 'স্ট্যান্ডোফবিয়ার' ওপর রিসার্চ করব। ছেড়ে দেব ভেবেছিস? কখখনো না—সাজাহান ওরকম ছেলেই না!

কুড়োনো মানিক

- অজ্ঞানতা হল মনের রাত্রি; সেই রাত—যেখানে না আছে চাঁদ, না আছে তারা।
- অহংকার ও স্বার্থবোধ না-ছাড়লে মহৎ-কর্ম অসম্ভব।
- অধিক ভোজন মানেই রোগকে আমন্ত্রণ জানানো।
- অপরের সমালোচনার ভয় থাকলে কিছুই করা যায় না।
- অপরের কথার উপর কথা বল অভব্যতা।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র